দেশাত্মবোধক
ও
ঐতিহাসিক বাংলা নাটক

ড. প্রভাতকুমার গোস্বামী
বিভাগীয় প্রধান : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ : কলিকাতা

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপ দাস

'সাহিত্য প্রকাশে'র পক্ষে শ্রীমিতা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅমলেন্দু শিকদার কর্তৃক জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩/১ মণীন্দ্র মিত্র রো, কলিকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত।

● নিবেদন ●

আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে বইটি লেখা স্থরু করেছিলাম। লেখা শেষও হয়েছে প্রায় দু-বছর আগে। কিন্তু নানা কারণে বইটি ছাপার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। শেষ পর্যন্ত বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র যদি উৎসাহের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে সহযোগিতা না করতেন তা হলে বইটির প্রকাশে আরও বিলম্ব হতো।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের স্থরু থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ—এই সময়ের মধ্যেকার দেশাত্মবোধক এবং ঐতিহাসিক নাটকের রীতি, প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাবে যে ঐ সময়ের মধ্যে লেখা প্রায় সব ঐতিহাসিক নাটকই দেশাত্মবোধক। আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি ঐতিহাসিক নাটকগুলি নাটক হিসাবে কতটা সার্থক হয়েছে; তারা ইতিহাসের মর্যাদাই বা কতটা রক্ষা করে চলেছে; তাদের রচনার মূল লক্ষ্যই বা কি ছিল, কোন ধারায় দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক নাটকের প্রবাহ চলেছে—ইত্যাদি।

এটি গবেষণামূলক গ্রন্থ বলেই আমাকে বক্তব্যের প্রামাণিকতা রক্ষার জন্যে নানা তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ধৃত করতে হয়েছে; ফলে কিছুটা ফুটনোট কণ্টাকিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তার জন্যে রসপ্রাশন কিছু বিঘ্নিত হয়েছে বলে মনে করি না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়ায় আমার গবেষণার কাজে স্থবিধা হয়েছে। এই গ্রন্থের শব্দসূচী প্রণয়নের দায়িত্বও অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার মিত্র গ্রহণ করায় আমি কৃতজ্ঞ।

প্রভাতকুমার গোস্বামী

ঃ সূচীপত্র ঃ



দেশাত্মবোধক
ও
ঐতিহাসিক বাংলা নাটক

এই লেখকের অন্যান্য বই

বাংলা নাটকে গান
উনবিংশ শতকের দর্পণ নাটক
ভারতীয় সঙ্গীতের কথা
হাজার বছরের বাংলা গান

হিমালয়ের ঘুম ভাঙছে [আন্তর্জাতিক রাজনীতি]
নবরূপে সাম্রাজ্যবাদ [ঐ]
নাগপাশ [উপন্যাস]
বেলাভূমি [ঐ]
স্যানডাল বনাম হাইহিল [রসাত্মক গল্প]
হট্টমালার দেশে [রাজনৈতিক রঙ্গ-কথা]
আমি বেঁচে আছি [নাটক]

ছোটদের জন্য

বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা
বিজ্ঞানের যুগান্তর
বিজ্ঞানের জগৎ
মহাযুদ্ধের দাম
বাঘ সিংহের লড়াই [উপন্যাস]
পার্বত্যমূষিক [ঐ]
বাংলার দামাল ছেলে [ঐ]

কথারম্ভ

'বাংলার ইতিহাস নাই', 'ভারতবর্ষীয়দের ইতিহাস নাই'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই আক্ষেপ[১] এবং 'দেশ যথার্থভাবে ইতিহাসের ক্ষেত্রে' এসে দাঁড়াবার যে শর্ত রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন[২]; এ সব মনে রেখে ইতিহাসের কথা চিন্তা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, ভারতে কোন্‌টীর অভাব ছিল—রাজকীয় বৃত্তান্ত না জাতীয় ইতিবৃত্ত?

বৈদিকোত্তর যুগের যে 'পুরাণ' (পুরাতন কাহিনী)[৩] আমরা পাই তাতে সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে রাজ-রাজড়ার বংশ বৃত্তান্তও পাওয়া যায়; যদিও সেগুলির মধ্যে কিছু অসঙ্গতি বর্তমান। মহাভারতে কোনও ইতিহাস বলার সময় ব্যাসদেব তাকে পুরাতন বলে অভিহিত করেছেন। ইতিহাস শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে—'এইরূপ ছিল' (ইতি হ আস)। যদিও 'ইতিহাস' ও 'পুরাণ' কথা দু'টী সমার্থক নয় তবু প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় ইতিহাস চর্চার দিক থেকে পুরাণগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক যুগে ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি তার অর্থ পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিবৃত্ত—এটা হয়তো অতীতে রচিত হয়নি। কিন্তু এদেশে রাজকীয় বৃত্তান্তের অভাবও যেমন নেই, তেমনি নানা ধর্ম-সাহিত্যে ধর্মীয় ও সামাজিক বৃত্তান্তও যথেষ্ট ছড়িয়ে আছে। একাদশ শতাব্দীতে রচিত বিলহন-এর 'বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত', কলহণ-এর 'রাজতরঙ্গিণী', জলহন-এর 'সোমপালবিলাস', হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচরিত' (১১৬৩), অজ্ঞাতনামা লেখকের 'পৃথ্বীরাজবিজয়', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামপালচরিত' প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে নগণ্য নয়। মুসলিম আমলে যেগুলি রচিত হয়েছিল সেগুলি জাতীয় ইতিহাস নয় ঠিকই এবং ঐগুলিতে নিরপেক্ষতাও বজায় ছিল না এ কথাও ঠিক; কিন্তু ইংরেজ আমলেও কি ভারতের প্রকৃত জাতীত ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে? বিদেশী শাসকদের অর্থে পুষ্ট বৈদেশিক ঐতিহাসিকরা মূলত সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই ইতিহাস রচনা করেছেন; এদেশীয় ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ তাঁদের দ্বারা

প্রভাবিত হয়েছেন ; আবার কেউ কেউ দেশাত্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐ সব ইতিহাসের প্রতিক্রিয়ায় যা রচনা করেছেন তার মধ্যেও নিরপেক্ষতা বজায় থাকে নি ; বরং তা হয়েছে motivated history.

প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত ইতিহাস (ultimate history) লেখা খুবই কঠিন কাজ। আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। ১৮৯৬-এ Cambridge Modern History-এর রচনা সম্পর্কে Cambridge University Press-এর পরিচালকদের কাছে Acton এই কথাই বলেছিলেন : "Ultimate history we cannot have in this generation, but we can depose of conventional history, and show the point we have reached on the road from one to the other, now that all information is within reach, and every problem has become capable of solution".[৪]

প্রায় ৬০ বছর পরে Cambridge Modern history-এর দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণের ভূমিকায় ঐ 'ultimate history' সম্পর্কে অধ্যাপক Sir George Clark লিখেছেন—"Historians of a later generation do not look forward to any such prospect. They expect their work to be superseded again and again. They consider that knowledge of the past has come down through one or more human minds, has been 'processed' by them, and therefore cannot consist of elemental and impersonal atoms which nothing can alter. The exploration seems to be endless, and some impatient scholars take refuse in scepticism, or at least in the doctrine that, since all historical judgements involve persons and points of view, one is as good as another and there is no 'objective' historical truth"[৫]

ইতিহাস রচনা মূলত ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণের ওপর নির্ভরশীল বলেই এ সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বললেও সবাই তা চূড়ান্ত বলে মেনে নেবেন, এমন কথা নেই।

শুধু ঘটনা বিন্যাস বা ঘটনা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসা নয়, তথ্যাবলী

উপস্থাপিত করার ব্যাপারেও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থাকে। এ কথা ঠিক যে, যে পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭-এ অনুষ্ঠিত হয়, তার অনুষ্ঠান ১৭৫০ বা ১৭৫২-এ দেখান সম্ভব নয়, কিন্তু কারণ এবং পরিণতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোনও তথ্য গোপন করা হতে পারে বা লেখকের মর্জিমত তথ্য সাজানো হতে পারে। ঐতিহাসিক E. H. Carr তাই বলেছেন—"It used to be said that facts speak for themselves. This is, of course, untrue. The facts speak only when the historian calls on them, it is he who decides to which facts to give the floor, and in what order or context".[৬] ঐতিহাসিক যদি তথ্য গোপন করেন তবে সে সত্য 'কথা বলবে' কি করে? অথবা তিনি তথ্যাবলী বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ কায়দায় সাজালেন তা থেকে প্রকৃত ঘটনা উদ্ধার করাই বা যাবে কি করে?

: ইতিহাস ও নাটক :

ইতিহাসের ব্যাপারেই যখন এই অবস্থা, তখন সেই ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক রচনা আরও কঠিন কাজ। সবচেয়ে বড় কথা নাটকের একটা বিশেষ আঙ্গিক আছে বা কাঠামো আছে। ইতিহাসের ঘটনাবলী নাট্যকারের সুবিধা অনুযায়ী ঘটে না—অথচ ইতিহাসের ঘটনাবলীকেই নাটকের ঘটনাবলী হিসাবে সাজাতে হবে। এখানেও সেই দৃষ্টিকোণের কথাই এসে যায়। নাট্য-কারেরও একটা বক্তব্য থাকে; সেই বক্তব্যকে তিনি উপস্থিত করতে চান। তাই তিনি এমনভাবে ঘটনাবলী সাজাবেন যাতে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এক কথায় যাকে আমরা ঐতিহাসিক নাটক বলি তা একই সঙ্গে ইতিহাস এবং নাটক দু'দিক থেকেই যথার্থ হতে হবে।

এই জন্যেই ঐতিহাসিক নাটকের কতকগুলি সর্ত নির্ধারিত করা হয়ে থাকে: (১) নাটকের মূল কাহিনী ইতিহাসের কোনও কাহিনী হবে বা নাটকের কাহিনী ইতিহাসের কাহিনীকে যথাযথভাবে অনুসরণ করবে; (২) নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি ইতিহাসের পরিচিত ব্যক্তি হবে; (৩) অনৈতিহাসিক চরিত্র থাকতে পারে, কিন্তু মূল কাহিনী মূলগতভাবে তারা পরিবর্তিত করতে পারবে না; (৪) ইতিহাসের কোনও বিশেষ ঘটনা নাটকের প্রধান পটভূমি হবে। (৫) যে যুগে ঘটনা ঘটেছিল তার রাজনৈতিক অবস্থা,

সামাজিক ব্যবস্থা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালী, সে যুগের মানুষের চিন্তাধারা বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি নাটকে প্রতিফলিত হবে। (৬) অপ্রধান ঘটনা কল্পনা করা যেতে পারে, কিন্তু এমন কিছু কল্পনা করা ঠিক হবে না, যা ঐ যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। (৭) ঐতিহাসিক পরিবেশটি সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হবে। ইতিহাসের পটভূমি নিয়ে তাতে ইচ্ছামত কাহিনী সংস্থাপন করা যেতে পারে, কিন্তু তা নাটক হলেও ঐতিহাসিক নাটক হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কেও সেই কথা খাটে : "ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন। মশলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোন বিরোধ নাই ; কারণ, স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মশলা উপলক্ষ মাত্র।

অর্থাৎ লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণা সফল হইলেই হইল।"[৭]

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এখানে যে সত্যের কথাটা বলেছেন সেটা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। 'ইতিহাসের সত্য' আর 'সাহিত্যের সত্য' এক নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে গেলে 'ইতিহাসের সত্য' হচ্ছে 'বিশেষ সত্য' অন্যদিকে সাহিত্যে 'নিত্য সত্যের' প্রকাশ। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবি কল্পনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে তথ্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এবং গেলে ইতিহাস থেকে দূরে সরে যেতে হয়। তথ্য যেখানে দুর্লভ ইতিহাস সেখানে অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে এবং কল্পনায় অভাবটা ভরাট করতে গিয়ে যা রচনা করা হয় তা ঐতিহাসিক নাটক হতে পারে না। অবশ্য ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনাকে একেবারে বর্জন করলে তা শুধু ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায়, নাটক হয় না। তবে সেই কল্পনা যাতে ইতিহাসের মূল চরিত্রকে ছাড়িয়ে না যায়, নাট্যকারের শুধু নিজের মনের মাধুরী মেশানো রচনা না হয় বা শুধু তাঁর নিজের আদর্শবাদের আলোকেই গড়ে না ওঠে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। আবার দৃঢ় ভাবে

ইতিহাসের তথ্যকে আঁকড়ে থাকলে নাটক রচনাও কঠিন হয়ে ওঠে। কারণ, নাটকের কাঠামোতে হুবহু বিধৃত করা যাবে—এমন ভাবে তো আর ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে পারে না। তাই কেউ কেউ ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে নাটকের রীতিগত বিরোধ বাধলে নাটকের রীতিটাকেই আঁকড়ে থাকতে বলেছেন : For to be *truly* a historical drama, a work should not adhere to the literal truth of history in such sort as to hinder proper dramatic life ; that is, the laws of the drama are here paramount to the facts of history ; which infers that where two cannot stand together the latter is to give way. Yet, when and so far as they are fairly compatiable, neither ought to be sacrificed, at least hlstorical fidelity is so far essential to the perfection of the work." [W. H. Hudson, 'An introduction to the Study of Literature,' London (1961),p.160].

আবার ইতিহাসের তথ্য বা ইতিহাসের সত্যকে প্রাধান্য দেবার প্রশ্নেও কিছু গোলযোগ আছে। কারণ নাট্যকার যখন নাটক লিখেছেন তখন হয়তো বহু তথ্য অনুদ্‌ঘাটিত ছিল এবং তাই পরবর্তীকালের সমালোচকেরা নতুন উদ্‌ঘাটিত তথ্যের আলোকে সেই নাটককে অনৈতিহাসিক বলে বাতিল করে দিতে পারেন।

ঐতিহাসিক সত্যের কথা বলতে গেলেও ইতিহাস রচনায় বিশেষ দৃষ্টি-কোণের প্রশ্নটা এসে যায়। তবে মোটমুটিভাবে ইতিহাসের স্বীকৃত ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে বা অগ্রাহ্য করে 'সাহিত্যের সত্য' প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সাহিত্য হিসেবে তা যতই সার্থক হোক, তাকে ঐতিহাসিক বিশেষণ দিতে অনেকেরই আপত্তি হবে।

: নাটক ও জাতীয় ধর্ম :

নাটক জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। সমস্ত দেশের নাটক দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, নাটকের সঙ্গে জাতীয় জীবনের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিরাজমান। জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে নাট্যকলার উন্নতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত। জাতীয় জীবন সংহত রূপ লাভের সময়ই নাটকের উদ্ভব। জাতীয়-ধর্মকে

অবলম্বন করে গ্রীক নাট্য-সাহিত্য পুষ্টিলাভ করেছিল এবং এই ধর্ম বীরধর্ম। রোমান সাহিত্যও গ্রীক প্রথাকে অনুসরণ করেছে। ফরাসী নাট্যসাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীতে; স্বাধীনতা, সাম্যমৈত্রীর আদর্শ নিয়ে তখন ফরাসী জাতি রাজতন্ত্রের চিতাশয্যার ওপরে সাধারণতন্ত্রের বনিয়াদ গড়ে তুলছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকের ইংলণ্ডে গীর্জার চৌহাদ্দির মধ্যে নাটকের বীজ অঙ্কুরিত হলেও নবজাগরিত ইংলণ্ডে (এলিজাবেথীয় যুগে) নাটকের চরম উন্নতি ঘটে। এই যুগে নাটকই সবচেয়ে সার্থকভাবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই বঙ্গভূমিতেও ব্যাপকভাবে নাট্যরচনা শুরু হলো ঠিক তখনই যখন বাঙালীরা নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ। "এ দেশে যখন নাট্যশালার সৃষ্টি হয়, তখন দেশে একটা অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজী ভাব, ইংরেজী চিন্তা, ইংরেজী সভ্যতা, ইংরেজী আচার ব্যবহার নিষ্ঠা বাঙ্গলার অচলায়তনের শতমুখী যে শিকড়, তাহাকে শতদিক হইতে নাড়াইয়া দিয়াছে ও বাঙালী জীবনের ধারা এই সময় হইতে সকল দিকেই বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার সাহিত্যও এই সময়ে নবকলেবর ধারণ করে।"—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা নাটক ও গিরিশ যুগ' রূপ ও রঙ্গ, ৩রা আশ্বিন, ১৩৩২।

বাঙালীর এই নব চেতনার যুগে বাঙালীর ছেলে খৃষ্টান হলো; রাজনৈতিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ; সৃষ্টি হলো ব্রাহ্ম সমাজ; সমাজ সংস্কারের আন্দোলন সৃষ্টি হলো, রামকৃষ্ণদেবকে ঘিরে সৃষ্টি হলো সমন্বয়ের তরঙ্গ; তার পরে জাতীয় আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি সঞ্জাত বিষক্রিয়া আমরা দেখলাম সুরু থেকেই। জাতীয় জীবনের যে ভাব নাটকে সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করলো সেটা সামাজিক নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, ইতিহাস থেকে বেছে নেওয়া হলো এমন অধ্যায় যার সঙ্গে জাতীয় নবচেতনার সংস্পর্শ আছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসও হয়ে উঠলো উদ্দেশ্যমূলক ইতিহাস—motivated history. শুধু নাটক নয়, কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপার ঘটেছে।

: ঐতিহাসিক নাটক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস :

ঐতিহাসিক উপন্যাসই হোক আর ঐতিহাসিক নাটকই হোক সেগুলি ঐতিহাসিক হয়েও উপন্যাস বা নাটক হতে হবে। আর এখানেই ঐতিহাসিক

নাটকের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পার্থক্য এসে যায়। কারণ দু'টী জিনিষের কাঠামো পৃথক।

প্রথমতঃ উপন্যাসে কোনও ব্যক্তি বিশেষের বা কোন একটী যুগের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া চলে, কিন্তু নাটকে তা সম্ভব নয়। নাটকে একটী ব্যক্তিপুরুষ বা একটী যুগের রূপায়ণ উদ্দেশ্য থাকলেও ঘটনাবলীকে এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে সেই উদ্দেশ্য সার্থক ক'রে তোলা যায়। অর্থাৎ নাটকের ক্ষেত্রে নির্বাচন এবং বিয়োজন অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়তঃ নাট্যকারকে যা কিছু কথা পাত্র পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়ে বলতে হবে, তাঁর নিজের জবানীতে কোনও কথা বিবৃত করার সুযোগ নেই। তৃতীয়তঃ উপন্যাসে একটা ব্যক্তির জীবনধারায় পূর্ণ পরিচয় উদঘাটন করা হয়। নাটকেও তা সম্ভব, তবে কৌশল সম্পূর্ণ অন্য রকম! "Drama too aims at a total embodiment of life process. This totality, however, is concentrated round a firm centre, round the dramatic collision. It is an artistic image of the system, so to speak of those human aspiration which, in their mutual conflict, participate in this central collision." George Lukacs, 'The Historical novel,' London [1969], p 106.

নাটকীয় ঘটনাবলী একটী দৃঢ় কেন্দ্রকে অবলম্বন করে আবর্তিত হয় এবং ঐতিহাসের ঘটনালীকে ঐতিহাসিক নাটকে ঠিক সেইভাবেই আবর্তিত করতে হবে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসকে আনুপূর্বিক রক্ষা করা যায়, কিন্তু নাটকে তা সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে ইতিহাসের সারভূত অংশটাই গ্রহণীয়।

কেউ কেউ ঐতিহাসিক নাটকের সীমিত ক্ষেত্রে কালানৌচিত্যকে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে ঐতিহাসিক নাটকে অতীতকে জীবন্ত করে তুলতে হবে এবং তাকে বর্তমানের জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত না করলে দর্শকেরা তা উপভোগ করতে পারে না। 'এই সীমিত ক্ষেত্রে'র পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন এবং দেখা গেছে বহু নাটক কালানৌচিত্যের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা হারিয়েছে।

: ঐতিহাসিক নাটক : ভারতীয় দৃষ্টান্ত :

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতে উপন্যাস জাতীয় রচনা দুই একখানি পাওয়া

গেলেও (যেমন বাণভট্টের 'কাদম্বরী') ঐতিহাসিক উপন্যাস পাওয়া যায় না। নাটকের সঙ্গে কয়েকখানি ঐতিহাসিক বিষয় সম্বলিত নাটক অবশ্য পাওয়া যায়। এগুলি ঠিক আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক নাটকের মত নয়।

সাহিত্য দর্পণে বলা হয়েছে—"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্বিত (৬।২।৭৭)। এখানে বিখ্যাত বা পরিচিত ঘটনা বলতে ঐতিহাসিক ঘটনাও হতে পারে বা পৌরাণিক ঘটনাও হতে পারে। সংস্কৃত নাট্যকারেরা পৌরাণিক কাহিনীকেই বিশেষভাবে নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁরা উদাসীন ছিলেন না। তাই কয়েকখানা সংস্কৃত ঐতিহাসিক নাটকের সন্ধান আমরা পাই। A. B. Keith তাঁর 'The Sanskrit Drama' গ্রন্থে নিম্নলিখিত সংস্কৃত ঐতিহাসিক নাটকগুলির পরিচয় দিয়েছেন: দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা—'ললিত বিগ্রহরাজ' নাটক। আজমীরে শিলালিপিতে প্রাপ্ত (খণ্ডিত) এই নাটকটি চৌহানের পূর্বপুরুষ বীসলদেব বিগ্রহরাজের সম্মানে রচিত।

১২১৯-এ লিখিত 'হম্মীর মদমর্দন'। জয়সিংহ সূরি রচিত এই ঐতিহাসিক নাটকটীর বিষয়বস্তু তুরস্করাজ হম্মীরের পরাজয়, বস্তুপাল রাজার গুণকীর্তন।

আনুমানিক ১৩০০-এ লিখিত 'প্রতাপরুদ্র কল্যাণ'। বিদ্যানাথ লিখিত এই নাটকটীর বিষয়বস্তু নাট্যকারের পৃষ্ঠপোষক বরঙ্গলরাজের গুণকীর্তন।

একাদশ শতাব্দীতে লিখিত 'রাজরাজ' নাটক। চোল সম্রাট রাজরাজকে নিয়ে এই নাটক লেখা হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত 'গঙ্গাদাস প্রতাপ বিলাস' নাটক। এই নাটকে গুজরাটের মহম্মদ শাহর বিরুদ্ধে চম্পানীর পতি গঙ্গাদাসের সংগ্রাম বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত সংস্কৃত নাটকগুলিতে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু থাকলেও সেগুলি এ যুগের ঐতিহাসিক নাটকের সমপর্যায়ের নয়। এ দিক থেকে বরং বিশাখ-দত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটীর উল্লেখ করা চলে। ৮৬০ খৃষ্টাব্দকে বিশাখ দত্তের আনুমানিক কাল বলে ধরা হয়ে থাকে। সাত অঙ্কের এই নাটকটীর বিষয়বস্তু হল নন্দরাজের মন্ত্রী রাক্ষস ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ চাণক্যের মধ্যে রাজনৈতিক কূটদ্বন্দ্ব। চাণক্য নন্দরাজার উচ্ছেদে এই রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে আনতে সক্ষম হন।

সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে এই নাটকটীর একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। শুধু মাত্র রাজনৈতিক বিষয় অবলম্বনে আর দ্বিতীয় নাটক সংস্কৃতে নেই। বিষয়-বস্তুর পরিকল্পনায় এবং রচনাশৈলীতে এই নাটক সাধারণ সংস্কৃত নাটক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সমস্ত সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে বিপরীতভাবে এই নাটকে শৃংগার রসাত্মক অনুভূতিকে শুধু পরিহার করাই হয়নি, শৃংগার রসাত্মক আবহাওয়াকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অনৈতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনা দুই একটী থাকলেও এর মূল উপজীব্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

: ঐতিহাসিক নাটক : পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত :

যে ইংরেজী নাটকের আদর্শে ও প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকের সুরু সেই নাটকের সূত্রপাত ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। জাতীয় উপকথা অবলম্বনে রচিত প্রথম ইংরেজী ট্র্যাজেডী Gorboduc [১৫৬২]-এর কথা বাদ দিলেও ষোড়শ শতাব্দীতেই অন্ততঃ তিনখানি ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছিল : The Famous Victories of Henry the Fifth [১৫৮৮-এর আগে], The Troublesome Raigne of King John [১৫৯১-এর আগে] এবং The Chronicle History of King Leir [১৫৯৪]

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে যখন ইংরেজী নাটকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সুরু হলো তখন Peele, Marlowe প্রমুখ নাট্যকারদের ঐতিহাসিক নাটক তো বটেই Shakespeare-এর যুগ এবং Dryden-এর 'heroic tragedy'-এর যুগ শেষ হয়ে Goldsmith, Sheridon প্রভৃতির নাটক চলছে। কলিকাতার বিদেশী রঙ্গালয়গুলিতে শেক্সপীয়র থেকে সুরু করে বেন জনসন, ফ্রান্সিস বোমণ্ট, জন ফ্লেচার, ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার, জন ফোর্ড, উইলিয়ম কনগ্রীভ, জর্জ ফারকুহর, নিকোলাস রো, টমাস অটওয়ে, হেনরী ফিল্ডিং, সেরিডন, গোল্ডসস্মিথ প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটক অভিনীত হচ্ছিল। সে যুগের 'ক্যালকাটা গেজেট', 'ইংলিশম্যান', 'বেঙ্গল হরকরা' প্রভৃতি প্রাচীন পত্র-পত্রিকায় অভিনয় সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হতো। বিভিন্ন স্কুল কলেজে শুধু ইংরেজী নাটকের সঙ্গে বাঙালী ছাত্রদের পরিচয়ই ঘটছিল না, স্কুল কলেজে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে ইংরেজী নাটকের অভিনয়ও তারা করছিল। ১৮৩১-এ বাঙালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা 'হিন্দু থিয়েটার'-এ (প্রসন্নকুমার

ঠাকুর এই নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন) ভবভূতির 'উত্তররামচরিতের'-এর অনুবাদের সঙ্গে 'জুলিয়াস সীজার'-এর অংশবিশেষ অভিনীত হয়। এই সব কারণে বাংলা নাটক রচনায় শুধু ইংরেজী নাটকের প্রেরণাই কার্যকর হলো না, প্রথম ঐতিহাসিক বাংলা নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'তেও সেই প্রেরণা দেখা গেল। এই ঐতিহাসিক নাটক রচনা করলেন হিন্দু স্কুলের ছাত্র ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

: বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে ট্র্যাজেডীর আদর্শ :

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে করুণ রস অপ্রতুল নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের যে ট্র্যাজেডীর আদর্শ সেটা সংস্কৃত নাটকে নেই। বাংলা নাটকের উন্মেষ পর্ব সুরু হয়েছিল পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাবে এবং সূচনাতেই দেখা যায় বাংলায় ট্র্যাজেডীর আদর্শে নাটক রচিত হতে আরম্ভ করেছে। জি সি গুপ্ত 'কীর্তিবিলাস" নাটক (১৮৫২) রচনার সময় 'শেক্‌সপীয়ার নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি'কেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। 'বিধবা বিবাহ নাটক'-এর রচয়িতা উমেশচন্দ্র মিত্রও বলেছেন যে তাঁর এই নাটক "is the first attempt to introduce the regular tragedy into Bengallee drama." প্রথম বাংলা ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'র রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তও তাঁর নাটককে 'Tragedy', 'Romantic Tragedy' এবং 'Historic Tragedy' বলে উল্লেখ করেছেন।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, মধুসূদন ট্র্যাজেডী দিয়ে যে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের উদ্বোধন করলেন, তাঁর পরবর্তী নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে সেই ট্র্যাজেডীর আদর্শই অনুসরণ করেছেন। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের প্রায় সবগুলিই ট্র্যাজেডীর আদর্শে রচিত। ট্র্যাজেডীর একই ধরণের আদর্শ সবাই গ্রহণ করেন নি এবং সকলেই যে সার্থক ট্র্যাজেডী রচনা করতে পেরেছেন তাও নয়। তবে প্রায় সব নাটকই কারুণ্যে ভরপুর, বিয়োগান্ত বা বিষাদান্ত। এর প্রধান কারণ পরাধীন ভারতবর্ষের নাট্যকারেরা জাতির ব্যথা ও বেদনাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন, জাতির অতীত গৌরবের সঙ্গে তার ব্যর্থতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার ও পীড়নের সঙ্গে তাদের বিভেদ নীতির অনিবার্য কুফলের দিকেই জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে বাংলা ট্র্যাজেডীতে প্রধানত শেকসপীয়রের আদর্শ এবং কমেডিতে ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের-এর আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু ভালভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ট্র্যাজেডীর ক্ষেত্রে গ্রীক ট্র্যাজেডীর আদর্শ থেকে সুরু করে কীড্, মার্লো, শেকস্‌পীয়র, ড্রাইডেন সবার নাটকের আদর্শই অনুসৃত হয়েছে।

: বিভিন্ন আদর্শের ট্র্যাজেডী :

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর রোমান নাট্যকার সেনেকা যে ট্র্যাজেডীর পত্তন করেন তার মূল কথা ছিল প্রতিহিংসা (revenge); তাঁর নাটকে ঘটনা কম, বক্তৃতা বেশী। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের অনেক দেশেই ট্র্যাজেডী দেখতে পাওয়া যায়। স্পেনের বিখ্যাত ট্র্যাজেডীয়ান ছিলেন Vega এবং Calderon; এঁদের ট্র্যাজেডীর বিষয়বস্তু ছিল ঐতিহাসিক দার্শনিক এবং দেশাত্মবোধক। প্রথম যুগের ইংরেজী ট্র্যাজেডী সেনেকার দ্বারা প্রভাবিত। ইংরেজী ট্র্যাজেডীর বিষয়বস্তু প্রতিহিংসা, ভালবাসা, সম্মান, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অহঙ্কার। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ট্র্যাজেডী রচয়িতারা হলেন মার্লো, কীড, শেক্‌সপীয়র, ওয়েবষ্টার। ড্রাইডেন হিরোয়িক ট্র্যাজেডীর রচয়িতা। ফরাসী ট্র্যাজডীগুলির প্রায় সবই হিরোয়িক ট্র্যাজেডী এবং এগুলির মধ্যে যে মূলদ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে তা প্রধানত প্রেম ও কর্ত্তব্য অথবা প্রেম মান-ইজ্জতের দ্বন্দ্ব। বিখ্যাত ফরাসী ট্র্যাজেডীয়ান হলেন Corneille এবং Racine.

এই সমস্ত ধরণের ট্র্যাজেডীরই আজ পরিবর্তন ঘটেছে। এক সময়ে ধর্মীয় উপাদান ছিল ট্র্যাজেডীর মূল উপাদান এবং কবিত্বপূর্ণ বক্তৃতাই ছিল মূল আকর্ষণ। রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূত নাটকের বিষয়বস্তু, নায়কের আদর্শ সবেরই পরিবর্তন ঘটে গেছে।

উনবিংশ শতকে আমাদের দেশের নাট্যকারেরা যখন নাটক রচনা আরম্ভ করেন, তখন তাঁদের সামনে প্রধানত গ্রীকও শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডীর আদর্শটাই বড় হয়ে উঠেছিল। তবুও ট্র্যাজেডীগুলি আলোচনা করলে সেনেকা, ড্রাইডেন প্রভৃতির প্রভাবও যে চোখে পড়বে না তা নয়।

গ্রীক ট্র্যাজেডীর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে এরিষ্টটল বলেছেন—

"Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude ; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play ; in form of action, not of narrative, through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions." [Translation by S. H. Butcher, 'Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art', U. S. A 1951, p. 23, vi] ।

এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়—ট্র্যাজেডী জীবনের গুরুগম্ভীর কোনও ঘটনা অবলম্বনে রচিত ভয়ানক মিশ্র করুণ রসাত্মক দৃশ্য-কাব্য, যা গীত ও ছন্দোবদ্ধ সংলাপে গ্রন্থিত। ট্র্যাজেডী তাঁদের কাহিনী—"those who have done or sufferd some thing terrible."

কিন্তু কেন এই "sufferance ?" নায়কের hamartia বা ট্র্যাজিক ভ্রান্তিই রয়েছে এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মূলে। Hamartia বলতে পাপও বোঝায়; অন্ততঃ গ্রীক Old Testament-এ তা-ই বলা হয়েছে। তবে ঐ 'হ্যামারসিয়া' বলতে 'মারাত্মক ভ্রান্তি বা ত্রুটীর'-এর কথাই বলা হয়েছে। ঐ ভ্রান্তি অজ্ঞানকৃত। এই ভ্রান্তির ফলেই নাটকীয় চরিত্র সৌভাগ্যের শীর্ষদেশ থেকে দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। নিয়তি তাকে পতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়—সে অসহায়ের মত কর্ম ও কর্মফল-এর বৈপরীত্য দেখে ভয় ও হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। এই করুণ ও ভয়ানক অবস্থা দেখে দর্শকরা শিউরে ওঠে।

গ্রীক নাটকে নিয়তিই প্রধান কথা। শেক্‌সপীয়রের নাটকে 'character is destiny.' গ্রীক নাটকে সামান্য অন্তর্সংঘাত থাকলেও বহির্সংঘাতই বড়। শেক্‌সপীয়রের নাটকে বহির্সংঘাত ও অন্তর্সংঘাত সমানভাবে প্রবল। চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাই তার পতনের কারণ।

A. C. Bradley শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডীর যে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন তা মোটামুটি এইরূপ :

১ শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডী প্রধানত এক ব্যক্তির (নায়কের) অথবা বড় জোর দুই ব্যক্তির (নায়ক ও নায়িকা) কাহিনী।

২। যন্ত্রণা ও বিপদের মধ্য দিয়ে নায়কের মৃত্যুতে শেষ।

৩। বিপদ ও যন্ত্রণা ভোগ অদ্ভুত ধরণের। অদ্ভুত ধরণের মানুষের জীবনেই এগুলি ঘটে এবং এগুলি অপ্রত্যাশিত।

৪। ঘটনার মধ্য দিয়েই বিপদ গড়ে ওঠে এবং সে ঘটনার সৃষ্টি করে মানুষ।

৫। ট্র্যাজেডীর মূল নিহিত চরিত্রের মধ্যেই এবং তার ক্রিয়া থেকেই ট্র্যাজেডী সূচিত হয়।

৬। বিপদ এবং পরিণতি মানুষের কাজের মধ্য থেকে অনিবার্যভাবে আসে এবং চরিত্রই তার প্রধান উৎস।

৭। চরিত্রের একরোখা ভাব, চেষ্টা করেও যাকে ফেরানো যায় না—সেইটাই চরিত্রকে পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

৮। শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডীতে 'চরিত্রই নিয়তি' সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্বেও এমন অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষকে চলতে হয় যার মধ্যে সে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না, মানুষ একটা সর্বশক্তিমান অদৃশ্য শক্তির সামনে নিজেকে অসহায় বোধ করে। তাই শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডীর আদর্শ বিচারে এই দুইটীকেই মেনে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাঁর ট্র্যাজেডীর আদর্শ Cassius [Julius Caesar]-এর মন্তব্য এবং Gloucester [King Lear]-এর আর্তনাদের মধ্যে একটা আপোষরফা—

Cassius to Brutus :

"The fault, dear Brutus, is not in our stars

But in overselves......"

Glouscester in King Lear—

"As flies to wanton boys, are we to the gods ;

They kill us for their sport."

শেকসপীয়রের ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডীগুলি Richard II, Richard III, Julius Caesar, Antony and Cleopatra ; Chritopher Morlowe-এর Edward II ; Kyd-এর Spanish Tragedy প্রভৃতির আদর্শ আমাদের দেশের নাট্যকারদের সামনে ছিল। তাছাড়াও ছিল Dryden-এর Heroic Tragedyর আদর্শ এবং মনে রাখা দরকার যে Dryden-এর হিরোয়িক ট্র্যাজেডীর মধ্যে তিনখানিই লেখা ভারতীয় রাজা বাদশা নিয়ে : 1. The Indian Queen, 2. The Indian Emperor, 3. Aurengzebe [আরঙ্গজেব]।

এই ধরণের নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিবর্তে সমিল ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে ; নাটকের কাহিনী এবং সিচুয়েসন পৃথক ধরণের। এই সব নাটকে ভাবাবেগের কৃত্রিম প্রকাশ থাকে, থাকে কবিত্বপূর্ণ বক্তৃতা। এই নাটকগুলির সংঘাত প্রেম ও মান-ইজ্জৎ বা মান-মর্যাদার (Love and honour). ভারতীয় বিষয় নিয়ে লেখা উপরোক্ত তিনটী নাটক এবং আরও যে দু'টী হিরোয়িক ট্র্যাজেডী [The Royal Martyr এবং The Conquest of Granada] ড্রাইডেন লেখেন এই পাচটি বাঁধা ধরা একটি ছকে গঠিত। প্রত্যেকটিতেই নায়ক অমানবিক ক্ষমতার [বীরত্ব] অধিকারী এবং তাদের মধ্যে আছে সীমাহীন দম্ভ ; নায়িকা অপূর্ব সুন্দরী—দ্বন্দ্বটা প্রেম ও মান-ইজ্জতের দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে ড্রাইডেনের অপর ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডী [সেটীও হিরোয়িক ট্র্যাজেডী] All for love [এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে লেখা]-এ প্রেমও মান-ইজ্জতের দ্বন্দ্ব ছাপিয়ে উঠেছে সন্দেহ ও ঈর্ষা [Suspicion and jealousy].

আমি আগেই বলেছি যে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকগুলির প্রায় সবই ট্র্যাজেডী বা ট্র্যাজেডীর আদলে গড়া। তাই সেগুলি বিশ্লেষণ করবার সময় স্বভাবতই কীড, শেকস্‌পীয়রের যুগ থেকে ড্রাইডেনের যুগের ট্র্যাজেডীগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতেই হবে। কারণ, ঐ সব ট্র্যাজেডীর আদর্শের দ্বারা বাংলা ঐতিহাসিক নাটক বিশেষভাবে প্রভাবিত।

: উপন্যাস ও নাটক উদ্ভবের প্রেক্ষাপট :

ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রেক্ষাপট আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। উপন্যাসের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট রচনা করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ তিনিই (রামমোহন—লেঃ) সর্বপ্রথম আমাদের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচনায় প্রয়োগ করিয়া বাঙালীর সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম ও আচারকে একদিকে খৃষ্টান মিশনারীদের অযথা আক্রমণ ও অপরদিকে গোঁড়া রক্ষণশীলদের অন্ধ ও দৃঢ় বাৎসল্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে মনোভাব অবলম্বন করিলেন, যে স্বাধীন চিন্তা, দৃঢ় যুক্তিবাদ ও তীক্ষ্ণ বাস্তববোধের প্রয়োগ করিলেন, তাহাতেই বঙ্গদেশের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ চিরকালের

জন্ম নিরূপিত হইল। এই বাদ প্রতিবাদের মধ্যে কোলাহলমুখর, উত্তেজিত প্রতিবেশে উপন্যাসের জন্ম হইল।" [বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলিকাতা (১৯৪৮), পৃঃ ১৬]।

উপন্যাসের জন্মের যে প্রতিবেশের এখানে নির্দেশ করা হয়েছে, ঐ প্রতিবেশে বাংলা নাটকও সৃষ্টি হয়েছিল বলা চলে। প্রমথনাথ শর্মার [ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়] নববাবু বিলাসকে (১৮২৩) প্রথম উপন্যাসের গৌরব দানকরলেও প্রকৃত উপন্যাসের লক্ষণ যে বইতে প্রথম পাওয়া যায় সেই 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (হ্যানা মুলেন্স রচিত) এবং পাশ্চাত্য আদলে লেখা প্রথম নাটক 'কীর্তিবিলাস' (যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত রচিত) একই বছরে অর্থাৎ ১৮৫২-এ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। 'আলালের ঘরের দুলাল' (প্যারীচাঁদ মিত্র) রচিত হয় এর দশ বছর পরে। আবার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) এবং প্রথম ঐতিহাসিক নাটক মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) রচনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র চার বছর। এই দুই-এর মাঝখানে ১৮৫৮-এ রচিত হয় ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত)।

শেষোক্ত এই তিনটি বই-এর কাহিনী পৃথক হলেও এক জায়গায় তাদের মিল আছে। ঔপন্যাসিক, কবি এবং নাট্যকার তিনজনই ঐতিহাসিক কাহিনী ব্যবহার করতে গিয়ে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেছেন অথবা যার পরিপ্রেক্ষিতে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা যায় এমন কাহিনী বেছে নিয়েছেন। সে যুগে এইটাই স্বাভাবিক ছিল। মধ্যযুগীয় একটা শাসন ব্যবস্থা অতিক্রম করে ভারতবর্ষে 'আইনের শাসন' প্রবর্তিত হচ্ছিল সত্যি, কিন্তু পরাধীনতার বেদনা ভুলে থাকা সম্ভব ছিল না।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন যে ব্যপক লুণ্ঠন, বঞ্চনা ও অত্যাচার চালাচ্ছিল[৮] এবং যে আবহাওয়া নবজাগ্রত ব্যক্তির পরিস্ফুরণের পক্ষেও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকা শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও একথা ঠিক যে লুণ্ঠন, বঞ্চনা ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় জাতির ক্রোধ যেভাবে জাগ্রত হতে পারতো তা হয় নি। ইতস্ততঃ প্রতিরোধ যে সৃষ্টি হচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু কোনও সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ায় বৃটিশ শাসনকে অপসারিত করার চেষ্টা হয় নি। তার ফলে বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধগুলিকে ধীরে ধীরে দমন

ক'রে ১৮৫৮-এ কোম্পানীর গোষ্ঠীগত লুণ্ঠনের ক্ষেত্র সমগ্র বৃটিশ শোষকশ্রেণীর লুণ্ঠন ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল।

যে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের মধ্য দিয়ে এই পরিণতি ঘটলো সেই বিদ্রোহকে এ দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে মোটেই ভাল চোখে দেখেননি তার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। এঁদের প্রতিষ্ঠান British Indian Association-এ দক্ষিণামোহন মুখোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে তাঁদের শ্রেণীগত মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে —Misguided wretches who have taken a part in this rebellion and thereby disgraced their manhood by drawing arms against the very dynasty whose salt they have eaten, to whose paternal rule they and their ancestors have for the last hundred years owed the security of their lives and properties, and which is the best ruling power that we have had the good fortune to have within the last ten centuries, and addressing as I am a society, the individual members of which are fully familiar with the thought and sentiments of their countrymen, and who represent the feelings and interest of the great bulk of her majesty's native subjects, I but give utterence to a fact patent to us all, that the govt. have done nothing to interfere with our religion, and thereby to afford argument to its enemies to weaken their allegiance." [Calcutta Review, 1857 pp 393-4].

এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, দক্ষিণামোহন-এর এই বৃটিশ প্রীতির সরিক সবাই ছিলেন না। শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যেও অনেকেই সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করতেন। এ কথা আমরা ভুলতে পারি না যে, সেদিন আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা তাঁতিয়া টোপীর উপর কবিতা লিখেছিলেন; বিহারীলালের 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় এটী প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাটি এমন জনপ্রিয় হয় যে, পাঠ্যপুস্তকে এটি সংকলিত করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু "পাছে রাজশক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে" পরিত্যাগ করা হয়েছিল।[৯] ১৮৭২-এ 'ভারতী' পত্রিকায় 'শ্রীস' এই ছদ্মনামে ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর যে প্রশস্তিমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়

—"যাহারা এই বিদ্রোহে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, অযথা ধারণ করিলেও, তাঁহারা বীর। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে ইহাদের ইতিহাসও বিদেশীদের গ্রন্থ হইতে সংকলন করিতে হয়। আমরা ঝান্সীর রাণীকে নমস্কার করি।" [ভারতী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২০০]। আবার যে ঈশ্বর গুপ্ত বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরকে পূজোর কথা বলেছেন তিনিও এই ঝান্সীর রাণীকে 'কুলটা' বলে ভর্ৎসনা করেছেন।

অর্থাৎ বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহের ফলাফল সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন— "সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল; এক নবশক্তির সূচনা হইল; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।" ['রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ,' পৃঃ ২২৪-২৫]।

সমাজে জাগরণ আগেই এসেছিল; যাকে বলা হয়ে থাকে উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ, তার সুরু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতেই ১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত [তদেব পৃঃ ৯৫] এবং তাঁর মতে সেটা হলো "প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা" [তদেব পৃঃ ৯৫]। যে নবজাগ্রত শ্রেণী সামাজিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পুরাতনকে ঝেরে ফেলে নতুনের প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো সেই শ্রেণীরই মধ্যেই বিদেশী শাসনের প্রতিক্রিয়ায় দেশাত্মবোধ জাগ্রত হলো।

: 'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণ :

পলাশীর প্রান্তরেই বঙ্গদেশে ইংরেজের প্রাধান্য সূচিত হয়। ১৭৫৭-এ পলাশীতে যে প্রাধান্যের সূচনা বক্সার যুদ্ধের [১৭৬৪] পরে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকে চললো সারা ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপনের দীর্ঘ সংগ্রাম এবং এক শতাব্দীর মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পক্ষে গোটা ভারতই জয় করে নিল। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ১৮৫৮-এ মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করে নিজ হস্তে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

এই সময় থেকে একটা নতুন যুগের সূচনা ধরলেও বাংলায় রেনেসাঁ [Renaissance] বলতে যা বোঝায় তার সুরু আগেই হয়েছিল।

ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেনেসাঁর শুরু। ১৪৫৩-এ তুর্কীদের হাতে গ্রীক অধিকৃত কনস্তান্তিনোপ্‌লের পতনের পর ঐ অঞ্চলের গ্রীক-রোমান পণ্ডিতেরা প্রথমটার ইতালী, পরে দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েন। এঁরা ছিলেন গ্রীক-রোমান সাহিত্য দর্শন, আদর্শ ও শিল্পরূপের পূজারী এবং মানবতাবাদী জীবনতত্ত্বের (Humanism) ধারক ও বাহক। এঁদের আগে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের চাপে প'ড়ে ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান সংকচিত হয়ে আসছিল, ধর্মীয় গোঁড়ামী মানুষের স্বাধীন বুদ্ধিকে করছিল লাঞ্ছিত। কনস্তান্তিনোপ্‌ল থেকে আগত ঐ গ্রীক-রোমান পণ্ডিতদের চেষ্টায় অতীতের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হলো, প্রচারিত হলো মানববাদী জীবনাদর্শ। মধ্য যুগের খৃষ্টান রক্ষণশীলতা অতিক্রম করে জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা, বিজ্ঞানের প্রতি কৌতুহল, মর্ত্যমুখীন শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হলো ; সংকীর্ণ ধর্মমতের প্রাধান্য লোপ পেয়ে মানব রসের নতুন বাণীর প্রসার লাভ ঘটলো। ফলে ইউরোপ লাভ করলো নবজীবন। একেই বলা হয় রেনোসাঁ বা নবজাগরণ। প্রায় এক শতাব্দী ধরে ইউরোপে এই নবজাগরণের বা নতুন বিকাশের বীজ বপন চলছিল। এই বীজ ইংলণ্ডে অঙ্কুরিত হলো ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। ইংলণ্ডে এই নতুন আন্দোলনের প্রসার ও পূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল সবচেয়ে বেশী। এর ফলে সেখানে এক নতুন জাতীয়তাবোধের উদ্ভব ঘটে। ১৫৫৮-এ স্পেনীশ আর্মাডার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে এই জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে ; জন্মলাভ করে গভীর আত্মপ্রত্যয়ী বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ইংরেজ জাতি। অর্থবলে, বাণিজ্যে এবং যৌবনে এরা তখন অদ্বিতীয়। এরই অনিবার্য ফল স্বরূপ দেখা দিল এক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ।

আমরা যখন বাংলার তথা ভারতের উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঙ্গে ইউরোপীয় বা ইংলণ্ডের নবজাগরণের তুলনা করি, তখন একটা কথা ভুলে যাই যে, নবজাগরণ সবচেয়ে ব্যাপক হয়েছিল যে ইংলণ্ডে সেখানে রেনেসাঁর সুরু স্পেনিশ আর্মাডার পরাজয়ের মধ্যে, আর আমাদের দেশে যাকে নবজাগরণ বলা হয় সেই নবজাগরণের সুরু পরাধীনতার সুদৃঢ় বন্ধনে।

ইংলণ্ডে স্পেনের আক্রমণের সূচনায় সমগ্র দেশে এক বিরাট ঐক্য স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল। এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে ইংলণ্ডের দেশ-প্রীতি

সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাণী এলিজাবেথ এই নবজাগ্রত দেশপ্রেমের প্রতীক ও প্রতিমা হয়ে উঠেছিলেন। কবি-কণ্ঠে তাঁর জয়গান ঘোষিত হয়েছিল, শত শত যোদ্ধা তাঁর পদপ্রান্তে ভক্তি-উপহার নিবেদন করেছিলেন। এর সঙ্গে যদি উনবিংশ শতকের ভারতবর্ষের তুলনা করা হয় তবে সম্পূর্ণ অন্য চিত্রই চোখে পড়বে।

দেশপ্রীতি তথা জাতীয়তাবোধ আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হলো, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠলো সত্যি, কিন্তু রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে তা পদে পদে বাধা পেলো।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে এদেশের অবস্থা: প্রাচীন কুটীর শিল্প মুমূর্ষু, লক্ষ লক্ষ কারিগর বৃত্তিচ্যুত—ফলে জমির ওপর প্রচণ্ড চাপ; দেশের বাণিজ্য কয়েকটি বিদেশী এজেন্সী হাউসের দখলে; বিদেশী মূলধনের নিয়োগ হয়েছে নীল চাষে। কলকাতা সহর গড়ে উঠেছে আধুনিক শিল্প-সহর হিসেবে নয়; শহর কলিকাতার বাসিন্দা তখনও শ্রমিক, শিল্পপতি নয়; ইউরোপীয় কর্মচারী, ভাগ্যবান বেণিয়া, গৃহ-ভৃত্য, কুলি, পাল্কীবাহক, গাড়ীচালক, পাইকারী ব্যবসায়ী, দিনমজুর এবং 'নববাবু' ও 'নব বিবি'দের নিয়ে সেদিনের কলিকাতা সহর। কলিকাতার চারদিকে অসংখ্য বস্তি, তার মাঝে মাঝে সাহেব ও বেণিয়াদের প্রাসাদ, গুদামঘর ও দোকান। বাঙালী বণিকশ্রেণী তখনও নিশ্চিহ্ন হয় নি; বড় বাজারের তুলা ব্যবসায়ীদের মধ্যে পাল, শেঠ, কুণ্ডু, মল্লিক এবং শীলরা তখনও সমৃদ্ধির মধ্যে। রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তুলবার চেষ্টা করছেন; সাহেবদের অনুকরণে দেশীয় বিত্তবানেরা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে পুঁজি নিয়োগ করছেন। কিন্তু ১৮৪৭-এ প্রসিদ্ধ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এবং অনেক ব্যবসায় ফেল পড়ার ফলে বিত্তবান বাঙালীরা জমির দিকে দৃষ্টি দিলেন। 'কার ঠাকুর কোম্পানী' এবং রাণীগঞ্জ কোলিয়ারীতে পুঁজি নিয়োগ করে যে দ্বারকানাথ ঠাকুর শিল্পপতি হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত হলেন জমিদার।

এদিকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই উত্তর বঙ্গে জমিদারদের আবির্ভাব ঘটেছে—এরা এসেছেন বণিক ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্য থেকে। এক সঙ্গে অনেক জমি কিনে এঁরা হয়েছেন 'লটদার'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন (১৭৯৩) পাশ হবার পরে সৃষ্টি হয়েছে আধি বা বর্গা প্রথা। জমিদারের পাশাপাশি এক শ্রেণীর জমির মালিকও গড়ে উঠেছে—এদের নাম জোতদার।

এই জোতদার চাষী নয়, চাষীর খাজনা তার আয়ের উৎস। চাষের খরচ, চাষের শ্রম বর্গাদারের অর্থাৎ অর্ধেক ভাগ পাবে এমন কৃষকের। মালিক কিছু খরচ না করেই অপর অর্ধাংশ ভোগ করবেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই জোতদারি প্রথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। চাষের সঙ্গে সম্পর্কহীন জমির উপর নির্ভরশীল একদল মধ্যবিত্ত এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এই শ্রেণীও যে জমিদারদের মতই ইংরেজ রাজের প্রতি অনুগত থাকবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

উনবিংশ শতাব্দীর উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর একটা অংশ এসেছিল উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার এবং চাকুরীজীবিদের মধ্য থেকে। সামান্য অবস্থা থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনেক মধ্যবিত্ত সমাজে স্থান লাভ করে নিয়েছিলেন। এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরাই নবজাগরণের নায়ক—বক্তা, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার এদের মধ্য থেকেই প্রধানত এসেছেন।

এই বুদ্ধিজীবিদের পেশার বিবরণ থেকেই বোঝা যায় যে তাদের কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্রে অতি সংকীর্ণ—ওকালতি ও শিক্ষকতা ছাড়া, মুনসেফ, সাব-ডেপুটি কালেক্টর, স্কুল পরিদর্শক-এইরূপ কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া সেদিনের স্নাতকদের অন্য কোনও পেশাগত সুযোগ ছিল না। প্রতিভা তখন অবহেলিত, উচ্চ সরকারী পদ সাহেবদের একচেটিয়া। জাতীয় আন্দোলনের এই হচ্ছে পটভূমি। বৃটিশ শাসকদের সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ক্রমশঃ মোহমুক্ত হচ্ছিলেন, তাঁরা জাতীয় আন্দোলন সংগঠিত করছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁরা বৃটিশ শাসকদের কাছ থেকে সুবিচার পাবার কল্পনায় বিভোর।

একটা বিদেশী শাসক শ্রেণীর ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা নতুন সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, আবার নবগঠিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্গে একদিকে সমাজের দ্বন্দ্ব এবং অন্য দিকে রাজশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্ব—এই পট-ভূমিকাতেই এ দেশে গড়ে উঠলো ঐতিহাসিক নাটক।

ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টির আগেই বাংলায় নাটক রচিত হয়েছে, কিন্তু সে নাটক অন্যরূপ।

: ঐতিহাসিক নাটকের আগের নাটক :

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর কলিকাতা সহরে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটকের অভিনয় হয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই প্রথম যবনিকা উন্মোচিত করেন

একজন রুশ নাগরিক—Geracim Stepanovitch Lebedef. কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিতের সহায়তায় 'The Disguise' নামে একখানি ইংরেজী নাটকের অনুবাদ ক'রে বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দিয়ে নাটকটী অভিনয় করা হয়েছিল। এটী ঐতিহাসিক নাটকও নয়, দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করাও এ নাটকের উদ্দেশ্য ছিল না। চিত্তাকর্ষক গান, সং, ভাঁড়ামি সহ একখানি কৌতুকপ্রদ নাটকের অভিনয় দ্বারা উঠতি সহর কলকাতার দর্শকদের মনোরঞ্জন করাই ছিল নাটকের উদ্দেশ্য।

এই প্রচেষ্টার অর্ধ শতাব্দী পরে ১৮৫২-এ-যে দু'খানি মৌলিক বাংলা নাটক রচিত হ'লো সে দু'টীও ঐতিহাসিক বা দেশাত্মবোধক নাটক নয়। এর মধ্যে একখানি, তারাচরণ শীকদার রচিত 'ভদ্রার্জুন'—পৌরণিক নাটক এবং অপর-খানি, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের কীর্তিবিলাস',—রূপকথার কাহিনী নিয়ে রচিত নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুল সর্বস্ব' কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে এবং 'নব-নাটক' বহুবিবাহ প্রমুখ কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচারোদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু রামনারায়ণ, কালী প্রসন্ন সিংহ, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির নাটকের মধ্যে পৌরাণিক নাটকের সংখ্যাই বেশী।

দেশাত্মবোধক এবং ঐতিহাসিক নাটক রচনা সুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহের পরে। দেশাত্মবোধক নাটকের উদ্বোধন করেন দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটক দিয়ে এবং তার পরেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় [Public Theatre] প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত নাট্যশালা ছিল সৌখিন নাট্যশালা। এই সৌখিন নাট্যশালার অধিকারীরা ছিলেন বিত্তবান লোকেরা। নাটক-মঞ্চে অভিনীত হোক—নাট্যকারের মনে এ আকাঙ্ক্ষা থাকলে তাঁকে নাট্য-শালার অধিকর্তাদের মুখ চেয়ে নাটক লিখতে হতো। এঁরা এমন নাটক চাইতেন যাতে ঐশ্বর্য-বিলাস ও আড়ম্বর প্রদর্শন সম্ভব। নিছক আমোদ প্রমোদ ছাড়া অন্য কোনও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল অনুপস্থিত। মাইকেলের মত নাট্যকারও এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেখানেই তিনি নিজের ভাবনা চিন্তা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন সেখানেই তাঁকে বিড়ম্বিত হতে হয়েছে। তাঁর 'সুভদ্রা'

নাটক অসম্পূর্ণ থেকে গেছে এবং 'রিজিয়া' নাটক পরিকল্পনাতেই বিসর্জন দিতে হয়েছে। তাঁর দু'টী প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বেলগাছিয়া নাট্যশালার অধিকর্তারা মঞ্চস্থ হতে দেননি।

সে যুগে নাটক অভিনীত হতো কলকাতার ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের নিজস্ব পরিবেশে। দর্শকদের প্রথম সারিতে থাকতেন রাজা, মহারাজা এবং বিদেশী রাজপুরুষ। দ্বিতীয় সারিতে থাকতেন 'বুদ্ধি, সুরুচি, বিজ্ঞতা, বিলাস ও সম্ভ্রমে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠের দেশীয় সমাজের যাঁহারা প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য।'[১১] দর্শকদের মধ্যে সাধারণ লোক দু'চারজন থাকতেন না এমন নয়। কিন্তু আজকের মত স্বল্পমূল্যের টিকিট ক্রয়কারী দর্শকদের মতামতের কোনও রূপ প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ছিল না।

বাংলা নাটক রচনার প্রথম যুগ থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারদের অধিকাংশই ছিলেন হয় সরকারী চাকুরে না হয় ১৭৯৩-এ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে সৃষ্ট রাজভক্ত ভূস্বামী সমাজের লোক। নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী সিপাহীবিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেনি। তারা সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদও চায় নি। 'সিপাহী যুদ্ধের মত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা যখন দূরে সরে যাচ্ছে মনে হলো তখন ভারতবাসীর এক বিরাট অংশ বৃটিশ শাসনকে স্থায়ীভাবেই গ্রহণ করলেন এবং এই নূতন শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে বা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে কি উপায়ে নিজেদের এবং বংশধরদের উন্নতি হতে পারে তারই চেষ্টা করতে সুরু ক'রলেন।'[১২]

সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারতব্যাপী বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহের মধ্যে ব'সেও বাঙালী নাট্যকারেরা নাটক রচনা করেছেন; কিন্তু তার উত্তাপ তাঁদের স্পর্শ করেনি। ১৮৫৭-৫৮, এই দু'বছর ধ'রে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল। এই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকখানি নাটক রচিত হয়।[১৩] মাইকেল মধুসূদন যখন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেন (১৮৫৮-এর শেষ ভাগে) তখনও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের অভিযান চলছে এবং নাটকটি যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁতিয়া টোপীর প্রাণদণ্ড হয়; লক্ষ্ণৌ-এর মাম্মুখানকে কারাদণ্ড দান করা হয় এবং বেরিলির খানকে গুলী ক'রে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহ শেষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে বৃটিশ পার্লামেণ্ট যখন শাসনভার গ্রহণ করলো এবং

ইংরেজ এদেশে ভালভাবে জেঁকে বসলো তখন নাটকের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চেতনা কিছুটা ফুটে উঠতে দেখা গেল। এর প্রথম পরিচয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। অবশ্য একটি দর্পণের মধ্যেই নাট্যকারদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ নয়, 'দর্পণ' আখ্যাত আরও কয়েকটি নাটকও এই সময় লেখা হয়।

এই নাটকগুলি সমসাময়িক ঘটনাকে ভিত্তি করে রচিত। এগুলির কাহিনী কাল্পনিক হলেও সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাই এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আজও অনস্বীকার্য।

ভারতের অতীত ইতিহাসকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক নাটক মাইকেলই প্রথম রচনা করলেন। টড-এর 'রাজস্থান' থেকে কাহিনী আহরণের যে পথ তিনি দেখালেন সেই পথ তাঁর পরবর্তী অনেক নাট্যকারই অনুসরণ করেছেন; তবে কারণটা পৃথক। মাইকেল 'রাজস্থান' থেকে কাহিনী আহরণ করেছিলেন অপরের নির্দেশে। একটি বিশেষ মঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে তিনি নাটক লিখতেন। তাই তাঁকে সেই মঞ্চের [বেলগাছিয়া নাট্যশালা] প্রভাবশালী অভিনেতা এবং সত্ত্বাধিকারীদের মুখ চেয়ে থাকতে হতো। বেলগাছিয়া নাট্যশালার যে প্রভাবশালী অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিকূল মনোভাবের জন্য 'রিজিয়া' নাটক পরিত্যক্ত হয় তাঁরই পরামর্শে মধুসূদন রাজপুত জীবন থেকে নাট্যিক উপাদান সংগ্রহ করেন[১৪]—রচনা করেন 'কৃষ্ণ-কুমারী নাটক।'

মধুসূদনের পরে যাঁরা রাজপুত জীবন নিয়ে নাটক রচনা করেন তাঁরা অন্য কারণে এদিকে ঝুঁকেছিলেন। রাজপুত জীবন 'বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ' সন্দেহ নেই এবং এই জীবন থেকে নাট্যিক উপাদান সংগ্রহ করা সহজ। আর এই জীবনের মধ্যে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আদর্শ নাটকারেরা খুঁজে পেয়েছিলেন সেটাই ছিল তাঁদের অন্যতম অনুপ্রেরণা। মোগল শক্তির বিরুদ্ধে রাজপুতদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে প্রতিভাত করার চেষ্টা করেছিলেন। বাস্তবিক রাজপুত জীবন নিয়ে লেখা নাটক ইংরেজ অধীন ভারতের দর্শকরা যখন দেখেছে তখন তারা ভুলে গেছে ঐ নাটকের ঘটনাস্থল কোনও বিশেষ অঞ্চল। তাই স্বাধীনতাকামী জনসাধারণকে ঐ নাটকগুলি উদ্দীপিত করেছে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার রাজপুত জীবন নিয়েলেখা নাটকের মোগল-রাজপুত সংঘর্ষ হিন্দু-মুসলিম-সংঘর্ষ হিসেবে প্রতিভাত হওয়ায় জনচিত্তে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আবার নাট্যকারেরা ঐ সব কাহিনীতে হিন্দু-মুসলিম মিলনের ভিত্তিও রচনা করার চেষ্টা করেছেন।

রাজপুত জীবন নিয়ে যাঁরা সে যুগে নাটক রচনা করেছেন তাঁদের মূল অবলম্বন ছিল টড-এর 'রাজস্থান'।

: টডের 'রাজস্থান' :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজস্থানের চরম দুর্দিনে Leut.-Col. James Tod-এর সঙ্গে রাজপুত জাতির পরিচয় ঘটে। ইনি ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক কর্মচারী (Political agent to the Western Rajput States). এটা বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, টডের পরিচয় ঘটেছিল রাজপুত শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে, রাজস্থানের জনসাধারণের সঙ্গে নয়। কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে টড শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই এই শাসক শ্রেণীর মধ্য দিয়ে রাজপুত জাতির যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রবাহিত টড তা-ই বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন, লোক সংস্কৃতির প্রবাহিত ধারা তাঁর চোখে পড়েনি। তবে রাজপুত জাতির শৌর্য বীর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজপুত জীবন রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'History of the Sikhs' নামক গ্রন্থের লেখক কানিংহামকে যেমন শিখজাতির প্রতি সহানুভূতির অপরাধে অকালে কর্মজীবন (কানিংহামও কোম্পানীর সামরিক কর্মচারী ছিলেন) থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবেই টডকেও অকালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়।

টড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নি। অধ্যাপনা বা গবেষণাও তাঁর কাজ ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে এবং কূটনীতির জগতে তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। তাই খাঁটি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছিল না। তিনি নিজেও এটা জানতেন। তাই ঐতিহাসিকের কৃতিত্ব ও মর্যাদা তিনি দাবী করেন নি,[১৫]

রাজপুত শৌর্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জগতের পরিচয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হন।

টড তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ 'Annals and Antiquities of Rajasthan' রচনা করতে গিয়ে প্রধানত যে উপাদানগুলি ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে রাজস্থানে প্রচলিত চারণগীতি এবং মধ্যযুগে রাজস্থানী ভাষায় রচিত কয়েকখানি কাব্য। ঐতিহাসিক বিচারে যে সব উপাদান নির্ভরযোগ্যরূপে বিবেচিত হয় টড তার খুব কমই ব্যবহার করেছেন। যে চারণগীতিকে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার আফিমখোরের গালগল্প (opium eater's tales) বলে অবহেলা করেছেন, টডের তা-ই ছিল প্রধান উপজীব্য। এই জাতীয় উপাদানের ভিত্তিতে যে প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয় না টড নিজেও সে বিষয়ে সজাগ ছিলেন। তাই তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করতে গিয়ে কানিংহামের মত 'History of the Sikhs বা গ্র্যাণ্ট ডাফের মত 'History of the Marhathas' এইভাবে নামকরণের চেষ্টা করেন নি; তিনি নামকরণ করেছেন Annals and Antiquities of Rajasthan.

টড রাজপুত জাতির সমগ্র ইতিহাস আলোচনা করেননি। রাজস্থানের ভৌগলিক সীমার বাইরে মালবের পরমার বংশ, কনৌজের গাহড়বাল বংশ অনহিলবাড়ার চৌলুক্য বংশ—এই সব রাজবংশের কাহিনী টডের রাজস্থানে নেই। এমন কি বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গুর্জর প্রতিহার বংশের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীও তাকে উদ্দীপিত করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (অর্থাৎ ভারতে বৃটীশ শাসন প্রতিষ্ঠার যুগে) রাজস্থানে রাজপুত শাসিত যে সব রাজ্য বর্তমান ছিল টড শুধুমাত্র তাদের কাহিনীই বর্ণনা করেছেন। এইগুলির মধ্যে মেবারের প্রতিই তাঁর বেশী আকর্ষণ দেখা যায়, যদিও টড যে যুগে মেবারের কাহিনী লিখেছেন সে যুগের মেবার মারাঠার লুণ্ঠনে বিপর্যস্ত, কুশাসনে দুর্বল এবং আফিম-এর প্রতি আসক্তিতে মেরুদণ্ডহীন।

তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে মেবারের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের কাহিনী টডের গ্রন্থে অসাধারণ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। আকবরের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের সংগ্রামকে টড সাম্রাজ্যবাদী পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রীসের সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বৃহৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র রাজ্য মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামের গুরুত্ব কতটা তা টড বিচার করেননি।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা ক'রে শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"তিনি (অর্থাৎ টড) এই সংগ্রামের আদর্শ ও মূলগতভাব প্রধানত কবির দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। রাজপুতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে স্বপ্নময় সচেতনতা তাঁহার বাস্তব বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে।" (শারদীয়া সংখ্যা 'বেতার জগৎ', ৪৮ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৩)।

কিন্তু আমার বিশ্বাস কবির দৃষ্টিভঙ্গি নয়, রীতিমত সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই টড ইচ্ছাকৃত ভাবেই এটা করেছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে টডের গ্রন্থের উৎসর্গ পত্র,ভূমিকা থেকেই। গ্রন্থটী George IVকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—"The Rajpoot princes, happily rescued, by the triumph of the British arms, from the yoke of lawlessness oppression, are now most remote tributoris to your Majety's extensive empire......" অর্থাৎ বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জয়লাভে রাজপুত জাতি একটী উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছে। শুধু টড নন, বৃটীশ ঐতিহাসিকেরা সবাই এইটাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বৃটীশ শক্তি স্বাধীনতা হারানো রাজপুত জাতি এবং বাঙালী জাতি, দুই জাতিকেই চরম অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে। অথচ ১৮১৭-এ রাজপুত রাজ্যগুলিকে এবং তার আগে ১৭৫৭-এ বঙ্গদেশকে কিভাবে বৃটীশ রাজশক্তি কুক্ষিগত করেছে তা কারও অজানা নেই। এই সব কুকীর্তিকে ঢাকবার জন্যেই তারা আমাদের 'মুক্তিদাতা' সেজেছে।

এই প্রচারের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হইনি এমন নয়। আমাদের নাট্যকারেরা মোগল-রাজপুতের সংগ্রাম কাহিনীর মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সঙ্গে দুঃখের সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁরা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। আবার জাতীয় আন্দোলন যখন তীব্র হয়েছে, নাটকে তখন হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর বন্যা বয়ে গেছে।

টডের গ্রন্থের ভূমিকায় পাতার পর পাতা একদিকে আট শতাব্দীর মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে বিষোদগার, অন্য দিকে 'হিন্দু'র অতীত মহত্বের কথা আছে। সেটা কিছু হিন্দু বা রাজপুত প্রীতিবশতঃ নয়। কারণ ওই দু'টী পাশাপাশি ধ'রে তারই মধ্য দিয়ে তিনি প্রচার করতে চেয়েছেন যে, বৃটীশ শাসন হিন্দুদের মুক্তি

দিয়েছে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক নাট্যকারদের তাই এ ব্যাপারে যতটা সতর্ক হওয়া উচিত ছিল তা তাঁরা হতে পারেন নি।

এ ছাড়া ঐতিহাসিক নাট্যকারেরা বিংশ শতাব্দীতে নাটক লিখতে গিয়ে তাঁদের যে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রাজপুত জাতির সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন সেটা দেশাত্মবোধের দিক থেকে যতই বাহবা পাক, ঐতিহাসিক বিচারে তা মর্যাদা পেতে পারে না।

একথা ঠিক যে, সামরিক দিক থেকে রাজপুত জাতি ভারতীয় সমাজে নতুন শক্তি সঞ্চার করেছিল। তুর্কীদের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার জন্ম তাদের জীবনদর্শন হয়েছিল—'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য···।' কিন্তু "রাজপুতদের রাজনৈতিক দৃষ্টি অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ দূরে থাকুক সমগ্র রাজস্থানও কোন রাজপুত রাজার কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'—এই স্বপ্ন তড়িৎ-প্রবাহবৎ কোন রাজপুত রাজার মানসলোক আলোকিত করে নাই। এমন কি, 'খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত' রাজস্থানকে এক রাজছত্রতলে আনয়নের স্বপ্নও কোনও রাজপুত রাজার নিদ্রাভঙ্গ করে নাই। প্রতিটি রাজপুত রাজ্য ছিল একটী কুল বা গোষ্ঠীর [clan] যৌথ সম্পত্তি। এই ব্যবস্থার সঙ্গে বৃহত্তর রাজ্যের কাঠামোর সঙ্গতি স্থাপন সম্ভব ছিল না। প্রধানত এই কারণেই রাজপুতের শৌর্য কখনও ভারতকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারে নাই।"—[শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেতার জগৎ, পূর্বোক্ত সংখ্যা, পৃঃ ৪৪]।

রাণা প্রতাপ সিংহ মেবারের স্বাধীনতার জন্মই সংগ্রাম করেন, রাজস্থানের স্বাধীনতার জন্ম নয়; যদিও নাটক দেখবার সময় বা প'ড়বার সময় প্রতাপ সিংহের অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী আমাদের ঐ কথাটা একেবারেই ভুলিয়ে দেয় এবং এই বীরত্বের কবিত্বপূর্ণ কাহিনী টডের রাজস্থান থেকেই গৃহীত।

টডের রাজস্থান নাটকের মাধ্যমেই বঙ্গদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এটি বাংলায় অনুবাদও হয়। অনুবাদ করেন বরদাকান্ত মিত্র। নাম দেওয়া হয় 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত'। অঘোরনাথ বরাট এবং উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'রাজস্থান' নাম দিয়ে এই পুস্তকের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ করেন।

: উদ্দেশ্যমূলক ইতিহাস :

টড-এর রাজস্থান যে উদ্দেশ্যমূলক রচনা সে কথা আগেই বলেছি; একথাও বলা

হয়েছে যে, বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা একই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিহাস সাজিয়েছিলেন। যারা টড-এর 'রাজস্থান'কে অবলম্বন করেছেন তাঁরা তাঁদের নিজেদের অজ্ঞাতসারেই টড-এর রচনার দ্বারা চালিত হয়েছেন।

আসলে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রেরণা এসেছে দেশাত্মবোধ থেকে। বিস্তৃত আলোচনার সময় দেখা যাবে যে, প্রায় সবগুলি ঐতিহাসিক নাটকই দেশাত্মবোধক নাটক এবং দেশাত্মবোধ প্রচারই সেগুলির মূল লক্ষ্য। এই কারণেই ইতিহাস থেকে জাতীয় বীরপুরুষ দাঁড় করানো হয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই বীর ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সবাইকেই জাতীয় বীর [National hero] হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কিনা সন্দেহ।

তা ছাড়া যে রাজপুত কাহিনী ও মারাঠাদের শৌর্য বীর্যের কাহিনী বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে বিধৃত হয়েছে তাদের দু'টিকেও এক পর্যায়ে ফেলা যায় না। মারাঠারা পেশোয়ার নেতৃত্বে হিন্দু রাজত্বের স্বপ্ন দেখেছিল এবং পাঞ্জাব থেকে মহীশূর পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। কিন্তু মানসিংহ প্রমুখ রাজপুত বীর কাবুল এবং বঙ্গদেশ শাসন করেন মোগল বাদশাহীর প্রতিভূরূপে —স্বাধীন নরপতি হিসেবে নয়। যে রাজপুত পৈতৃক ভূমিখণ্ড রক্ষা, স্বামীধর্মের প্রতি আনুগত্য বশত বা ধর্মের অবমাননা নিবারণের জন্যে আত্মবলি দিয়েছে তাদের প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা থাকার কথা। কিন্তু তাদের আত্মোৎসর্গের পিছনে বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না থাকায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তার গুরুত্ব কমে যায়। অথচ বাংলার ঐতিহাসিক নাট্যকারেরা সেই বৃহত্তর উদ্দেশ্যই তাঁদের ওপর আরোপিত করেছেন। ভৌগলিক কারণেই রাজপুতরা ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে তুর্কীদের প্রতিরোধ করেছে এবং এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাঁরা শুধু আত্মরক্ষার যুদ্ধই চালিয়ে গেছেন। সিন্ধু দেশকে আরব শাসন থেকে এবং পাঞ্জাবকে ইয়ামিনি-শাসন থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন নি। তাঁরা কোনও সময়ই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তো পারেনই নি, উপরন্তু তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ এতদূর গড়িয়েছিল যে, তার প্রকাশ গোটা জাতির পথে কলঙ্কজনক। যেমন, মহম্মদ ঘোরীর কাছে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পর জয়চন্দ্রের রাজধানী কনৌজ দীপমালায় সজ্জিত হবার দৃশ্য স্মরণ করলে ভারতীয়দের মাথা নীচু হয়ে যায়।

এই রাজপুত শৌর্য ম্লান হতে হতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ রাজপুত বৃটিশ পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো[১৭] এবং বৃটিশ লেখনীর মাধ্যমে তাদের গৌরব প্রচারিত হলো। পরবর্তীকালে বাঙালী কবি রঙ্গলাল সেই গৌরব কাহিনী প্রচার করতে গিয়ে গাইলেন—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—' (পদ্মিনী উপাখ্যান), বাঙালী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন "রাজসিংহ" এবং আরও পরবর্তীকালে বাঙালী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেন 'রাণা প্রতাপ', 'মেবার পতন' প্রভৃতি।

রঙ্গলাল যখন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' [১৮৫৮] রচনা করেন, বা মধুসূদন দত্ত যখন তাঁর কৃষ্ণকুমারী [১৮৬১] নাটক রচনা করেন কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর রাজসিংহ উপন্যাস রচনা করেন [১৮৮২] (তিনটি বই-ই রাজপুত জীবন নিয়ে লেখা) তখন রাজপুত জীবন এবং রাজপুত-মোগল সংঘর্ষ সম্পর্কে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপাদানগুলি আবিষ্কৃত হয় নি। 'রাজসিংহ' রচনা করতে গিয়ে তাই দুঃখ করে বঙ্কিম বলেছেন—"রাজপুতগণের বীর্য [মহারাষ্ট্রীয় দিগের অপেক্ষা] অধিকতর হইলেও এদেশে তেমন সুপরিচিত নহে।…প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতিপক্ষপাতী হিন্দুদ্বেষক।…… রাজপুত ইতিহাসের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না—স্বজাতি পক্ষপাত নাই, এমন নহে। মনুষী নামে একজন বিনিসীয় চিকিৎসক মোগলদের সময়ে ভারতবর্ষে বাস করেছিলেন। তিনিও মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; কক্র নামা একজন পাদ্রি তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিন জাতীয় ইতিহাসে পরস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কথা মিথ্যা, তাহার মীমাংসা করা দুঃসাধ্য।" ['রাজসিংহ'-এর চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা বা বিজ্ঞাপন, ১৮৯৩]

এই পরস্পর বিরোধী ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য [হিন্দুর বাহুবল ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য—'রাজসিংহ'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য] পথ করে চলেছেন। "বঙ্কিম জানিতেন, শুধু টডের 'রাজস্থান' [যাহার ভিত্তি ততোধিক ভীষণ কল্পনাপ্রিয় ডাউ সাহেবের মুঘল ইতিহাস], ফারসীজ্ঞান হীন অর্ম এবং মানুচী—এই তিন লেখক হইতেই তাঁহার ইতিহাস লওয়া, আর বর্ণনার জন্য বর্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইহার মধ্যে অর্ম আবার

নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, বেশীর ভাগ কথা মানুচী হইতে লইয়াছি।"—[যদুনাথ সরকার, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, 'রাজসিংহ'-এর ভূমিকা]

ইতিহাস গ্রন্থগুলির ঐ অবস্থা সত্ত্বেও বঙ্কিমকে ঐসব বই-ই অবলম্বন করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর পর থেকে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে রাজপুত ইতিহাস সম্পর্কে বহু উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে।[১৮] কিন্তু দুঃখের বিষয় নাট্যকারেরা সেগুলির সাহায্য তেমন গ্রহণ করেন নি ; টড সাহেবের প্রভাব এড়ানো অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। কারণ, ঐতিহাসিক তথ্যের নানা অসঙ্গতির মধ্যেও যেমন বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য ছিল 'হিন্দুর বাহুবল', তেমনি ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে নাট্যকারেরা যে দেশাত্মবোধক নাটকগুলি লিখেছিলেন তার মধ্যে বহু সংখ্যক নাটকের জাতীয় ভাব প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র বাংলা রঙ্গমঞ্চে দিক-স্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। মাইকেল তাঁর কৃষ্ণকুমারীতে দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করলেন, প্রহসনগুলিতে বাস্তব জীবনকে তুলে ধরলেন ; দীনবন্ধু সেদিনের জাতীয় জীবনের একটা সংগ্রামী ঐতিহ্যকে মঞ্চে আনলেন। কিন্তু এই ধারা বেশীদিন থাকলো না। ১৮৭২-এ 'নীল দর্পণ'-এর অভিনয় দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্বোধন হলো বটে, কিন্তু রঙ্গালয় শিগ্‌গিরই ভেসে গেল পৌরাণিক বর্ণাঢ্যতা, রোমান্স ও ধর্মীয় প্লাবনে। এই প্লাবন সৃষ্টি করলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনিই রঙ্গমঞ্চে সামন্তবাদ ও হিন্দু রিভাইভালিজমের পতাকা উড়িয়ে দিলেন। থিয়েটার গিয়ে পড়লো মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের হাতে। "গিরিশচন্দ্র এ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত সদাগরী অফিসে চাকুরী করিতেন। মাড়বারী ব্যবসাদারের হাতে পড়িয়া থিয়েটার ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত হইলে গিরিশচন্দ্র অফিসের চাকুরী ছাড়িয়া থিয়েটারে কায়েমীভাবে যোগ দিলেন। সে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ। নাট্যকার, অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এই প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারেই আরম্ভ হইল।" (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর,' ১৯৭২ সং, পৃঃ ২৮-২৯)

নাটক এই সময় হলো পুরোপুরি ব্যবসায় ভিত্তিক—নাট্যশালা হলো টাকা লগ্নী করার জায়গা। সুতরাং নাটক যা রচিত হতে থাকলো তার মধ্যে গান বাজনা, ভক্তির উচ্ছ্বাস, নৃত্য, জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যই প্রধান। কিন্তু বিংশ

শতাব্দীর সুরুতেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে নতুন জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটলো। এটা হিন্দু জাতীয়তাবাদ। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, তিলক প্রভৃতির প্রভাবে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ এক নতুন রূপ গ্রহণ করলো। বৃটিশ লেখক Mr. L. Hutchinson [যিনি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় এ দেশীয় রাজনীতিদেকর সঙ্গে অভিযুক্ত হয়েছিলেন] তাঁর Empire of the Naboob গ্রন্থে ঐ জাতীয়তাবাদীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—"তারা মনে করতো হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের দ্বারা তাদের অধঃপতনের কারণ স্বরূপ বৃটীশ শাসনের বিরুদ্ধে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করছে। বর্ত্তমান অসহায়ত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় তারা হিন্দুর অতীত গৌরবের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা লাভের উপায় হিসাবে হিন্দুর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতে থাকে।"

এই নবহিন্দুবাদই ছিল এ দেশের জাতীয়বাদের মূল ভিত্তি কেন্দ্র। এই জাতীয়তাবাদ বঙ্গ ভঙ্গের যুগে এমন ভাবে দেশের একাংশকে নাড়া দিয়েছিল যে, তার প্রভাবে গিরিশচন্দ্রকেও বৃটিশ বিরোধী সংলাপ সহ নাটক লিখতে হয়েছিল এবং এই ধরণের তিনটী নাটকই [সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম এবং ছত্রপতি শিবাজী] ঐতিহাসিক নাটক।

মোগল-রাজপুত কিংবা মারাঠা-মোগল সংঘর্ষের কাহিনীর মধ্য দিয়ে নাটকে দেশাত্মবোধ প্রচারের পেছনে নব্য-হিন্দু মানসিকতা যে কাজ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আবার এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ইতিহাসের মুসলমান নায়ককেও [হায়দর আলী, টিপু সুলতান, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম] জাতীয় বীর হিসেবেই প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছিল। এই সব নাটকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথাই ধ্বনিত হয়েছে।

প্রায় সর্বত্রই দেখা যাবে যে নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক ঘটনাকে যথাযথভাবে আঁকড়ে থাকেননি। ইংরেজকে সোজাসুজি আক্রমণ করার অসুবিধা থাকার জন্যও কেউ কেউ রাজপুত-মোগল বা রাজপুত-মারাঠা সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। সেখানেও হিন্দু-মানসিকতা এড়ানো যায়নি। এর ফল জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুখকর হয়নি—তাকে অবলম্বন করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প উদ্গীরিত হয়েছে।

: চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাঙালীয়ানা :

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যে সব বাংলা ঐতিহাসিক নাটক লেখা হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকই রচিত হয়েছে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি —এই সময়ের কোনও ঘটনা নিয়ে; অর্থাৎ রাজপুত, মারাঠা, শিখজাতি এবং তাদের সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ—এই সব বিষয়বস্তু নিয়েই বেশী নাটক রচিত হয়েছে। তবে রাজপুত জীবনের প্রতিই নাট্যকারদের আকর্ষণ বেশী। জাতীয় বীর হিসেবে যাঁরা নাট্যকার কর্তৃক চিত্রিত হয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন রাণা প্রতাপ সিংহ, রণজিৎ সিংহ, হায়দার আলী, টিপু সুলতান, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, নন্দকুমার প্রভৃতি। মোগল সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীদের মধ্যে তিনজন নাট্যকারদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন এবং তাঁরা হলেন ঔরঙ্গজেব, শাজাহান এবং নুরজাহান।

দূর ইতিহাসের খুব কম কাহিনীই নাটকে রূপায়িত হয়েছে। অশোককে নিয়ে একাধিক নাটক রচিত হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তও নাটকে প্রাধান্য পেয়েছেন; আর পেয়েছেন পুরু।

খাঁটী বাঙালী চরিত্রের মধ্যে যাঁর নাম প্রথমে করতে হয় তিনি প্রতাপাদিত্য —একাধিক নাটকে তিনি স্থান পেয়েছেন। মহারাজ নন্দকুমারকে নিয়েও একাধিক নাটক রচিত হয়েছে। আর একজন কম খ্যাত বাঙালী বীর নাটকে স্থান পেয়েছেন; তাঁর নাম শোভা সিংহ [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের নায়ক]।

এই বঙ্গদেশের ইতিহাস থেকে যে সব কাহিনী নেওয়া হয়েছে (স্বপ্নময়ী, প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, নন্দকুমার, বাংলার মসনদ, পলাশীর প্রায়শ্চিত্য প্রভৃতি) সেগুলিতে স্বভাবতঃই বেশ কিছু বাঙালী চরিত্র উত্থাপিত হয়েছে। তবে ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মোগল, রাজপুত, মারাঠা, শিখ প্রায় সবাইকেই নাট্যকারেরা প্রায় বাঙালী করে ছেড়েছেন।

বাঙালী চরিত্রের যেমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি বৈশিষ্ট্য রয়েছে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের। এই বিশ শতকের মধ্যভাগ এবং তার পরবর্তীকালের কথা নয়। কারণ এই যুগে বাঙালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবন রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতে ভেঙে গিয়ে ক্রমশ নতুন রূপ নিচ্ছে।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকের মধ্যে যখন ঐতিহাসিক নাটক লেখা হচ্ছিল তখনও নাতি-নাতনী নিয়ে বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ সমুন্নত। এই পরিবারে অনূঢ়া, বিশেষভাবে বিধবা মেয়েরা পিতার সেবায় রত; পুত্র-কন্যার প্রতি পিতামাতার অগাধ স্নেহ। ঐতিহাসিক নাটকগুলিতেও এমনি পরিবার পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে বাঙালীর ভাবপ্রবণতা, আবেগ, কোমলতা সব কিছুরই সন্ধান মিলবে ঐতিহাসিক নাটকের দুর্ধর্ষ চরিত্রগুলিতেও।

"ভ্রাতৃরক্তে সিংহাসনে অভিষেক যাঁর" সেই শাজাহান দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সেক্‌সপীয়রের কিং লীয়রের সঙ্গে তুলনীয় হয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে দ্বিজেন্দ্রলালের শাজাহান প্রকৃতপক্ষে বাঙালী স্নেহময় পিতা। তাই তো সাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের মিলনের মধ্যে নাটক শেষ হয়েছে; কিং লীয়রে ঐ পরিণতি অকল্পনীয়।

বাঙালী নাট্যকারেরা বাংলা ভাষায় নাটক রচনার সময় স্বভাবতই বাংলা প্রবচন, ইডিয়ম, অলংকার ব্যবহার করবেন—এটা স্বাভাবিক। তবুও প্রয়োজনে যখন বহু ইংরেজী শব্দ, বাক্য এবং কিছু কিছু আরবী পারসী শব্দ নাটকগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে, তখন ঐ শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে আরও একটু সতর্ক হওয়া যেতো। সম্বোধনে 'দিদি'র স্থলে 'বহিন' হলে সংলাপের মেজাজ থাকতো। কিন্তু নাট্যকারেরা নারী চরিত্রের আবেগ প্রকাশের ব্যাপারে একেবারে সব বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাইতো লুৎফউন্নিসাকে সিরাজের উদ্দেশ্যে বলতে শুনি: "—যেদিন তোমার ভেরী বাজবে, সমাধির মোহনিদ্রা ভঙ্গ হবে, সেদিন যেন জাগরিত পতির সঙ্গে তোমার শ্রীচরণ দেবদূতের সঙ্গে পূজা করতে পারি। হে অন্তর্যামিন্, সতীর অন্তর ব্যথা বোঝো" [গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', ৫ম অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক]। এ একেবারে বাঙালী হিন্দু রমণীর কথা।

রাজ্যহারা হয়ে রাণা প্রতাপ [দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটক] যখন গিরিগুহায় আশ্রয় নিয়েছেন তখন তাঁর পারিবারিক জীবন একেবারে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই পরিবারে এসে আকবর কন্যা মেহের উন্নিসা আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং ইরার (প্রতাপ কন্যা) সঙ্গে সখিত্ব বশতঃ তার শয্যাপার্শ্বে উঠে বসেছে সে। যেন দু'জনে এক পরিবারভুক্ত। এই দৃশ্যটি সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলেছেন: "এ এখনকার দিনে

কোন বাঙালী রাণা প্রতাপের পক্ষে হয়তো সম্ভব হতে পারিত, কিন্তু রাজপুতনার রাণা প্রতাপে যে ইহা সম্ভব তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না।" ['রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৯৭২, পৃঃ ৬৪]

: উত্তেজনা ও ভাবালুতার আতিশয্য :

বাংলা নাটকের সুর ও তার বিকাশ ঘটেছে বৃটীশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে অর্থাৎ বিদেশী শাসনের আমলে। এই বৃটীশ শাসনের আগে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু মুসলমান আমলে ভারত পরাধীনতা বরণ করলেও ইংরেজ আমলের মতো মানুষের মনে পরাধীনতার অনুভূতি বাসা বাঁধেনি। কারণ মুসলমান নবাবগণ বিদেশী হলেও এখানে এসে ভারতের বিরাট জাতি-দেহে লীন হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ আমল অন্যরূপ। বঙ্গভঙ্গ যুগের দেশপ্রেমিক সখারাম গণেশ দেউস্কর-এর ভাষায় বলতে গেলে : "মুসলমান আমলে ভারতবাসী পরতন্ত্রাধীন হইলেও এরূপ পরাধীন ছিল না। ইংরাজ আমল হইতেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতা ও পরতন্ত্রের সূত্রপাত হইয়াছে।" এই পরতন্ত্রের ব্যাপারটা বিদেশী সরকার ভালভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, অবশ্য তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই। তাঁরা দেশের লোকের মতামত প্রকাশের বাহনগুলির ওপর উপর্যুপরি আঘাত হেনে চলছিলেন।

এদেশে প্রথম সাময়িক পত্র প্রকাশ হবার ১৯ বছরের মধ্যেই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। নাটক ও নাট্যশালার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই মৌলিক নাটক সৃষ্টির ২৪ বছরের মধ্যেই নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন জারী করা হয় (১৮৭৬-এ)। এই আঘাতের ফলে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে স্বদেশানুরাগের যে ঢেউ উঠেছিল তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে অবলম্বন করে আবার রঙ্গালয়ে নাটকের জোয়ার আসে। এই জোয়ার প্রকৃতপক্ষে দেশাত্মবোধক নাটকের জোয়ার ; আর এই দেশাত্মবোধ ব্যক্ত হয় ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বন করে। এই দেশাত্মবোধকে কেউ কেউ বলেছেন "জাতি-বৈরিতার বিষ" এবং এই বিষ উদ্গীরণ হওয়ার ফলে নাট্যশিল্প নষ্ট হয়েছে বলেও আক্ষেপ করা হয়েছে। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছেন : "ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাসণ, ঐতিহাসিক চরিত্রের যথাযথ মর্যাদা রক্ষণ, এ সকল ভাব ঐতিহাসিক

নামধেয় নাটক হইতে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে। Sensation বা উত্তেজনাই ঐতিহাসিক নাটকের মূল মন্ত্র হইয়া নাট্যসাহিত্যকে এমনই হীন স্তরে নামাইয়া দিয়াছে যে, সে কথা স্মরণ করিতেও লজ্জা হয়। সত্য অপেক্ষা মিথ্যা আস্ফালন এবং মিথ্যা অভিমানই বহু ঐতিহাসিক নাটকের প্রতিপাদ্য হইয়া পড়িয়াছে। দেশময় তখন একটা উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। সেই উত্তেজনাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার নাট্যশালা উদর পূরণ করিয়াছে। কিন্তু মনের খোরাক বিশেষ কিছু আহরণ করিতে পারে নাই।······পাঠক যদি একটু অবহিত হইয়া তখনকার ঐতিহাসিক নাটক পাঠ করেন তাহা হইলে দেখিবেন, কাব্যের অমৃত ধারা অপেক্ষা জাতিবৈরিতার বিষ তার সর্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিবেন যে রাজা বা স্বদেশ প্রাণ উদার চরিত্র আঁকিতে গিয়া কতকগুলি প্ল্যাটফরম স্পীকারের সৃষ্টি করা হইয়াছে।" ['রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর', পৃঃ ৯৩, ১৯৭২-এ সংস্করণ]।

দেশাত্মবোধ বা দেশপ্রেমের উত্তেজনাকে আমি 'জাতিবৈরিতার বিষ বা মাদকতা' বলতে রাজী নই; তবে একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, ঐ উত্তেজনার ফলে ঐতিহাসিক নাটকে বহু অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং ঐতিহাসিক নাটকের একটি বাঁধাধরা প্যাটার্ণ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

রাজনৈতিক-উত্তেজনার মধ্যে লেখা নাটকগুলিতে একটা বাঁধা ছক—'নাটকে দুইটী দল; একদল নিপীড়িত ও একদল অত্যাচারী'—এটা তখনকার দিনের বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া থেকেই এসেছে। তবে এই প্রতিক্রিয়া অনেক সময় এমন সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে তা শুধু নাট্যশিল্পকেই নষ্ট করেনি, রীতিমত অসঙ্গত হয়ে উঠেছে।

নাটকে একটা বিশেষ কালের মূল দ্বন্দ্ব সহ অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলি রূপ লাভ করবে এবং তা হলেই ইতিহাসের অসংলগ্ন ঘটনাগুলিও বিশেষভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বাঙালী ঐতিহাসিক নাট্যকারেরা কালের মূল দ্বন্দ্বকে রূপ দেবার চেষ্টা না করে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যাঁর হাতে এই দেশাত্মবোধক নাটকের সূত্রপাত হয় সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য: "হিন্দু মেলার পর হইতেই কেবল আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীর গাথা ও

ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন কতকটা সিদ্ধ হইবে।" ['জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

কারও কারও এ ব্যাপারে আন্তরিকতাও ছিল না। স্রেফ ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্যে মঞ্চাশ্রয়ী নাটকে দেশপ্রেমের ভিয়েন দিয়ে তাঁরা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র নিজেই বলেছেন: "আজকাল নাটক লিখি না, কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য লিখিয়া দিই, নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ যাহা ইচ্ছা রাখেন, যাহা তাঁহাদের মনঃপূত না হয় তা ফেলিয়া দেন।" ['রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৪] একই স্থানে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন: "তাঁহার [অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের] সিরাজদ্দৌলা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক, কিন্তু তিনি নিজেই বলিতেন যে, 'মীরকাসিম' নাটক লিখিতে গিয়া তিনি কেবল মীরকাসিমের ওকালতী করিয়াছেন। মীরকাসিম প্রতি যুদ্ধে হারিয়া পালাইতেছেন, আর প্রতিবারই তাঁহাকে বলিতে হইতেছে—আমি না পালাইলে, আমি মরিলে কে বাঙ্গালা রক্ষা করিবে? আর প্রতিবারই দর্শক সেই কথায় করতালি ধ্বনি করিতেছে।"

প্রকৃতপক্ষে প্রেক্ষাগৃহে এই করতালি লাভের জন্যই যত রকমে সম্ভব উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। কখনও রাজসভার প্রহরী বিদেশী দূতকে জুতো ছুঁড়িয়া অভ্যর্থনা করছে; কখনও নবাবজাদার বিবাহের শোভাযাত্রার মধ্যে ধূমকেতুর মতো উপস্থিত হয়ে রাজপুত যুবক তাঁকে লাথি মারছে; কখনও বক্তৃতার তোড়ে মুসলমান চরিত্র হিন্দু হয়ে যাচ্ছে, কখনও হিন্দু চরিত্র কিম্ভূত-কিমাকার রূপ ধারণ করছে। আগাগোড়া উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস। এই অবস্থার মধ্যে বিশেষ কালের প্রকৃত দ্বান্দ্বিক রূপায়ণ কি করে সম্ভব? ফলে সে যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকই হলো ভাবালুতাপূর্ণ রোমান্টিক এবং নাট্যকারেরা বেছে বেছে ইতিহাস থেকে রোমান্টিক উপাদানই সংগ্রহ করতে লাগলেন। তার ফলে অধিকাংশ নাটকই হয়ে উঠলো উদ্দেশ্যমূলক নাটক, ইতিহাসের বিশ্লেষণও হলো উদ্দেশ্যমূলক, আতিশয্য ঘটলো উত্তেজনা ও ভাবালুতার।

১। 'বাংলার ইতিহাস' [বিবিধ প্রবন্ধ]

২। 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' [ইতিহাস]

৩। অথর্ববেদ [১১, ৭, ২৪], ব্রাহ্মণ [শতপথ ও গোপথ], উপনিষদ [বৃহদারণ্যক ২৪, ১০] এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে 'পুরাণ' শব্দটি ইতিহাস প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। The Cambridge Modern History : Its Origin, Authorship and Production [1907] pp. 10-12

৫। The New Cambridge Modern History [1957] pp. XXIV-XXV.

৬। E. H. Carr. 'What is History ?'

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য', পৃঃ ১৬১

৮। "There is no end to the violence and plunder which is called British rule in India"—Lenin 'Inflamable Material in World Politics', 1908.

৯। বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ,' পৃঃ ২০১

১০। অনূদিত নাটকের নামকরণ হয় 'কাল্পনিক সংবদল'। ডঃ মদনমোহন গোস্বামী Central State Archive of Literature & Art of the U.S.S.R থেকে লেবেডেফ-এর বই-এর পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্র প্রতিলিপি এনে 'কাল্পনিক সংবদল'-এর মূল ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। সেই বইতে The Disguise-এর লেখক হিসেবে নাম রয়েছে এম্. জোডরেল-এর।

১১। হিন্দু পেট্রিয়ট, ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৫৭।

১২। "As the prospect of further armed rising seemed remote most Indians accepted Brittsh connection as a permanancy, the more thoughtful began to consider how best they could influence the foreign government under which they and their children were fated to live.—" Edward Thompson and G. T. Garratt, 'Rise and fulfilment of British Rule in India', Allahabad

১৩। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), সাবিত্রী সত্যবান (১৮৫৮), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' (১৮৫৮) প্রভৃতি।

১৪। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মধুসূদনকে লিখেছিলেন—"রাজপুত জাতির ইতিহাস এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, মধুসূদনের স্থায় প্রতিভাবান পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থ রচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।"

১৫। "I should observe that it never was my intention to treat the subject in the severe style of history, which would have excluded many details useful to the politician as well as to the curious student", : [টড-এর গ্রন্থের ভূমিকা]

১৬। ..... in both countries the men had lost their natural heritage of independence, and were at the mercy of oppressors." [Edward Thompson and G. T. Garratt, 'Rise and fulfilment of British Rule in India ; Allahabad

১৭। ১৮১৭ থেকে ১৮২৩-এর মধ্যে রাজপুত রাজ্যগুলি বৃটীশের আশ্রয় গ্রহণ করে। "Thus the Rajput States, who were, as Lord Hastings himself said, 'natural allies' of the Company, sacrificed their independence for protection and accepted British paramountcy." —'An advanced, history of India', by Majumder, Roychoudhuri and Dutta, New York

১৮। "বঙ্কিমের পর এই অর্ধশতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে যে সব ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ফলে এই রাজপুত-মুঘল সংঘর্ষের ইতিহাস একমাত্র সমসাময়িক বর্ণনা হইতে যেমন বিস্তৃত ও বিশুদ্ধভাবে রচনা করা যায়, এমন আর কোন যুগের ভারত-ইতিহাসে সম্ভব নহে।" [যদুনাথ সরকার, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, 'রাজসিংহ'-এর ভূমিকা]

২.
ঐতিহাসিক নাটকের প্রস্তুতিপর্ব

ইতিহাসের পাত্র-পাত্রী এবং ইতিহাসের পরিচিত কাহিনী নিয়ে লেখা মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' থেকেই বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের সূত্রপাত ধরা হয়ে থাকে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও 'কৃষ্ণকুমারী'র আগে ও পরে লেখা কয়েকটি নাটককে আমরা ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনার ক্ষেত্রে বাদ দিতে পারি না। এই নাটকগুলি হচ্ছে 'নীলদর্পণ', 'চা-কর দর্পণ' এবং 'জমিদার দর্পণ'। ইতিহাস বলতে যদি শুধু রাজা মহারাজাদের বংশাবলীর কীর্তিকাহিনী না বোঝায়, তা হলে এই নাটকগুলি যে ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই রচিত সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এই সব নাটকে ইতিহাসের পরিচিত পাত্র-পাত্রী না থাকলেও এবং যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলিই হুবহু ইতিহাসের নথিভুক্ত ঘটনা না হলেও সেগুলি অবাস্তব ঘটনা নয় ; নামগুলি কাল্পনিক হলেও অনেক সত্য ঘটনার তারা বেনামী নায়ক বা নায়িকা। তা ছাড়া ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে যা অপরিহার্য, সেই কালসচেতনা এবং কালের মূল ও গৌণ দ্বন্দ্বগুলি এই সব নাটকে রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর ১৮৫৮-এ প্রকাশিত রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানে স্বাজাত্যবোধের যে সুরটি বেজে উঠেছিল তার বছর দুই পরে প্রকাশিত নীলদর্পণে সেই সুর নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

: নীলবিদ্রোহ ও নীলদর্পণ :

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের পুরাতন সমাজের ভিত্তি ও কাঠামো ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে মহামন্বন্তর (১৭৬৯-৭০) সৃষ্টি করে। এই মহামন্বন্তরের মহাশ্মশানের ওপরে আত্মপ্রকাশ করে বিদ্রোহী ভারতবর্ষ : সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-৭৮), মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৩-৮৩), ত্রিপুরার সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯), কৃষক-তন্তুবায়ের সংগ্রাম (১৭৭০-৮০), পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭), এমন বহু বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত

হ'তে থাকে। নীল-চাষীদের সংগ্রামও সুরু হয় ১৭৭৮ থেকেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে নীলচাষীদের প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে। চতুর্দিকের এই বিদ্রোহের মধ্যে দাঁড়িয়েই দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬০-এ 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন।

নীলের চাষ এবং উদ্ভিজ্জ নীল রং প্রস্তুতের আদিস্থান ভারতবর্ষ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই যে সব জিনিস নিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায় আরম্ভ করে নীল তাদের অন্যতম।[১] লুই বন্নো নামক একজন ফরাসী ১৭৭৭-এ বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম নীলের চাষ আরম্ভ করেন। পর বৎসর ক্যারেল ব্লুম নামক একজন ইংরেজ নীলকুঠি স্থাপন করে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের কাছে একটি মেমোরেণ্ডাম দাখিল করে কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ব্যাপকভাবে নীলের চাষ সুরু করার অনুরোধ জানান। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হবার পর ইংলণ্ডে উন্নত বস্ত্রশিল্প গড়ে ওঠার পরেই নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বাংলা ও বিহারে ব্যাপকভাবে নীলের চাষ সুরু হয়। যে নীল সেই সময় উৎপন্ন হতো তার সবটাই কোম্পানী কিনে নিত—বাংলাদেশ থেকে প্রতি পাউণ্ড নীল চার আনায় কিনে ইংলণ্ডে পাঁচ থেকে সাত টাকায় বিক্রয় করতো। নীলের চাষ এমন লাভজনক হয়ে দাঁড়ায় যে, কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও চাকুরী ছেড়ে নীলকুঠি স্থাপন করে। '১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ১২৮০০ মণ নীল উৎপন্ন হয় এবং সেই সময় থেকে এক বঙ্গদেশই সমস্ত পৃথিবীর নীলের চাহিদা মেটায়।'[২]

প্রথম দিকে নীলকরেরা দেশীয় জমিদারদের প্রলুব্ধ ক'রে তাঁদের প্রজাদের দিয়ে তাদের জমিতেই নীল চাষ করাতেন এবং ফসল কিনে নিয়ে নিজেরা নীল রং নিষ্কাসণ করাতেন। পরে নিজেরাই জমিদারী কিনে বা ইজারা নিয়ে নীল চাষ করাতে থাকেন। তাঁদের অর্থ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সংগে সংগে তাঁরা নিজেদের জমিদারী ছাড়াও অন্যান্য জমিদার ও জোতদারের প্রজাদের জোর ক'রে দাদন বা আগাম টাকা দিয়ে তাদের চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নিতেন। এই চুক্তিপত্রে চাষীকে কি পরিমাণ জমিতে নীল বপন করতে হবে এবং কি মূল্যে সেই নীল গাছ নীলকরের নিকট বিক্রয় করবে তা লেখা থাকতো। চাষী কোনও কারণে চুক্তির শর্ত পূরণ করতে অসমর্থ হলে তার রেহাই মিলতো না। একবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলে আমৃত্যু নীল বপন করতে হতো। নীল

বপনে অস্বীকার করলে চাষীর ওপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার চলতো। নীল বপনে স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নীলকরের কুঠীতে বন্দী অবস্থায় শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো; অর্থাৎ পদাঘাত থেকে সুরু ক'রে 'রামকান্ত' ও 'শ্যামচাঁদ' নামে এক ধরণের চামড়ার তৈরী চাবুকের প্রহারে জর্জরিত হ'তে হতো। এতেও রেহাই ছিল না—নীলকরের পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল সেই চাষীর বাড়ী ঘর লুঠ করতো, ঘর জ্বালিয়ে দিতো এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের পথের ভিখারী ক'রে ছাড়তো। "আঠারো শতকের শেষ ভাগে ভারতে নীল চাষ বিস্তারের সময় ইউরোপীয়েরা এ দেশে এসেছিল দাস-মালিকের মনোবৃত্তি নিয়ে। নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রের প্রচণ্ড লোভের সংগে উদ্ভাবনী কল্পনা শক্তি মিলিত হ'য়ে যত প্রকার উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল, তার প্রত্যেকটীকেই নীলকর সাহেবেরা এ দেশে প্রয়োগ করেছিল। বাংলাদেশের ফৌজদারী আদালতের সমসাময়িক নথিপত্রই এই অকাট্য প্রমাণ বহন করে যে, নীল-চাষ প্রবর্তনের দিনটি থেকে সুরু ক'রে তা একেবারে না উঠে যাওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত পন্থায় রায়তদের নীল চাষে বাধ্য করা হ'তো তার মধ্যে ছিল হত্যাকাণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে খুন, ব্যাপকভাবে খুন, দাঙ্গা, লুঠতরাজ, গৃহদাহ, লোক-অপহরণ।"[৩]

এই অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থনা করলে সুফল পাওয়ার কোনও আশা ছিল না। তখনকার দিনে উচ্চপদে ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হতো না। বিশেষভাবে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের বিচার করার ক্ষমতা ছিল না। ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট বা অন্যান্য ইংরেজ বিচার-পতির আদালতে নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রলে বিচারকরা স্বজাতি-প্রিয়তা বশে নীলকরদের প্রতি পক্ষপাত করতেন—বিচার প্রহসনে পরিণত হতো। সুতরাং সুবিচার তো হতোই না, উপরন্ত নীলকরদের আক্রোশ বেড়ে যেতো এবং চাষীর সর্বনাশ ঘটতো।

এইভাবে নীলকরদের দোর্দণ্ড প্রতাপ অপ্রতিহত হ'য়ে উঠবার ফলে কোনওরূপ দুষ্কার্যই তাদের অকরণীয় রইলো না। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় চাষীরাও প্রতিরোধ করতে সুরু করলো। বাংলাদেশের পল্লী-প্রান্তরে নীলকরের ভাড়াটে গুণ্ডাদলের সংগে কৃষকদের অনেক খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের আক্রমণের মুখে নীলকরদের পিছু হটতে হয়েছে। Calcutta Review [1848]

পত্রিকায় জনৈক ইংরেজ 'Planters some 30 years ago' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন : "অসংখ্য ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা আমরা জানি। মাত্র দু'একটী নয়, এমন শত শত মুখোমুখি সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করতে পারি যেখানে দু'জন তিনজন এমন কি দুশ'জনও নিহত হয়েছে এবং আহতও হয়েছে সেই অনুপাতে। অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধে 'ব্রজ'ভাষাভাষী ভাড়াটে সৈন্যরা এমন দৃঢ়তার সংগে যুদ্ধ করেছে যে. তা যে-কোন যুদ্ধে কোম্পানীর সৈনিকদের পক্ষে গৌরব-জনক হতো। বহু ক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদের তেজস্বী ঘোড়ার পিঠে চেপে অতি দক্ষতার সংগে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকেরা সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা নীলকুঠি-ধূলিসাৎ করে দিয়েছে ; অনেক জায়গায় এক পক্ষ বাজার লুট করেছে, তার পরক্ষণেই অপর পক্ষ এসে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।"

নীলকর সাহেব এবং নীল চাষীদের নিয়ে লেখা 'নীলদর্পণ'। দীনবন্ধু ডাক-বিভাগে কাজ করতেন। তিনি প্রথমে ছিলেন পোষ্টমাষ্টার, পরে সুপারিণ্টেডেণ্ট -এর পদে উন্নীত হন। সুপারিণ্টেডেণ্ট-এর কাজ উপলক্ষে তাঁকে বাংলা, বিহার-ওড়িষ্যা এবং আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সফর করতে হয়। এই ব্যাপক পরিভ্রমণের ফলে তাঁকে বহু লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়। এইভাবে তিনি লোকচরিত্র সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন। "লোকের সংগে মিশিবার তাঁর অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্বক সকল শ্রেণীর সংগে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রাতার মত গ্রাম্য বালক ; পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত শহুরে মাতাল, অটলের মত নগর-বিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্য শোণিতপায়ী রাক্ষসী, নদের চাঁদ, হেমচাঁদের মত উন্ পাঁজুরে বরাখুরে হাপ্-পাড়াগেয়ে হাপ্-শহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডিপুটী, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন, তাগাদগীর, উড়ে বেহারা, পেঁচোর মা কাওরানীর মত লোকের পর্যন্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র জানিতেন।" [—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়][৪]

'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হবার পূর্ববর্তী দশ বৎসরের মধ্যে নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে প্রকাশিত হ'তে থাকে। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা এবং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় ঐ সব বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' পুস্তকেও নীলকরের অত্যাচারের বিবরণ দান করেছেন।

সুতরাং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও দীনবন্ধু পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি থেকে নীলকর সাহেব এবং নীলচাষীদের বিষয় ভালভাবেই জেনেছিলেন। তাঁর এই সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে শুধু একটি দিকই মাত্র তুলে ধরেছেন এবং তা হচ্ছে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও সেই অত্যাচারের সম্মুখে প্রজাদের অসহায় অবস্থা।

স্বরপুর একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম এবং গ্রামের অদূরে বেগুনবেড়ের নীলকুঠি—এই হচ্ছে 'নীলদর্পণের' ঘটনাস্থল। কুঠির দেওয়ান, আমিন প্রভৃতির সহায়তায় চাষীদের উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে বাধ্য করা; দাদন গ্রহণে অনিচ্ছুক চাষীদের ধ'রে এনে পদাঘাত; 'রামকান্ত', 'শ্যামচাঁদ' দ্বারা প্রহার; কুঠির গুদামে চাষীকে আটক করা; পদী ময়রানীর মত দুশ্চরিত্রার মাধ্যমে কুলনারীকে ফুসলান এবং অসমর্থ হয়ে লাঠিয়ালদের সাহায্যে ধ'রে এনে পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা এবং অত্যাচার; ফৌজদারী কাছারীতে বিচারের প্রহসন—এ সবেই বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন রয়েছে। এমন কি ক্ষেত্রমণির ওপর অত্যাচার একটি সত্য ঘটনার বিবৃতি বললেও ভুল হবে না। কারণ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত Hindu Patriot পত্রিকায় এ-বিষয়ে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল তাকে অবলম্বন করেই দীনবন্ধু ঐ ঘটনাটি বিবৃত করেছেন। সংবাদটী এই: 'অর্চিবল্ড হিলস্ নামক একজন ইংরেজ কুঠিয়াল এক কৃষক-কন্যার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন। ঐ কৃষক কন্যার নাম হরমণি। বালিকা যখন একাদন দীঘি হইতে জল আনিবার জন্য বাড়ীর বাহির হয়, তখন অর্চিবল্ডের লোক হরমণিকে জোর করিয়া ধরিয়া তাহার কুঠিতে লইয়া যায় এবং দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত আটক রাখে।'

এরূপ নির্দিষ্ট ঘটনা ছাড়াও সে যুগের বাস্তব জীবনের একাধিক চিত্র যে নীলদর্পণ প্রমুখ নাটকে স্থান পেয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংঘবদ্ধ এমন কি বহু ক্ষেত্রে যে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপগ্রহণ করেছিল এমন কোনও চিত্র নীলদর্পণে নেই; অথচ ইতিহাসে যে আছে তা আগেই দেখানো হয়েছে।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে নাট্যকার "সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি" বলে নাটকটি রচনা করেছেন। একথাও ঠিক নিজে সরকারী চাকুরে হয়েও ইংরেজ শাসক-শক্তি ও তাদের জাতি-গোষ্ঠীর অত্যাচার ও অবিচারের সমালোচনামূলক নাটক দীনবন্ধুই প্রথম রচনা করেন। নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী যাতে লোকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে সম্ভবত সেই জন্যে একের পর এক মৃত্যুর দৃশ্য সংযোজন করা হয়েছে : ক্ষেত্রমণি, গোলকচন্দ্র. নবীনমাধব-এর মৃত্যু, পরে নবীনের মৃত্যুতে তাঁর মা সাবিত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং এই উন্মাদিনী কর্তৃক কনিষ্ঠ পুত্রবধূ সরলতাকে বীভৎসভাবে হত্যা এবং শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীর মৃত্যু।

নাটকটি প'ড়ে বা এর অভিনয় দেখে লোকের মনে নীলকরদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়—কিন্তু রোদন ও মৃত্যু ছাড়া তাদের হাত থেকে অব্যাহতির অন্য কোনওপথ আছে, তা মনে হয় না। অথচ নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে চাষীদের বিদ্রোহই যে নীলকর-অত্যাচার বন্ধের অন্যতম কারণ এটা ঐতিহাসিক সত্য। শিশিরকুমার ঘোষ এই বিদ্রোহকে বিপ্লবই আখ্যা দিয়েছিলেন : "এই নীলবিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলনের ও সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়েছিল। বস্তুত বাংলাদেশে বৃটিশ রাজত্বকালে নীল-বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব।"[৫] ১৮৫৯ থেকেই বিদ্রোহের সূচনা। বিদ্রোহের প্রথম স্তর ছিল শাসকগোষ্ঠীর মানবিকতা ও ন্যায়বোধের কাছে আবেদনের স্তর; দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় নীলচাষে অস্বীকৃতি। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে কৃষকদের জোর ক'রে নীলচাষে বাধ্য করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই চাষীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুরু হয়। শাসকেরা ভীত হয়ে ১৮৬০-এর ৩১শে মার্চ নীলচাষীদের বিক্ষোভ তদন্ত করার জন্য 'নীল কমিশন' (Indigo Commission) গঠন করেন। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর এই মর্মে আইন বিধিবদ্ধ হয় যে, কোনও নীলকরই আর রায়তদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক চাষীদের দ্বারা নীলের চাষ করাতে পারবে না; নীলের চাষ করা চাষীদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ব্যাপার। এই ঘোষণা দ্বারা নীল বিদ্রোহীদেরই জয় সূচিত হয়।

এই ঘোষণা করা ছাড়া সরকারের সেদিন উপায় ছিল না। বিদ্রোহের তাৎপর্য তারা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তদানীন্তন লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর

গ্রান্ট-এর সতর্কবাণী এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "শত সহস্র মানুষের বিক্ষোভের এই প্রকাশ, যা আমরা বঙ্গদেশে প্রত্যক্ষ করছি, তাকে কেবল রং-সংক্রান্ত অতি সাধারণ বাণিজ্যিক প্রশ্ন না ভেবে গভীরতর গুরুত্বসম্পন্ন সমস্যা ব'লে যিনি ভাবতে পারছেন না, তিনি, আমার মতে সময়ের ইংগিত অনুধাবন করতে মারাত্মক ভুল করছেন।"

"আইনের বিপক্ষে নীলচাষের স্বপক্ষে জগতের কোন শক্তিই আর বেশী দিন ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারে না। ন্যায়ের নির্দেশ উপেক্ষা ক'রে সরকার যদি এরূপ কোনও নীতি অনুসরণের চেষ্টা করতো, তাহ'লে এক বিপুল কৃষক-অভ্যুত্থান বিদ্যুৎ গতিতে সরকারের শাস্তি বিধান করতো। আর সেই কৃষক অভ্যুত্থান ভারতের ইউরোপীয় ও অন্যান্য মূলধনের পক্ষে যে সাংঘাতিক ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনতো তা যে কোনও লোকের চিন্তার বাইরে।"

লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর গ্রান্ট নীল-চাষীদের বিক্ষোভের মধ্যে যে "সময়ের ইংগিত" লক্ষ্য করেছিলেন 'নীলদর্পণের' রচয়িতা তা করেননি এবং কৃষকদের সংঘবদ্ধ শক্তির ওপরেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। বরং ইংরেজ শাসকদের ওপরই তাঁর আস্থা ছিল পূর্ণমাত্রায়। এর প্রমাণ নীলদর্পণ নাটকের ভূমিকা। নাট্যকার "নীলকর-নিকর-করে" নীলদর্পণ অর্পণ ক'রে বলছেন : "এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্কতিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার-শ্বেত-চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা হয়। হে নীলকরগণ! তোমাদের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিডনী, হাইয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অকলঙ্ক ইংরেজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে।"

দর্পণে মুখ নিরীক্ষণ করে নীলকর সাহেবরা যদি 'অকলঙ্ক ইংরেজকুলে' আরোপিত কলঙ্ক অপনোদনে রাজী না হয়, তা হ'লে নাট্যকারের বিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা নিশ্চয়ই এই মহৎ কাজে অগ্রসর হবেন। শাসক শক্তির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন : "প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসী দ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদার চরিত্র

ক্যানিং মহোদয় গভর্ণর জেনারেল হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পরায়ণ গ্রান্ট মহামতি লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ ইডেন, হার্সেল প্রভৃতি রাজকার্য পরিচালকগণ শতদলস্বরূপে সিভিল সারভিস-সরোবরে বিকশিত হইতেছেন। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থে উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শন-চক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইতেছে।" দেখা যাচ্ছে যে, নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার স্পষ্টই বলছেন যে, মুষ্টিমেয় নীলকর খারাপ হতে পারে, ইংরেজ জাতি কলঙ্কশূন্য। সর্বোপরি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সাক্ষাৎ প্রতিনিধিরা যখন দেশ শাসন করছেন তখন সুবিচার পাওয়া যাবে। মহারাণী, গভর্ণর জেনারেল এবং সিভিল সার্ভিসের উপর এরূপ অগাধ বিশ্বাস যাঁর, তিনি যে, নির্যাতিত চাষীদের বিদ্রোহের মধ্যে মুক্তির সন্ধান করবেন না—এটা অবধারিত।

দীনবন্ধু তাই বিদ্রোহকে ভিত্তি ক'রে নাটক রচনা করলেন না। তাঁর নাটকে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসপ্রমুখ নীল-বিদ্রোহের নায়কদের[৭] চিত্র আমরা পেলাম না। অবশ্য তাঁর নাটকে মৃত্যুর ঘনঘটা ও অসহায় রোদনের বন্যার মধ্যেও কিছু আলোর আভাষ পাওয়া যায়। নাটকের অন্যতম চরিত্র 'স্বরপুর কেশরী' বা 'পুরুষসিংহ' নবীনমাধব তাঁর পুরুষত্বের পরিচয় রেখেছেন ; তিনি বড়সাহেবের অকথ্য গালাগালি এবং হাঁটুতে জুতোর ঠোক্কর নির্বিবাদে হজম করেন নি—সাহেবের বুকে পদাঘাত করে উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন [পঞ্চম অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]। তাছাড়া রয়েছে তোরাপ চরিত্র। গর্ভবতী যুবতী ক্ষেত্রমণির ওপর রোগ সাহেবের পাশবিক অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে তোরাপ [৩অ. ৩গ.] ; তোরাপের সংগে ছিলেন পরোপকারী নবীন মাধব। রোগের কবল থেকে ক্ষেত্রমণিকে ছাড়িয়ে নিয়ে নবীন মাধব রোগকে নীতি উপদেশ দিয়েছেন—"রে নরাধম, নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খৃষ্টান ধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা ? এই কি তোমার খৃষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা ? আহা আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার !" মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রযুবকের মতই এই উপদেশ। কিন্তু কৃষকের

ছেলে তোরাপ জানে এই শ্রেণীর লোকের জন্যে প্রকৃত দাওয়াই কি : 'গলদেশ ধ'রে চাপটাঘাত', 'গলা টিপে ধরা', 'হাঁটুর গুতো', 'কান মলন'—এর কম কিছু তোরাপ চিন্তা করতে পারেনি তার শ্রেণীশত্রুকে শায়েস্তা করার জন্যে। নবীন মাধবকে তোরাপ ঠিকই বলেছে : "বড় বাবু, সমিন্দির কি এমান আছে তা ধরম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর, মুই তেম্‌নি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেম্‌নি হাতের পোঁচা।"

এই দৃশ্য ছাড়া আর সর্বত্রই কৃষক ও তাদের সহযোগীরা নীলকর সাহেবদের অসহায় শিকার। ইতিহাসের দিকে না তাকিয়ে নাট্যকারের কাহিনীর দ্বারা চালিত হয়ে আবার নাট্যকারের সমালোচনা করেছেন এ-যুগের কয়েকজন সমালোচক। তাঁরা ট্র্যাজিডী বিচার প্রসংগে বলেছেন—এই নাটকে যে দ্বন্দ্ব তাতে সাস্‌পেন্স থাকতে পারে না। কারণ একদিকে প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ, অন্যদিকে অসহায় দুর্বল কৃষক। কিন্তু যে সমাজে তোরাপের মত লোক আছে সেই সমাজকে অত অসহায় ও দুর্বল ক'রে তুলবার প্রয়োজন ছিল না। তা ছাড়া বহু কৃষক বিদ্রোহের চিত্র দীনবন্ধুর সামনেই ছিল। সর্বোপরি যে সময়ে দীনবন্ধু নাটক লিখেছেন সেই সময়ে নীলচাষীদের বিদ্রোহ দেখে শাসকশ্রেণী কতটা আতঙ্কিত হয়েছিল লর্ড ক্যানিং-এর উক্তিই তার প্রমাণ, "নীলচাষীদের বর্তমান বিদ্রোহ আমার মনে এমন উৎকণ্ঠা জাগিয়েছিল যে, দিল্লীর ঘটনার [ক্যানিং এখানে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের কথাই উল্লেখ করেছেন—লেঃ] সময়েও আমার মনে ততটা উৎকণ্ঠা জাগেনি। আমি সব সময়ে ভেবেছি যে, কোনও নির্বোধ নীলকর যদি ভয়ে বা রেগে গিয়ে একটীও গুলি ছোড়ে তা হ'লে সেই মুহূর্তে দক্ষিণ বাংলার সব কুঠিতে আগুন জ্বলে উঠবে।"[৮]

যে বিদ্রোহ দেখে শাসকশ্রেণী এমন আতঙ্কিত সেই শাসকশ্রেণীকে সর্ব-শক্তিমান এবং চাষীদের তাদের অসহায় শিকার রূপে চিত্রিত করার কি কারণ ছিল ?

: বিদ্রোহ ভীতি :

উপরোক্ত প্রশ্নের এক কথায় জবাব—বিদ্রোহ ভীতি। এই ভীতি 'জমিদার দর্পণে'র লেখক এবং 'নীলদর্পণে'র লেখক দু'জনদেরই থাকার কথা। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে স্বাভাবিক মানবতাবোধ

থাকলেও বিদ্রোহকে এঁরা ভয় পেতেন। তাঁরা জানতেন কৃষক বিদ্রোহ শুধু সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেই উৎখাত করে থামবে না, সেই সাম্রাজ্যবাদ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে যে সহযোগী সমাজের পত্তন করেছিল তারও ভিত্তি ধ্বংস ক'রে দেবে। এই সব বুদ্ধিজীবীরা যে সমাজ থেকে এসেছিলেন সেই সমাজের একাংশই একদিন "নিজের এলাকায় রাজার জাতকে ডেকে এনে জমি দিয়ে বসিয়েছেন।"[৯] অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদে বঙ্গদেশে ইংরেজদের জমি ক্রয়ের অধিকার দানের পর অনেক নীলকর জমি কিনে বড় বড় জমিদারী স্থাপন করছিল এবং বাঙালী জমিদাররা প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারদের জব্দ করার জন্যে এবং প্রচুর অর্থের লোভে নীলকরদের এনে বসিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও যে প্রথমে 'জমিদার দর্পণ' ও 'নীলদর্পণে'র নিন্দা ক'রেছেন তা এই শ্রেণী চেতনার তাগিদে। মজার ব্যাপার এই যে, যে বঙ্কিমচন্দ্র 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই থিওরী ধ'রে 'নীলদর্পণ'-এর নিন্দা করলেন তিনিই পরে ঐ থিওরীর ওপর দাঁড়িয়েই 'নীলদর্পণ'-এর প্রশংসা করলেন: "সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণ-এর উদ্দেশ্য এবংবিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট।"[১০]

বঙ্কিমের এই পরস্পর বিরোধী আচরণের কারণ হচ্ছে এই যে, 'নীলদর্পণ'-এর জনপ্রিয়তা যখন বৃদ্ধি পেল এবং নীলবিদ্রোহের যখন অবসান ঘটলো, তখন বঙ্কিমের আতঙ্কও চলে গেল এবং তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'তে পারলেন। শুধু 'নীলদর্পণ' নয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কয়েকজন নাট্যকার 'দর্পণ' [অর্থাৎ আর্শি] নাম দিয়েই কয়েকখানি নাটক রচনা করেছিলেন। বাঙালী সমাজের কদাচার নিয়ে এক অজ্ঞাতনামা লেখকের 'সাক্ষাৎ দর্পণ' (১৮৭১), গ্রামের দুর্দশার স্বাভাবিক চিত্র তুলে ধ'রে লেখা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩), জেলের কয়েদীদের ওপরে অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে লেখা দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'জেল দর্পণ' (১৮৭৫) এবং চা-কুলিদের ওপর শ্বেতাঙ্গ চা-করদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে লেখা 'চা-কর দর্পণ' (১৮৭৫), কেরানী জীবনের বাস্তব চিত্র সম্বলিত যোগেন্দ্র ঘোষের 'কেরানী দর্পণ' (১৮৭৪), মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩)। এই সমস্ত নাটকেরই নামকরণ করা হয়েছিল 'নীলদর্পণ'-এর অনুসরণে।

এই নাটকগুলির মধ্যে 'নীলদর্পণ,' 'জমিদার দর্পণ' এবং 'চা-কর দর্পণ'—এই

তিনটি দেশাত্মবোধক নাটক। তিনটি নাটকেরই প্রধান ঘটনা কৃষক রমণীর ওপর দেশী এবং বিদেশী জমিদারের পাশবিক অত্যাচার।

: চা-কর দর্পণ :

চা-বাগানগুলি ছিল Concentration Camp-এর মত। হিমালয়ের কোলে এবং তার পাদদেশে যোজন বিস্তৃত অঞ্চলে রয়েছে শত শত চা-বাগান। এক একটি বাগানের পরিধি কয়েক শ' বর্গমাইল। এরই মধ্যে যখন বাইরে থেকে শ্রমিকরা কাজ নিয়ে আসে, তখন তারা প্রকৃত পক্ষে আটক পড়ে যায় এক একটি Concentration Camp-এর মধ্যে। আজ তবুও এই সব শ্রমিকদের সঙ্গে বাইরের জগতের অনেকটা যোগাযোগ হয়েছে, কিন্তু প্রথম যুগে শ্রমিকরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে ক্রীতদাসের মতই বাগানে আটক থাকতো। এই সব শ্রমিক বা কুলিদের ওপরে চা-করেরা অনায়াসে অত্যাচার চালাতো; এমন কি দু'চারজনকে গোপনে হত্যা করলেও তার কোনও প্রতিকার ছিল না। প্রকৃত পক্ষে বাগানের মধ্যে কি ঘটছে, বাইরে তা জানাই যেতো না। এমন কি, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী চা-কুলির ছদ্মবেশে চা-বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী সংগ্রহ ক'রে 'সঞ্জীবনী'র তদানীন্তন সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহযোগিতায় প্রকাশ করার আগে সে-দিকে কারোরই দৃষ্টি পড়েনি।

পরবর্তীকালে চা-কুলিদের অবস্থার বিবরণ সম্বলিত আরও বই প্রকাশিত হয়েছে। এমনই একখানি বই দেওয়ান চমনলাল লিখিত 'Coolie, the Story of Labour and Capital in India.' এই বইতে চমনলাল লিখেছেন: "সাধারণ মানুষ কুলি-সংগ্রাহকদের বলে আড়কাঠি। যে মুহূর্ত থেকে কুলি এই সব চতুর সংগ্রাহকদের হাতে পড়ে এবং যে পর্যন্ত নিজের বাড়ী থেকে বহুদূরে কবরের মধ্যে তার চিরশান্তির ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পর্যন্ত তার জীবন হচ্ছে একটানা দুঃখের কাহিনী।" 'চা-কর দর্পণ'-এর লেখক দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় আড়কাঠির সাহায্যে কুলি-সংগ্রহের বিবরণ থেকে সুরু করে এই দুঃখের কাহিনীই চিত্রিত করেছেন।

কিভাবে চা-বাগানের কুলি সংগ্রহ হয়, তার বাস্তব বিবরণ রয়েছে 'চা-কর দর্পণে':

গত বছরের মত এবারও অজন্মা হ'ল—চাষীর ঘরে খাবার নেই। কিন্তু জমিদারের খাজনা দিতেই হবে। মহা ভাবনায় পড়েছে গ্রামের চাষীরা। অন্যদিকে জমিদারের ওপরে এদের বিশ্বাস শিথিল হয় নি। তাই দেখা যায় বরদা নামক জনৈক চাষী বলছে—"আমাদেরও জমিদার বড় মন্দ লোক নয়। তবে কিনা নায়েব বেটা ভারি হারামজাদা।"

নায়েব, গোমস্তা, পাইক-বরকন্দাজ—এরা সব জমিদারী ব্যবস্থার অঙ্গ—জমিদারী স্বার্থের এরা সংরক্ষক। তাই এরা খারাপ, জমিদার ভাল—এমন একটা ধারণা এই সংলাপ থেকে সৃষ্টি হতে পারে। এই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা মারাত্মক; যদিও চাষীরা অনেক সময় সোজাসুজি জমিদারের সংস্পর্শে আসে না ব'লে এরূপ ধারণা তাদের মনে থাকতে পারে।

অবশ্য চাষীরা জমিদারের চরিত্র একেবারে বুঝতে পারে না, তা নয়। তারা জানে ঘরদোর বিক্রি ক'রে অন্যগ্রামে গিয়ে তাদের বাস ক'রবারও উপায় নেই—"তা হ'লে কি রক্ষা আছে, জমিদার তা হ'লে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলবে"—বরদা'। জমিদারের অসাধ্য কিছু নেই—থানা পুলিশ, সবই তার হাতের মুঠোয়। এ অবস্থায় কি করবে চাষীরা। গহনাগাটি যা কিছু ছিল বিক্রি হয়ে গেছে—এক লাঙল-গরু সম্বল। বরদা ভাইকে বাবুদের বাড়ী চাকুরীর পরামর্শ দিল। কিন্তু সারদার প্রশ্ন—"চাকরি ক'রে কি এতগুলি পরিবারকে খাওয়াতে পারবো?"

কৃষকদের এইরূপ দুর্দশার মধ্যে দেখা পাওয়া গেল ডিপো-কণ্ট্রাক্টর কেশব-এর সরকার হরিদাসের। সে কৃষকদের এই দুরবস্থার সুযোগে চাকুরীর টোপ ফেললো [কৃষকদের দুরবস্থার সুযোগ এই ভাবেই নেওয়া হতো]। সে জানালো ইচ্ছা করলে সে কাছাড়ে, শ্রীহট্টের চা-বাগানে চা-পাতা তোলার কাজ দিতে পারে, মেয়ে পুরুষ সবাইকে। চাকুরীর শর্তও লোভনীয়—প্রত্যেকে মাসে দশ টাকা মাইনে, সঙ্গে খোরাক পোষাক। সে এটাও জানিয়ে দিল—"যত লোক আসুক আমরা সবাইকে কাজে লাগিয়ে দিই।"

মানুষ-ধরার কাজ এই হরিদাসের। এই শ্রেণীর লোককেই বলা হতো আড়কাঠি। লোককে ভুলিয়ে কোনও রকমে একবার চা-বাগানে নিয়ে ফেলতে পারলেই হ'লো। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসে কার সাধ্য! সে যুগে যানবাহনের সুবিধা আজকের মত ছিল না। তারপর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে

এক-একটা বাগানে কুলিদের এমনভাবে আটকে রাখা হতো যে কিছুতেই তারা বাইরে আসতে পারতো না। 'চা-কর দর্পণ' যখন লেখা হয়, তার পরবর্তী কালে [১৯০১ খৃষ্টাব্দে] সরকার এক আইন পাশ করে ; যার বলে চা-বাগিচার কোনও শ্রমিক কাজ করতে অস্বীকার করলে তাকে জেল পর্যন্ত দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

আড়কাঠির দল যখন কৃষকদের নানাভাবে প্রলোভন দিয়ে সংগ্রহ করতো, তখন চা-বাগানের প্রকৃত অবস্থা তারা বুঝতে পারতো না। 'চা-কর দর্পণে'র কৃষকরাও কেশব-হরিদাসের বদান্যতার স্বরূপ বুঝতে পারে নি। তাই তাদের কত আশা—"দশ বছরের ভিতর দেশে ফিরে এসে ঘরবাড়ী করবো, জায়গা জমি কিনবো, মেলা গরু-লাঙল কিনবো। কিছুরই ভাবনা থাকবে না।"

এই আশা নিয়ে সারদা, বরদা এবং তাদের স্ত্রী নৃত্যকালী, সরমা কলকাতায় এলো। এদের নাম রেজেষ্ট্রী করা হ'লো প্রথা মত এবং পাঠানো হলো আসামে। নাম রেজেষ্ট্রী ক'রবার সময় ডিপো-দর্শক ভোলানাথ এদের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছিল চা-বাগানের প্রকৃত অবস্থা উদ্ঘাটন ক'রে —"আসাম, কাছাড় এবং সিলেট এই তিন স্থানে চা-কর সাহেবদের চা-র বাগান আছে। এ দেশ থেকে সব কুলি ধ'রে নিয়ে যায়, আর সেখানে পেট-ভাতায় রাখে। সময়ে সময়ে কিছু কিছু ক'রে দেয়। তাদের বুকে হাঁটু দিয়ে খাটায়। যারা এদেশ থেকে যায় তাদের প্রায় আর কাউকে ফিরে আসতে হয় না।" ভোলানাথের এই কথা শুনে বিচলিত হয়েছিল সারদারা, কিন্তু নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়ে গেছে—তখন আর ফেরবার উপায় নেই।

চা-বাগানে পৌছেই স্যারদা-বরদারা সব টের পেয়েছিল। 'রোজ দশ সের পাতা তুলতে হবে'—সাহেবের দেওয়ান নিধুরামের হুকুম। যে মাইনের কথা বলা হয়েছিল [অর্থাৎ মাসে দশ টাকা], সেটাও ঠিক নয়। এ দিকে পালাবার উপায় নেই—জাহাজ ভাড়ার টাকা কোথায় ? বাধ্য হয়ে সব ব্যবস্থাই তারা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তারা জানতো না যে, শুধু হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম নয়, আরও অনেক বেশী মূল্য দিতে হবে তাদের। সারদা ও বরদার অবর্তমানে একদিন নিধুরাম এসে নৃত্যকালী ও সরমাকে মজুরীর টাকা দিল এবং বকশিসের লোভ দেখিয়ে বিকেলে সাহেবদের বাংলোয় তাদের নিয়ে গেল। এইখানে

ঘটলো নারীত্বের চরম অবমাননা—ধর্ষিতা হ'লো সরমা ; ঘৃণায়, লজ্জায় তার মৃত্যু ঘটলো।

চা-কর সাহেব খারাপ হতে পারে ; কিন্তু তখনও 'কোম্পানীর শাসনে'র ওপর বিশ্বাস আছে। তাই সারদা-বরদা চেষ্টা করেছিল আদালতে মামলা রুজু করার। তার আগেই সাহেব তাদের পাইক দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহার করলো এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিল—"থানা পুলিশ in my hand ; তোমাকে যদি খুন করি ; আমার কিছুই হবে না···আমার সহিত ইন্‌সপেক্টর, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার সকল লোকের আলাপ আছে। তারা মোর জাতি ভাই।"

এই উক্তির সত্যতা অনুধাবনে সারদা ও বরদার দেরী হয়নি। তাদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হলো সাগর মধ্যস্থ জনমানবশূন্য একটি দ্বীপে। এদিকে নৃত্যকালী নিজ সতীত্ব রক্ষার জন্যে বঁটি দিয়ে গলদেশে আঘাত ক'রে আত্মহত্যা করলো।

কৃষকগণের এইভাবে চা-করদের অসহায় শিকারে পরিণত হবার চিত্র এঁকেছেন নাট্যকার। বিদেশী চা-কর সাহেবরা শাসনযন্ত্রের সাহায্যে শুধু শোষণ নয়, কুলিদের ওপরে কী জঘন্য অত্যাচার করতো সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টা নাট্যকার করেছেন। বরদার স্ত্রী সরমার ওপরে পাশবিক অত্যাচারের কৈফিয়ৎ স্বরূপ ম্যাকলিন সাহেব বলেছে—"তোর বউয়ের তো আমি জাতি মারি নাই, আমি তাহাকে সভ্য civilised করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে আমার বাৎ শুনিল না, প্রাণে মরিয়া গেল।" এই উক্তি দর্শকদের মনে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শুধু ঘৃণাই সৃষ্টি করে না, তাদের উত্তেজিতও করে। এই উক্তি বরদার শরীরের রক্ত ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল ; কিন্তু দেখা যায়, সে এই উক্তি শুনে কাঁদতে কাঁদতে সাহেবকে বলছে—"আমি তোমার নামে থানায় নালিশ করবো। তুমি জান না এ কোম্পানির মুল্লুক ?"

নাটকটি শেষও হয়েছে পাগলবেশী নৃত্যকালীর বক্তৃতা এবং পরে তার আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে। সরমার ধর্ষণ ও মৃত্যু সম্পর্কে নৃত্যকালী বলছে—"এমন দশা হলো কেন ? বোধ করি আর জন্মে সে কোন পতিব্রতা সতীর পতি কেড়ে নিয়েছিল, এ জন্যে সে এ জন্মে অকালে প্রাণ হারালো।" নৃত্য-কালীর বক্তৃতায় প্রচ্ছন্নভাবে বৃটীশ জাতির মহানুভবতার কথাও আছে—

"শুনেছিলাম যে সাহেবরা বড় দয়ার জাতি, এঁরা দাস ব্যবসা দেখতে পারেন না—।" ব্যক্তিগতভাবে কিছু চা-কর খারাপ—এই ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস আছে এই উক্তিতে। একটা সাম্রাজ্যবাদী শাসন তার সমস্ত মারণ উচাটনের যন্ত্র নিয়ে এ দেশবাসীর ওপরে চেপে বসেছে ; তার উচ্ছেদ ছাড়া বাঁচবার পথ নেই—এই সত্য তুলে ধরবার কোনও চেষ্টা নাটকে নেই।

এ কথা ঠিক যে চা-কুলিদের বিদ্রোহের কোনও নজীর নাট্যকারের সামনে ছিল না। কারণ চা-শ্রমিকেরা প্রথম মাথা তোলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, যখন তারা দলবদ্ধভাবে মুক্তির আশায় বেরিয়ে এসেছিল এবং পথে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ও অত্যাচারের মোকাবিলা করেছিল। এই অধিনিষ্ক্রমণ [exodus] প্রকৃত-পক্ষে বিদ্রোহ। এই ঘটনা 'চা-কর দর্পণে'র লেখকের সামনে থাকার কথা নয় —কিন্তু বাংলা দেশের কৃষক সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস তাঁর সামনেই ছিল এবং তাঁর বই লেখার দু'বছর আগেই পাবনা জেলার কৃষক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই দিক থেকে অনুপ্রাণিত না হ'য়ে চা-কুলীদের জীবনের শুধু অশ্রুসজল কাহিনী নাট্যকার চিত্রিত করেছেন তাঁর নাটকে।

. জমিদার দর্পণ :

চা-কর দর্পণের লেখক দক্ষিণাচরণের সামনে চা-কুলিদের বিদ্রোহের কোনও নজির ছিল না। কিন্তু মীর মশারফ হোসেন কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষকদের নিয়ে 'জমিদার দর্পণ' নাটক লিখেছিলেন ১৮৭৩-এ।

বর্তমান বাংলা দেশের অন্তর্গত পাবনা জেলায় [সিরাজগঞ্জ মহকুমায়] ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। কৃষকরা প্রাচীনকাল থেকে জমির ওপরে যে অধিকার ভোগ ক'রে এসেছিল বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে সেই অধিকার হরণ করে জমিদারদের হাতে অর্পণ করেছিল। তাছাড়া জমিদারেরা দফায় দফায় অবৈধ আদায়, নতুন জরিপ প্রণালী প্রবর্তন করে জমি চুরি, খাজনা বৃদ্ধি ও অবৈধ করের কবুলিয়ত গ্রহণ—এ সব চালাতে থাকলে কৃষক বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়—কিন্তু এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে কৃষকরা তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করে।

এই বিদ্রোহের সময় লেখা হয় 'জমিদার দর্পণ'। নাটকটির রচয়িতা জনৈক জমিদার নন্দন—মীর মশাররফ হোসেন। নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন —"নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখ তত ভাল দেখা হয় না। জমিদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়স্বজন সকলেই জমিদার। সুতরাং জমিদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক করে না।"

নাট্যকার জমিদারের ছবি এঁকেছেন—জমিদারের চরিত্রের একটি দিক তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কিন্তু পাবনার কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে নাটকটি রচিত হয়নি। কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায়ও নাটকটি রচিত নয়; এমন কি জমিদারী শোষণের নগ্নরূপও নাটকটিতে ফুটে ওঠেনি। দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক; তাদের প্রতি সহানুভূতি নাটকে আছে, অত্যাচারের মুখে তাদের অসহায় অবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে—কিন্তু কৃষকেরা যে প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেই প্রথার প্রকৃত রূপ নাটকে ফুটে ওঠেনি।

নাট্যকারের বক্তব্য যে, বৃটীশ সরকার জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি ক'রে প্রজা-পালনের যে দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তা জমিদারেরা পালন করছে না; তারা চরিত্রহীন হয়ে পড়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলছে :

হা ধর্ম। তোমার মর্ম লুকাল ভারতে
জমীদার অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে
... ...
রাজ-প্রতিনিধিরূপী মধ্যবর্তী সম
জমীদার। রাজরূপে পালক প্রজার
সর্ব নর ধন-প্রাণ-মান রক্ষাকারী;
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী;

এই প্রজাপালক 'সর্ব নর ধন-প্রাণ-মন রক্ষাকারী'র দল ক্ষমতা হাতে পেয়ে জানোয়ার বনে গেছে। সূত্রধার তাই বলছে,—"মফঃস্বলে এক রকম জানোয়ার আছে, তারা কেউ সহরেও বাস করে; সহরে কুকুর, কিন্তু মফঃস্বলে ঠাকুর। সহরে তাদের কেউ চেনে না। মফঃস্বলে দোহাই ফেরে। সহরে

কেউ কেউ জানে যে, এ জানোয়াররা বড় শান্ত—বড় ধীর বড় নম্র। হিংসা নাই দ্বেষ নাই মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফঃস্বলে শৃগাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না। বলব কি, জানোয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।" হিন্দু ও মুসলমান দু'শ্রেণীর মধ্যেই যে জানোয়ার আছে তাও বলা হয়েছে। 'জমিদার দর্পণ'-এ এমন একটা জানোয়ারকেই উপস্থিত করা হয়েছে।

এই নাটকে জমিদারের শ্রেণী-চরিত্র অপেক্ষা ব্যক্তি-চরিত্রকেই উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস রয়েছে। জমিদার হায়ওয়ান আলীর হঠাৎ নজর পড়লো তার প্রজা আবু মোল্লার স্ত্রী নুরন্নেহার প্রতি। কিন্তু কি ক'রে পাশবিক ভোগ লিপ্সা চরিতার্থ হবে? হাওয়ান আলী এক পরিকল্পনা করলো! কোনও একটা ছুতো করে ধরে আনা যাক আবুকে। লোকজন গেল আবুর বাড়ীতে। তারা তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করলো, শেষে আবুর জরিমানা ধার্য হলো ৫০ টাকা। এ টাকা সে কোথায় পাবে? তাকে ধরে এনে দেউড়িতে কয়েদ করা হলো। ও-দিকে বৈষ্ণবী কৃষ্ণমণি গেল নুরন্নেহার কাছে। নানা কথার মধ্যে সে জানালো হায়ওয়ানের বাসনার কথা: "শুনেছি তোমার জন্যে সে একেবারে পাগল। দেখ মা, একমাস হলো তোমার পাছেই লেগে আছে। তুমি মনে কল্লে সব মিটে যায়।" শুধু তাই নয়, কৃষ্ণমণি লোভ দেখালো—জমিদারের কাছে গেলে নুরন্নেহার রাজরাণীর মত থাকবে। নুরন্নেহার ঘৃণা-ভরে প্রত্যাখান করলো ঐ প্রস্তাব। জমিদারের নগ্ন পাশবিকতা এবার রাশমুক্ত হলো। জোর ক'রে সে ধরে নিয়ে এল গর্ভবতী কুলবধূ নুরন্নেহারকে। তারপর সে চালালো পাশবিক অত্যাচার—ফলে নুরন্নেহারের মৃত্যু ঘটলো। আবু মোল্লার পক্ষ থেকে মামলা করা হলো আদালতে। কিন্তু থানা পুলিশ আদালত সবই তো ও শোষকদের সংগে নানা সূত্রে আবদ্ধ। মামলা হলো ডিসমিস। মামলায় জিতে হায়ওয়ান আলী আবু মোল্লার বাড়ীঘর মাটির সংগে মিশিয়ে দিল। তার কোনও প্রতিকার হলো না।

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এ তবুও তোরাপের মত একটি চরিত্র পাওয়া যায়, যে অত্যাচারী নর-পশুর সামনে রুখে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু 'চা-কর দর্পণ' এবং 'জমিদার দর্পণ'-এ এমন একটা চরিত্রও নেই। 'জমিদার দর্পণ'-এ প্রজা জমিদারের অসহায় শিকার।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে সে যুগের এইটাই বাস্তব অবস্থা। ইংরেজ জজ সাহেবের সামনে ইংরেজ ডাক্তার [যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের অতি পরিচিত] বাইবেল ছুঁয়ে মিথ্যা রিপোর্ট দিচ্ছেন। যে মেয়েটির মৃত্যু ঘটেছে পাশবিক অত্যাচারের ফলে এবং ডাক্তার রিপোর্টে 'স্ত্রী লোকটির অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত হয়েছে,' 'গলার চর্মের নিচে রক্ত জমা' হয়েছে এ সব বলেও "ব্রেন ডিজিজে" তার মৃত্যু ঘটেছে বলে ঘোষণা করছেন এবং জজ সাহেব তা মেনে নিচ্ছেন। অন্যদিকে জমিদারের হিন্দু দালাল নামাবলী গায়ে, কৌপিন পরে 'সর্বাঙ্গে তিলক লেপে, তুলসীর মালা হাতে হরিনাম জপ করতে করতে' আবোল তাবোল মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছে এবং জজ সাহেব তা মেনে নিচ্ছেন। সর্বোপরি থানা-পুলিশ সবই জমিদারের হাতে। এই অবস্থায় সুবিচার পাওয়ার আশা কোথায়? তাই আকুল কান্না ছাড়া গতি নেই এবং নাট্যকারের পক্ষে সেই ক্রন্দনের সংগে সুর মিলিয়ে নট ও নটীর বেদনার্ত গান ['কবে পোহাইবে এই দুঃখ বিভাবরী'] দিয়ে নাটক শেষ করাই হয়তো স্বাভাবিক। নাট্যকার তাই-ই করেছেন। নির্যাতিত প্রজার দুঃখে তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি আছে— নির্যাতন ও অত্যাচার দূর হোক এটাও তিনি চান। নটীর উক্তির মধ্যেও এই সহানুভূতি ও আশা প্রকাশিত :

> হবে না কি দরিদ্রের এ দুঃখ মোচন
> রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন ?

এই সংগে ঐ নটীর উক্তির মাধ্যমেই প্রজার দুঃখ দুর্দশা দূর করবার যে পথ নাট্যকার নির্দেশ করেছেন সেটা তদানীন্তন ইতিহাসের রিপোর্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। কেউ কেউ বলতে পারেন যে এর মধ্যে নাট্যকারের নিজের শ্রেণী-চরিত্র [অর্থাৎ জমিদার শ্রেণীর চরিত্র] প্রকাশ পেয়েছে। যে সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি ভারতবর্ষের প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তার ওপরে নিজের সমর্থকরূপে গড়ে তুলেছিল এই জমিদার শ্রেণীকে এবং যে জমিদার শ্রেণীর অনাচার ও অত্যাচারে কৃষক শ্রেণী নিষ্পেষিত, স্বভাবতই নাট্যকার সেই সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি ও তার পক্ষপুটাশ্রিত অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর অবলুপ্তির কথা চিন্তা করতে পারেন নি। তিনি ঐ রাজশক্তির কাছেই আবেদন জানিয়েছেন প্রজার দুঃখ দূর করার জন্য :

"আরো বিজ্ঞাপিব শোক কাঁদি তাঁর কাছে
ঈশ্বর প্রসাদে যিনি ভারত ঈশ্বরী,
যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বারবার
কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার।"

এক জায়গায় নয়, একাধিকবার নাট্যকার তদানীন্তন ভারত-ঈশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন করেছেন :

কাতরে ডাকি তোরে শুন মা ভারতেশ্বরি।
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে মরি মরি

... ...

রক্ষা কর প্রজা কিঙ্করে বিনয়ে করি মিনতি।...ইত্যাদি।

নাট্যকার যখন তাঁর নাটকে প্রজার দুঃখ নিবারণের জন্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে কাতর আবেদন জানাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে কিন্তু কৃষকরা তাদের দুঃখ দূর করার জন্যে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করছিলেন। সেই সময়ে সিরাজগঞ্জে যিনি সাবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন সেই P. Nolan তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টে [২৩. ৪. ১৮৭৪] কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখেছেন—"আগে থেকেই কয়েকটি গ্রামের কৃষক ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে জমিদারের উৎপীড়ন, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ প্রভৃতি সত্ত্বেও সাফল্যের সঙ্গে জমিদারের অতিরিক্ত কর.আদায় ও কবুলিয়ত আদায়ে বাধা দিয়ে আসছিল। তারা তাদের এই বীরত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক কাজের দ্বারা অন্য সব কৃষকের সম্মুখে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল যে, একতা ও দৃঢ়তা দ্বারা জমিদারের সব অবৈধ দাবী এবং উৎপীড়নে বাধা দান করা সম্ভব।"

একথা ঠিক যে পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত পাবনার কৃষক বিদ্রোহ দমিত হয়েছিল; তবে প্রজারা সেদিন যেটুকু অধিকার আদায় করেছিল তা ঐ সংঘবদ্ধ সংগ্রামের জন্যেই। এই কারণেই বলা চলে যে, নাট্যকার তৎকালীন ঐতিহাসিক স্পিরিট-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলেন নি।

কৃষক বিদ্রোহকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও ভাবে মদত দেওয়ার চেষ্টা নেই, কৃষকদের অসহায় অবস্থার করুণ চিত্র সম্বলিত এই 'জমিদার দর্পণ' নাটকটিকেও কিন্তু সে-যুগের শ্রেণীস্বার্থ সচেতন বুদ্ধিজীবীরা সহ্য করতে পারেন নি। কারণ নাটকটির রচনার সময় পাবনার কৃষক বিদ্রোহ চলছে। এঁরা তাই ভয় পেয়ে গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদর্শনে' নাটকটির

প্রচার বন্ধ করতে পরামর্শ দিয়ে লিখলেন: "বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈষী এবং প্রজার হিত কামনা আমরা কখনও ত্যাগ করিব না। কিন্তু পাবনা জেলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমরা পরামর্শ দিই যে, এ সময়ে এ গ্রন্থের বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা হউক।"[১২] বঙ্কিমচন্দ্রের এই আচরণে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। কারণ সমাজের মধ্যশ্রেণীর যে অংশ ভূমিস্বত্বের অধিকারী বা প্রধানতঃ ভূমিস্বত্বের ওপরে নির্ভরশীল বঙ্কিমচন্দ্র সেই অংশের লোক। সুতরাং তাঁর পক্ষে কৃষক বিদ্রোহকে ভয় করারই কথা। এ বিষয়ে তিনি অনেক বেশী সচেতনও ছিলেন। তাই 'বঙ্গদেশের কৃষক' [দেশের শ্রীবৃদ্ধি] প্রবন্ধে স্বশ্রেণীকে সতর্ক ক'রে দিয়ে লিখেছিলেন—"তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশের কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে?"[১৩]

ভূমিস্বত্বের ওপরে নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবী বঙ্কিম কতখানি শ্রেণীস্বার্থ-সচেতন ছিলেন এই উক্তি তার দৃষ্টান্ত। এই জন্যেই বঙ্কিম যে শ্রেণীর লোক সেই শ্রেণী যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগী, তাদের ভিত্তিকে যে-সংগ্রাম নাড়া দেয় তাকে বঙ্কিম সমর্থন করতে পারেন নি; তেমনি অত্যাচারিত ও শোষিত শ্রেণীর দুর্দশার কাহিনীও তিনি সহ্য করতে পারেন নি। শুধু 'জমিদার দর্পণ' নয়, 'নীলদর্পণকেও' বঙ্কিমের পক্ষে সহ্য করা পক্ষে কঠিন ছিল। তিনি 'নীলদর্পণ-এর' নিন্দা ক'রে লিখেছিলেন--"নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাহারা সামাজিক কু-প্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমানতা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর—যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি, সমাজ সংস্কার নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া সমাজ সংস্কারণাভিপ্রায়ে প্রণীত হইলে নাটকের নাটকত্ব থাকে না।"[১৪]

: ঐতিহাসিকতা :

উপরোক্ত তিনটি নাটকের চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক। কিন্তু নাটকে

বর্ণিত ঘটনা কাল্পনিক ঘটনা নয়। "নদিয়ার অন্তর্গত গুয়াতোলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নীলদর্পণের ভিত্তিভূমি।"[১৫] "নীলদর্পণ"-এ নারী হরণ ও তার ওপরে পাশবিক অত্যাচারের যে কাহিনী সেটিও একটি সত্য ঘটনা। যশোহরের কাচিকাটা কুঠির ম্যানেজার অর্চিবল্ড হিল্ এইরূপ নারী নির্যাতন-করেন। এই ঘটনা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হিল্ হরিশচন্দ্রের নামে মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করেন। মোকদ্দমা চলার সময়েই হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মোকদ্দমা চলতেই থাকে তাঁর স্ত্রীর নামে। শেষ পর্যন্ত এক হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে স্ত্রীকে মোকদ্দমা মেটাতে হয়।

'জমিদার দর্পণ'-এ উল্লিখিত ঘটনাও একটি সত্য ঘটনা বলে জানা যায়। আর চা-কর সাহেবরা 'চা-কর দর্পণে' অনুষ্ঠিত নারকীয় অত্যাচার যে চালাতো এটা কারও অজানা ছিল না। এই তিনটি নাটকেই একটা যুগের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে।

নাটক তিনটির মধ্যে নীলদর্পণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সমধিক। যদিও নাটকটি নীলবিদ্রোহের সমর্থনে লেখা নয়, তবুও নীলকরদের কুকীর্তির কথা এত স্পষ্ট ক'রে আগে প্রকাশিত হয় নি। নাটকটি ইংরেজীতে অনূদিত হ'য়ে ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যত্র প্রচারিত হয়। নাটকে নাট্যকারের নাম না থাকায় তিনি বেঁচে যান; কিন্তু নাটকটি প্রচারের জন্য রেভারেণ্ড লঙ সুপ্রীম কোর্টের বিচারে কারারুদ্ধ হন এবং জরিমানাও দিতে হয়। সীটন কার ছিলেন বাংলা সরকারের সেক্রেটারী তাঁর আনুকূল্যে নীলদর্পণ সরকারী ছাপাখানায় মুদ্রিত হওয়ায় তাঁকে ইউরোপীয় সমাজের তীব্র সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করতে হয়। আর নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ করার জন্য "মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন···শেষে তিনি তাঁহার জীবন নির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকরী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"[১৬]

: প্রথম ঐতিহাসিক নাটক :

১৮৬১-এ প্রকাশিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটককে বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক বিয়োগান্ত নাটক [অর্থাৎ ট্র্যাজেডী] বলা হয়ে থাকে।

যদিও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' [১৮৫২] এবং উমেশ মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' [১৮৫৬] এর আগেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু এ দু'খানি সার্থক ট্র্যাজেডী হ'য়ে ওঠেনি। ১৮৬০-এ প্রকাশিত দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' নাট্যগুণ থাকা সত্ত্বেও এটি সার্থক ট্র্যাজেডী হয় নি। তাই 'কৃষ্ণকুমারীকে' প্রথম ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং নাট্যকার মন্মথ রায় ব'লেছেন—"...স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং জলন্ত দেশপ্রেমের সার্থক রূপায়ণ আমরা পাই ১৮৬১ সালে প্রকাশিত মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে। সুতরাং কৃষ্ণকুমারী নাটককে বাংলার প্রথম দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা দেওয়া অসঙ্গত নয়।"[১৭]

নাটকটি শুধু ট্র্যাজেডী নয়, মধুসূদন এক চিঠিতে নিজেই 'কৃষ্ণকুমারী'কে "Historic tragedy" বলেছেন।[১৮] তিনি এই নাটকটিকে আবার Romantic Tragedy বলেও উল্লেখ করেছেন। তিনি টড-এর 'রাজস্থান' গ্রন্থের মেবার সম্পর্কিত অংশের ষোড়শ অধ্যায় থেকে কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী গ্রহণ করেছেন। ইতিহাসের পাত্র-পাত্রী নিয়ে লেখা এই প্রথম বাংলা নাটক। এই নাটকে মধুসূদন ইতিহাসকে অনুসরণ করেই চলেছেন। ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাকে তিনি ক্ষুণ্ণ করতে চান নি, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্র থেকেও তা জানা যায়। কেশবচন্দ্র নাট্যকাহিনীর মধ্যে ঘটনার আরও জটিলতা সৃষ্টি করার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখলে মধুসূদন তার উত্তরে লেখেন: "To complicate the plot by the introduction one or more characters [male] would be to complicate it in every sense of the word, for you must remember that the play is a historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader."

অবশ্য ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে সংহত ক'রে পরিপূর্ণ নাটকীয় কাহিনী দাঁড় করাবার জন্যে যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় তা স্বভাবতই তিনি গ্রহণ করেছেন। ধনদাস ও মদনিকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র। তবে জগৎসিংহকে ইন্দ্রিয়-দুর্বল নৃপতি হিসাবে চিত্রিত ক'রে এবং কর্পূরমার নামে তাঁর এক রক্ষিতা বারবণিতার উল্লেখ ক'রে টড ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা উপাখ্যানের সূত্র রচনা করেছিলেন।

কৃষ্ণকুমারী যে মানসিংহের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেছে—এটাও মধুসূদনের কল্পনা। টডের কাহিনীতে যৌয়ানদাস আছে। এখানে সেই যৌয়ানদাসই হয়েছে বলেন্দ্র সিংহ।

কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুর ঘটনাও মধুসূদন নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়োজনেই পরিবর্তন করেছেন। টডের গ্রন্থে দেখা যায় যৌয়ানদাস খড়্গাঘাতে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যায় অসমর্থ হ'লে বিষপানে তাকে হত্যার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু পর পর তিনবার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে অহিফেন ও কুসুমরস একত্রে মিশিয়ে এক প্রকার অত্যুৎকট হলাহল প্রস্তুত হয় এবং কৃষ্ণকুমারী হাসতে হাসতে সে বিষপান ক'রে মৃত্যু বরণ করেন। নাটকে বলেন্দ্র সিংহ খড়্গ দূরে নিক্ষেপ করার কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণকুমারী নিজে খড়্গাঘাতে আত্মহত্যা করেছে।

কাহিনীর মধ্যে এই ধরণের পরিবর্তন সাধনের ফলে মূল ঐতিহাসিক কাহিনীর কোনও পরিবর্তন হয়নি। তা ছাড়া ভীমসিংহ, জগৎসিংহ, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতির চরিত্রগত ঐতিহাসিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ করা হয় নি। সমগ্রভাবে ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টিতেও নাট্যকার দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। সে যুগে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যগুলি কিভাবে সামান্য কারণে পরস্পর বিবাদে মত্ত হতো তার চিত্রও নাট্যকার স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলেছেন। ইতিহাসের যে প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণকুমারীর বিয়োগান্ত কাহিনী রূপায়িত হয়েছে তা এই :

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত রাণা ভীমসিংহ মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল শান্তিপূর্ণ ছিল না। কয়েক পুরুষ ধ'রে সর্দারদের অন্তর্দ্বন্দ্বে মেবার দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মহারাষ্ট্রীয়দের আক্রমণ এবং লুণ্ঠনও ছিল অব্যাহত। চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদের দ্বন্দ্বে মেবারের রণশক্তি বিপর্যস্ত—সামন্ত সর্দারদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা স্পৃহা এত তীব্র ছিল যে, তা চরিতার্থ করার জন্যে জাতির স্বার্থ বিসর্জন দিতে তাঁরা পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না। অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার জন্যে তাঁরা মহারাষ্ট্রীয়দের ডেকে আনলেন। তাদের দাবী মেটাতে গিয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। এই ভীমসিংহই শেষ পর্যন্ত বৃটিশ রাজশক্তির কাছে মেবারের স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেন [১৩ই জানুয়ারী, ১৮১৮]

মেবারের ইতিহাসের এই দুরবস্থার সময় কৃষ্ণকুমারীর ঘটনাটির অনুষ্ঠান হয় [১৮০৭ খৃষ্টাব্দে]। জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ এবং মারবার রাজ মানসিংহ

উভয়েই কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থী হলেন। বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে শুধু দূত এলো না—দু'পক্ষই সৈন্য সমাবেশ করলো। আমীর খাঁ নামক এক দুর্ধর্ষ পাঠান এবং মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী মানসিংহের পক্ষে দাঁড়ালেন। জগৎসিংহের বিপুল কাহিনী মানসিংহকে পরাজিত করলো বটে, কিন্তু জয়গৌরব তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারলেন না। জগৎসিংহ ও মানসিংহ দু' জনেরই ভীষণ প্রতিজ্ঞা হয় কৃষ্ণকুমারী বিবাহে রাজি হবে, নতুবা উদয়পুর তাঁরা ভস্মীভূত ক'রে দেবেন। আমীর খাঁর দাবীও স্পষ্ট—হয় রাজকুমারী মানসিংহকে বিবাহ করুন না হয় তাঁর জীবন বিসর্জন দিয়ে শান্তি স্থাপন করুন।

শেষ পর্যন্ত আমীর খাঁর শেষোক্ত প্রস্তাবই কার্যকর হলো, দেশকে রক্ষার জন্যে কৃষ্ণকুমারী আত্মবিসর্জন দিলেন। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিস-এর 'Iphigeneia in Aulis' নামক নাটকে গ্রীক সেনাপতি আগামেমনন ট্রয়যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে স্বীয় কন্যা ইফিগিনিয়াকে অলিস নগরে দেবী আর্টে-মিসের মন্দিরে উৎসর্গ করেছিলেন। এই ভারতবর্ষে রাজপুত রমণী পদ্মিনী আক্রমণকারীর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। প্রথম দৃষ্টান্তটি টড তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন,[১৯] দ্বিতীয়টিকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন কবি রঙ্গলাল।

এই সব দৃষ্টান্ত মধুসূদনের সামনে ছিল। কারণ প্রথমটি অর্থাৎ কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী তাঁর নাটকের কাহিনী এবং শেষোক্ত কাহিনী নিয়ে রঙ্গলাল 'পদ্মিনী' নামক ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। এই কাব্যের কেন্দ্রীয়ভাব জাতীয় ভাবাবেগের উদ্দীপক এবং বীরত্বমণ্ডিত। মূল কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে তাই কবি দেশপ্রেমের মুখর বর্ণনা দান করেছেন।

মধুসূদনের নাটকেও জাতীয় ভাবাবেগ উদ্দীপক সংলাপ কিছু কিছু আছে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, সেদিন ইতিহাসের দ্বন্দ্ব সঙ্কুল চিত্রকে নাট্যকার কতটা ফোটাতে পেরেছেন, সে দিনের ইতিহাসের আবহাওয়া নাটকে কতটা সঞ্চারিত হয়েছে? মধুসূদন টডের রাজস্থান থেকে তাঁর নাটকের কাহিনী আহরণ করেছেন, কিন্তু রাজপুত জীবন সন্ধ্যায় বিলীয়মান সূর্যের কিরণ সম্পাতে যে-ভাবে ইতিহাসের দিগন্ত রক্তিম আভায় উদ্ভাসিত হয়েছিল তার যথাযথ চিত্র তুলে ধরতে তিনি পারেন নি।

এ প্রসঙ্গে শেকসপীয়রের 'Antony and Cleopatra' নাটকটি সম্পর্কে

রবীন্দ্রনাথের মতামত উল্লেখযোগ্য : "আমাদের স্বপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটী সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন। হৃদ্‌বিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর, প্রেম-দ্বন্দ্বের সঙ্গে এক বন্ধনের দ্বারা বদ্ধ রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন। ক্লিয়োপাট্রার বিলাস কক্ষে বীণা বাজিতেছে, দূরে সমুদ্রতীর হইতে ভৈরবের সংহারধ্বনি তাহার সঙ্গে এক সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে। আদি এবং করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"[২০]

রবীন্দ্রনাথ কথিত এই 'চিত্ত বিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ত্ব'-এর অভাব ঘটেছে 'কৃষ্ণকুমারী'তে। অথচ রাজপুত জীবন-সন্ধ্যায় বিচিত্র দ্বন্দ্ব ইতিহাসে সঞ্চারিত হয়েছিল : গৃহবিবাদ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং সম্প্রসারণশীল বৃটীশ সাম্রাজ্য-বাদের কবল থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা—এসব মিলে যে সংঘাতময় মুহূর্ত, তাকে মধুসূদন নাটকের পটভূমিতে তুলে ধরতে পারেন নি। তিনি যা তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ বিসংবাদ, ব্যক্তিগত ঈর্ষা, লালসা, চাতুর্য, স্বার্থবুদ্ধি। ঐতিহাসিক ঘটনার ঘনঘটাকে যেন তিনি পশ্চাৎপটে রাখতেই চেয়েছেন। তাই দেখা যায় যে, বৃহত্তর ঐতিহাসিক সংঘাত তিনি উপস্থিত করেন নি। পাঠান সরদার আমীর খাঁর উল্লেখ রয়েছে নাটকে ; কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। অথচ যে টডের রাজস্থান থেকে মধুসূদন তাঁর রাজস্থান গ্রহণ করেছেন সেখানেও আমীর খাঁ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। কৃষ্ণকুমারীর অন্যতম পাণিপ্রার্থী মানসিংহও নেপথ্যে রয়ে গেছেন। এই নাটকে সিন্ধিয়ারও কোনও ভূমিকা নেই—যে ভূমিকার উল্লেখ টডের বইতেও রয়েছে। ইতিহাসের পটভূমি সম্যকরূপে গ্রহণ করলে নাটকটি ঘটনাবহুল হতে পারতো, নাটকে ঐতিহাসিক আবহাওয়াও সঞ্চারিত হতো।

কিন্তু মনে রাখতে হবে মধুসূদন মঞ্চব্যবস্থা ও অভিনেতার অভাবকে মনে রেখে চরিত্র সংখ্যা কমিয়েছেন। আবার দু'একটি অনৈতিহাসিত চরিত্রকে এমন প্রাধান্য দিয়েছেন যারা ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এর মধ্যে একজন তাঁর 'favourite' মদনিকা। মধুসূদনের মনকে সব চেয়ে অধিকার করেছিল কৃষ্ণকুমারীর জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি। সেই কৃষ্ণকুমারীর আত্মত্যাগই সব চেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে তাঁর কাছে এবং ইতিহাসের ঘটনাবর্ত দূরে সরে গেছে।

: দেশাত্মবোধের পরিচয় :

কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনার পেছনে দেশাত্মবোধের প্রেরণা ছিল—একথা অনেকে মানতে চান না। এঁরা বলেন এটি পুরোপুরি সাহিত্য প্রেরণাজাত সৃষ্টি। মধুসূদনের নাটকগুলি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হবার জন্যেই লেখা হতো। তাই তাঁর নাট্যরচনা অনেক পরিমাণে ঐ নাট্যশালার অভিনেতা ও পৃষ্ঠপোষকদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতো। আপনা থেকে যে নাটক তিনি রচনা করেছেন তা উক্ত মঞ্চে অভিনীত হতে পারেনি। তাঁর 'সুভদ্রা' নাটক, অসমাপ্ত থেকে গেছে ; প্রহসন দু'টি ['বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা'] ঐ মঞ্চে অভিনীত হয় নি। ইতিহাস থেকে মুসলমান চরিত্র গ্রহণ ক'রে 'রিজিয়া' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার প্রয়াসও তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়। কারণ, বেলগাছিয়া নাট্যশালার সমর্থন এতে ছিল না। সুতরাং মঞ্চের প্রয়োজনে এবং মঞ্চের মালিকদের রুচি অনুসারেই মধুসূদনকে নাটক লিখতে হয়েছে। স্বাদেশিকতা ভাবাপন্ন কোনও নাটক সেই সময়ে অভিনীত হওয়া সম্ভব ছিল না। মধুসূদনের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বেলগাছিয়া নাট্যশালায় নাটকটির অভিনয় হয় নি—নাটক প্রকাশের ৬ বছর পরে ১৮৬৭-এর ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটীর শোভাবাজার নাট্যশালা এর প্রথম অভিনয় করে।

পরাধীন দেশের কবি ও নাট্যকার মধুসূদন দত্ত। তাই সে যুগের নাট্যশালার মালিকদের রুচির দিকে যতই তিনি দৃষ্টি রাখুন না কেন, পরাধীনতার বেদনাকে একেবারে ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কৃষ্ণকুমারী রচনার দু'বছর আগে 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করতে গিয়েও তিনি প্রস্তাবনায় লিখেছেন :

> শুন গো ভারত-ভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি,
> আর নিদ্রা উচিত না হয়।
> উঠ ত্যজ ঘুমঘোর হইল, হইল ভোর
> দিন কর প্রতীচে উদয়।

'কৃষ্ণকুমারী'তে দেশাত্মবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। নাটকের পরিকল্পনার মধ্যেই এই দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কুল-মান রক্ষার জন্যে, দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে একটি নিষ্পাপ রাজপুত তরুণী স্বেচ্ছায় কি ভাবে আত্মবিসর্জন করলো—এই হচ্ছে নাটকটির মূল বক্তব্য। এই

আত্মবিসর্জনের প্রেরণা সে পেয়েছে আর একজন রাজপুত রমণী পদ্মিনীর কাহিনী থেকে। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে বার বার পদ্মিনীর উল্লেখ রয়েছে।[২১] নাটকের অন্য চরিত্রও পদ্মিনীর কথা উল্লেখ করেছে এবং কৃষ্ণকুমারী চরিত্রটিরই পরিবর্তন ঘটেছে পদ্মিনীর স্বপ্নআবির্ভাবে। মানসিংহ-অনুরাগিনী কৃষ্ণকুমারী তার প্রেমিকা সত্তা বিসর্জন দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত আত্মবিসর্জন দিয়েছে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে একাধিক ক্ষেত্রে দেশাত্ম-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহ-এর দৃপ্ত উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়: "মহারাজ স্বদেশের হিতসাধনে যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।" এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজা ভীমসিংহের মহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের স্মরণ এবং অসহায় অবস্থায় অন্তর্জ্বালার অভিব্যক্তি: "· এ ভারতভূমির কি আর শ্রী আছে! এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হ'লে আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই এ বিশ্বাস হয় না!" [২।১]। অথবা, "······আঃ, এ ভারতভূমিতে এইরূপ মঙ্গল ধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে! আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরত বইতে থাকে; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো।" [২।১]। একান্তভাবে উপজাতীয় সাম্প্রদায়িক বা বংশ নির্ভর ভীমসিংহ-এর এই সব উক্তির মধ্য দিয়ে মধুসূদন প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় উপলব্ধিকেই ব্যক্ত করেছেন।

: কৃষ্ণকুমারীতে ট্র্যাজেডীর আদর্শ :

আগেই বলা হয়েছে যে, মধুসূদন তাঁর কৃষ্ণকুমারী নাটককে একবার Historic Tragedy এবং এবং একবার Romantic Tragedy বলে উল্লেখ করেছেন। Classical Tragedy বলতে যেমন গ্রীক ট্র্যাজেডী এবং সেনেকার প্রতিহিংসা-মূলক ট্র্যাজেডী বোঝায় তেমনি হিষ্টরিক ট্র্যাজেডী ও রোমান্টিক ট্র্যাজেডী বলতে সাধারণত শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডীকেই বোঝায়। সুতরাং এ থেকে মনে হতে পারে যে, মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডীর আদর্শে গঠিত। কিন্তু নাটকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কৃষ্ণকুমারী রচনার সময় ট্র্যাজেডীর যে আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে সেটা গ্রীক ট্র্যাজেডীর আদর্শ। ড. অজিতকুমার ঘোষও বলেছেন—"······কৃষ্ণকুমারী রচনার সময় মধুসূদন

গ্রীক ও ল্যাটিন এবং ফরাসী নাটক সম্পর্কেও বিশেষ, অবহিত ছিলেন। কেশবচন্দ্রকে লিখিত আর একখানি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, The Greek and Latin Dramas are not written in Hexameter. [২২] এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন নাটক সম্পর্কে কতখানি জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। মনে হয়, তিনি গ্রীক ক্লাসিক নাটকের আদর্শে প্রথমে নাটকটি রচনা করেছিলেন, সেজন্য গোড়ার দিকে তিনি কোনো উপবৃত্ত রাখেন নি।" [মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৩, ভূমিকা, পৃ. একত্রিশ]।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের স্বরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিষাদে আপ্লুত। সমগ্র নাটকে কৃষ্ণকুমারীর নিয়তি যে একটি অদৃশ্য চরিত্ররূপে বিরাজমান এবং তারই চক্রান্তে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ঘটেছে।

এই নাটকের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর বিবাহকে কেন্দ্র করে। জগৎসিংহ ও মানসিংহের উভয়েরই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, হয় কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহে রাজী হতে হবে, নতুবা উদয়পুর ভস্মীভূত করে দেওয়া হবে। কৃষ্ণকুমারী সরল, কোমলপ্রাণা বালিকা তার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। সে যে মদনিকার চাতুর্যে মানসিংহের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছে সেটাকে অবশ্য গ্রীক নাটকের 'হ্যামারসিয়া' বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে তার কোনও কাজের ফলে ট্র্যাজেডী অনিবার্য হয়ে ওঠে নি। বরং মদনিকা, ধনদাসের সক্রিয় ও সফল ভূমিকাই এই নাটকের শোচনীয় পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছেন।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে যে সংঘাত সেটা দেশ ও জাতিকে বিচলিত করেনি। আবার ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডীর গভীরতাও এখানে অনুপস্থিত। একটি সরলা বালিকার জীবনে দুর্বিপাক নেমে এসেছে দৈব অভিশাপের মতো এবং তার পিতা ও মাতার শত চেষ্টাতেও তাকে রক্ষা করা গেল না।

ধনদাস বিলাসবতী প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কালে এক পত্রে মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীকে 'Heroine' বলেছেন; কিন্তু হিরোইন-এর কোনও বৈশিষ্ট্যই তার নেই। সে যেন অসহায়ের মতই আত্মবলি দিয়েছে। এর সঙ্গে ইউরিপিডিসের নাটকের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে ঠিকই, [২৩] কিন্তু ইউরিপিডিসের নাটকে কৃষ্ণকুমারীর মত ইফিজেনিয়ার মৃত্যু দেখানো হয়নি। অথচ কৃষ্ণকুমারীর এই স্বেচ্ছামৃত্যু এমন আকস্মিক যে মৃত্যুর ভয়াবহতাও নাটকে বিস্তৃত ও গভীর হতে পারেনি।

ভীমসিংহকে ট্র্যাজেডীর সার্থক নায়ক করে গড়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দেখা যায় তিনি প্রথম থেকেই ভগ্নহৃদয় এবং অস্থির—বাইরের শক্তিকে প্রতিরোধ করার সাধ্য তাঁর নেই। রাজকর্তব্য ও বাৎসল্য এই দুই-এর অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠে ট্র্যাজেডীর গভীরতা সৃষ্টি করতে পারতো; এখানে তাও হয়নি। তবে একটি দৃশ্যে [৫।২] অন্ততঃ শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডীর আমেজ এসেছে। "কন্যা স্নেহান্ধ রাজা লীয়র উন্মত্তভাবে ক্ষুব্ধ প্রকৃতির মধ্যে যেমন নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ভীমসিংহকেও ঝড়-দুর্যোগের মধ্যে নিতান্ত অসহায়ভাবে প্রলাপ বকিতে দেখিয়া, প্রচণ্ড দুঃখের আঘাতে আমাদের অন্তর রুদ্ধ হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ভীমসিংহ শেষ দিকে একেবারে শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্রের অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে।" [ড. অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলিকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ৯২]।

সেকস্‌পীয়রের নাটকের কোন্ চরিত্রের প্রভাব তাঁর নাটকে আছে এবং সেকসপীয়রের কোন্ আদর্শ তিনি অনুসরণ করেছেন তা তাঁর পত্রাবলীতে কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন যে, ধনদাসকে তিনি ইয়াগো চরিত্র করতে চাননি,[২৪] আবার বলেছেন যে, বলেন্দ্র সিংহকে কিং জন নাটকের ব্যাস্টার্ড চরিত্রের আদর্শে আঁকতে চেয়েছেন। সর্বোপরি ধনদাস-মদনিকা প্রসঙ্গও যে শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডীর পরিকল্পনার অনুসরণ একথাও তিনি বলেছেন শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডীতে হাস্যরসাত্মক প্রসঙ্গ নাটককে উজ্জ্বল করেছে, বৈচিত্র্য এনেছে। মধুসূদনও সেইরূপ উদ্দেশ্য নিয়েই ধনদাস-মদনিকা প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর বক্তব্য : "As the play is a tragedy I have not thought it proper to begin any scene with determination of being comic, in my humble opinion such a thing would not be keeping with the nature of the play......The only piece of cirticism I shall venture upon is this—never strive to be comic in a tragedy; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable varity. This I belive to be Shakespeare's plan." [কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি]।

শেকস্‌পীয়রের হ্যামলেট, ম্যাকবেথ তো বটেই, রোমান ট্র্যাজেডী জুলিয়াস সীজারেও অলৌকিক বিষয়ের উপস্থাপনা আছে। গ্রীক নাটকেও আছে দৈবাদেশ [oracles]। শুধু শেকস্‌পীয়র বা গ্রীক নাটক কেন উদাহরণ

দিয়েই দেখানো যেতে পারে যে সংস্কৃত নাটক থেকেও মধুসূদন একাধিক চরিত্র 'কৃষ্ণকুমারীর' জন্ত আহরণ করেছিলেন।[২৫]

তবে সংস্কৃত নাটকে ট্র্যাজেডী না থাকায় মাইকেলকে ট্র্যাজেডীর আদর্শের জন্ত ইউরোপীয় নাটকের দিকেই দৃষ্টি দিতে হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীতে তিনি নির্ভেজাল গ্রীক আদর্শ অথবা শেকস্‌পীয়রীয় আদর্শ অনুসরণ করেছেন—এ সম্পর্কে রায় দান করবার সময় আমাদের মধুসূদনের নিজের কথাই মনে রাখা উচিত : 'I have certain Drammatic notion of my own, which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a Drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have been given forth by the masterpieces of Willium Shakespeare'. অর্থাৎ মধুসূদনের নাটক দেখলেই তা শেকস্‌পীয়রের মানদণ্ডে বিচার করা হবে এটা মধুসূদন সঙ্গত মনে করেন নি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাটকের ছাপ স্বভাবতই তাঁর মনে পড়েছিল ; কিন্তু সব সময়ই কোনও একটি বিশেষ আদর্শ তিনি অনুসরণ করেছেন একথা মনে করা যায় না—কৃষ্ণকুমারীতে তো নয়ই। কৃষ্ণকুমারীসহ মধুসূদনের নাটকের অভিনয় সম্পর্কে দেখান হয়েছে যে, সেই সময় নাট্যকারের ইচ্ছামত নাটক লিখে তা কোনও রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করানো কত অসুবিধা ছিল। এই অসুবিধার জন্তই সম্ভবতঃ মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীর অব্যবহিত পরে এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার আগে [অর্থাৎ ১৮৬০-৭২-এর মধ্যে] বেশী নাটক রচিত হয়নি। এই সময়ে যে সামান্ত কয়েকখানা নাটক রচিত হয়েছে তার মধ্যে দু'টি ঐতিহাসিক নাটক : জগবন্ধু ভদ্রের 'দেবলাদেবী' [১৮৭০] এবং প্রাণনাথ দত্তের 'সংযুক্তা স্বয়ম্বর' নাটক। এই নাটক দু'টিতে ঐতিহাসিক বোধের তেমন কোনও পরিচয় নেই ; তবে শেষোক্ত নাটকটিতে দেশাত্মবোধের কিছু পরিচয় আছে। যেমন :

"আর কি আছে সেদিন যবে চীন মহাচীন
ভারতভূমির নামে সভয়েতে কাঁপিত
যবে দেশ দেশান্তরে, মানবে সম্ভ্রমভরে
ভারতের যশঃ রূপ গীতাবলী গাইত।" [১।২]

এ দু'টি প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক নাটক।

এই সময়ের আর একটি নাটক লেখেন যদুনাথ তর্করত্ন। নাটকটির নাম 'দুর্ভিক্ষ দমন নাটক' [১৮৭২]। ঐতিহাসিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে অবলম্বন করে নাটকটি লেখা। এই নাটকের রাজা হলেন দুর্ভিক্ষ আর মন্ত্রী হলেন 'হাহাকার।' নাটকটি মোটেই ঐতিহাসিক নাটকের পর্যায়ে ওঠেনি।

১। "The East India Company was formed to traffic in the luxuries of the rich, in spies, silks, gems, bezoar stones, camphor, indigo, sulphur"—Edward Thompson and G. T. Ganat, '*Rise and Fulfilment of British Rule in India*, Allahabad

২। Delta : Indigo & its Enemies, p. 62.

৩। Haran Ch. Chakladar : Fifty Years Ago : The woes of a class of Bengal Peasantry under European Indigo Planters [Dawn Magazine], July, 1905.

৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা, বসুমতী সংস্করণ, প্রথম ভাগ পৃঃ ১০।

৫। *Amrita Bazar Patrika*, 22 May, 1874.

৬। Parliamentary Papers, Vol. 45th, p. 75.

৭। যশোহর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামের অধিবাসী বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস। এঁদের সম্পর্কে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বঙ্কিম জীবনী' গ্রন্থে [পৃঃ ১২২] লিখেছেন—"বাঙালী মার খাইয়া অবশেষে মারিবার জন্য বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইল। একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের সামান্য প্রজা [চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর]। এই দুই স্বার্থত্যাগী মহাত্যাগী মহাপুরুষ বাংলার নিঃস্ব সহায়শূন্য প্রজাদের এক প্রাণে বাঁধিল—সিপাহী-বিদ্রোহের সদ্য-নির্বাপিত আগুনের ভস্মরাশি লইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইতে লাগিল।"

৮। *Bengal Under Lt. Governors*—E. Buckland. Vol I, p. 192.

৯। প্রমোদ সেনগুপ্ত, 'নীলবিদ্রোহ', পৃঃ ৭৩।

১০। 'দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী', বসুমতী সংস্করণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৩।

১১। পাবনার কৃষকদের বিদ্রোহ-ই গভর্ণমেণ্টকে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রজাস্বত্ব

আইন [Bengal Tenancy Act, 1885] প্রবর্তনে বাধ্য করে। এই আইনে ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি এবং চাষীদের কৃষিভূমি থেকে উচ্ছেদ রদ হয়ে কৃষি ভূমির ওপর চাষীর দখলীস্বত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়।

১২। 'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র ১২৮০।

১৩। 'বঙ্গদেশের কৃষক', প্রথম পরিচ্ছেদ—দেশের শ্রীবৃদ্ধি।

১৪। 'বঙ্গদর্শন' ভাদ্র, ১২৮০।

১৫। 'ভারত সংস্কারক পত্রিকা', ৭ই নভেম্বর, ১৮৭৩।

১৬। 'দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী', বসুমতী সং, ১ম ভাগ, ভূমিকা, পৃ. ৪।

১৭। মন্মথ রায়, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা', কলিকাতা

১৮। "Fancy, only 5 or 6 Males, and but 4 Females in a Historic Tragedy". কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠির অংশ।

১৯। "...When Iphigenia was led to the sacrificial alter, the salvasion of her country yielded a noble consolation. The votive vicitm of Jephtha's success had the triumph of a father's fame to sustain her resignation, and in the meekness of her suffering we have the best parallel to the sacrifice of the lovely Krishna."—'*Annals and antiquities of Rajasthan*'. London [1829], p. 490.

২০। 'সাহিত্য' কলিকাতা [১৯৫৮], পৃ. ১৬০।

২১। দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কৃষ্ণকুমারীর মাতা অহল্যা দেবীর উক্তি; পঞ্চমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মন্ত্রীর উক্তি। তৃতীয়াঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কৃষ্ণকুমারী তাঁর স্বপ্ন কাহিনী বর্ণনা ক'রে পদ্মিনী তাকে কি বলেছেন তা বিবৃত করেছে: "...তিনি বললেন—দেখ বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপনার প্রাণ দিয়ে রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই। আমি এ কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। যদি তুমি আমার মত কর্ম কর, তা হলে আমারই মত যশস্বিনী হবে।"

২২। শুধু এই ক'টি শব্দ নয় আমাদের বাংলা ভাষার ছন্দের সঙ্গে Greek and Roman Hexameter-এর তুলনা করেছেন মধুসূদন। গ্রীক

ও রোমান সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় ছিল এটা মেঘনাদবধ কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য থেকেও বুঝতে পারা যায়। মধুসূদনের লিখিত পত্র থেকেই এই তথ্য পাওয়া যাবে যে তিনি ঘড়ি ধ'রে হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা অধ্যয়ন করেছেন।

২৩। Euripides-এর নাটকীয় নাম *Iphiginia in Aulis.*

২৪। একটি পত্রে মধুসূদন লিখেছেন : "As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yago. The plot does not admit of such a character, even I could invent it which I gravely doubt."

২৫। শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিক" নাটকের বারাঙ্গনা চরিত্রের সঙ্গে বিলাসবতী মদনিকা চরিত্রের সাদৃশ্য এবং মৃচ্ছকটিকের ভিলেন চরিত্র রাজশ্যালকের সঙ্গে ধনদাসের সাদৃশ্য।



৩.

বাংলা নাটকের মুক্তি

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দকে ধ'রে একটা নূতন যুগের সূচনা-রেখা চিহ্নিত করা যায়। অবশ্য শুধু নাটকের দিক থেকে নয়, নানা দিক থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের গুরুত্ব রয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্যের প্রকৃত সাহিত্যিক রূপ পরিগ্রহ ঘটে ১৮৪৭ ১৮৬৯-এর মধ্যে। নাটকে ব্যবহারের উপযোগী বাক্য মধুসূদনের পদ্মাবতী নাটকের অর্থাৎ ১৮৬০-এর আগে উদ্ভাবিত হয় নি। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের যাত্রা সুরু ১৮৭২-এ এবং বঙ্কিমের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসগুলি এবং তাঁর প্রবন্ধাবলীও ১৮৭২-এর আগে রচিত হয়নি। বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সপ্তম দশক থেকে এবং ভারত সভা [Indian Association]-এর প্রতিষ্ঠা ১৮৭৬-এ। এর প্রায় বিশ বছর আগে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এটা জমিদার ও অভিজাতদের সভা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে ঐ এসোসিয়েসনের যোগ অনেক আগেই ছিন্ন হয়। নতুন ভারত সভা হলো এমন একটা প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালো।

ইতিপূর্বেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং হিন্দু সমাজের বহুমুখী সংস্কারের আন্দোলন চলছে। এদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দ্বারা জাতীয় ভাব জাগ্রত করছেন ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যুবকদের উত্তেজিত করছেন। এই অবস্থার মধ্যে বঙ্গদেশে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো।

: সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা :

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় [Public Theatre] প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগকে বলা যায় নাটকের মুক্তির যুগ। এর আগে সৌখীন রঙ্গালয়ের যুগে কলিকাতায় মুষ্টিমেয় অভিজাত সমাজের রুচির ওপরে নাট্যকলা নির্ভর করতো

— এটা আগেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রথম শ্রেণীর জন্য এক টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য আট আনা টিকিট-মূল্য ধার্য করে যখন দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অভিনয় হ'লো, তখন সীমাবদ্ধ দর্শকের গণ্ডি গেল ভেঙে—সাধারণ দর্শকের আবেগ, রুচি সেদিন থেকে গণনার মধ্যে আনতে হ'লো। তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে সমসাময়িক ভাবাদর্শ এবং সমাজচিত্র সম্বলিত নাটক ও প্রহসন রচনা সুরু হলো। বাংলা নাটকের প্রস্তুতি পর্বে সামাজিক অনাচারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে নাটক রচিত হয়েছিল—এ-যুগের নাটকে এসে লাগলো দেশাত্মবোধের তরঙ্গ। জাতীয়-চেতনা মুক্তিলাভ করতে সুরু করলো নাটকের মাধ্যমে।

: হিন্দুমেলা :

এই জাতীয়-চেতনার ভিত্তি রচিত হয়েছিল 'হিন্দুমেলায়।' ১২৭৩ সালের [১৮৬৭ খৃঃ] চৈত্র সংক্রান্তির দিন 'বেলগাছিয়া ভিলায়' হিন্দুমেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয়। বাঙালীর স্বদেশানুরাগের সংহতি ও সংবর্ধনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা হয়। এই সম্মেলনের বিঘোষিত আদর্শ ছিল এই : "আমাদের মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য ভারত-ভূমির জন্য।

"ইহার আরো একটি উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর, এই আত্ম-নির্ভর ইংরেজ জাতির একটি মহৎ গুণ। আমরা এই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্মেই আমরা রাজ-পুরুষের সাহায্য যাচ্ঞা করি। ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়?……যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।"[২]

রাজনৈতিক বিক্ষোভ পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান যে গঠিত হয়নি তা বলাই বাহুল্য। সভায় দেশাত্মবোধক গান এবং কবিতা পাঠ প্রভৃতির সাহায্যে সার্বিক দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা ছিল এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। 'মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের

যশোগান' শীর্ষক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত এবং গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি ক'রে'...শীর্ষক গান হিন্দুমেলা উপলক্ষেই রচিত হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উদ্বোধন' নামীয় কবিতাটিও ['জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান! মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?…'] এই হিন্দু-মেলা উপলক্ষেই রচিত হয়েছিল।

এই হিন্দুমেলার সঙ্গে সঙ্গে 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল' আন্দোলনও আরম্ভ হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়: "নবগোপালের সভায় থেকে এই ন্যাশনাল শব্দটা দাঁড়াইয়া গেল। ন্যাশনাল সঙ্গীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল।"[৩]

: রঙ্গালয়ে জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গ :

এই স্বদেশী বা জাতীয় আন্দোলনের তরংগ স্বভাবতই এসে লাগলো রঙ্গালয়ে। নাট্যকারেরা দেশাত্মবোধক নাটক রচনা ক'রে রঙ্গমঞ্চ থেকে দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করলেন। স্বদেশীযুগের অন্যতম দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়: "In early years of the seventies of the last century before Surendranath and Anandamohan had organised their new platform, it was the Bengali stage which had found expression to the new spirit of patriotism among our rising generation of educated intellectuals. It is on this stage that first proclaimed the gospel of the religion of the motherland in an opera."[৪] [Memories of My Life and Times, Calcutta, 1932].

বিপিনচন্দ্র পাল এখানে যে 'অপেরা'টির কথা বলেছেন সেটির নাম 'ভারত-মাতা'। ১৮৭৩-এ কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই ক্ষুদ্র রূপক দৃশ্যটি রচনা করেন। গানের মধ্য দিয়ে 'ভারতমাতা'র মর্মবাণী ঘোষিত হয়েছে। একটি মাত্র দৃশ্য সম্বলিত 'ভারতমাতা'র প্রারম্ভেই সূত্রধরের গান:

হে ভ্রাতঃ ভারতবাসী দেখ না চাহিয়ে।
পাইতেছ কি যাতনা মোহ-মদে মাতিয়ে॥
রিপুর হইয়ে দাস, করিতেছ সর্বনাশ,
ভুগিছ অশেষ ভোগ, লোভ-কূপে পড়িয়ে॥…

হিমালয় পর্বতে 'চিন্তামগ্না আলুলায়িতকেশা ভারতমাতা। সম্মুখে ভারত-সন্তানগণ নিদ্রিত।' ভারতলক্ষ্মী প্রবেশ ক'রে "মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি" এবং "দেখ গো ভারতমাতা তোমারি সন্তান"—এই গান দুটি গেয়ে চ'লে গেলেন। ভারতমাতাও নিদ্রিত সন্তানদের জাগ্রত করার জন্যে গান গেয়েছেন—"উঠ উঠ যাদুমনী কত কাল ঘুমোবে আর?" দৃশ্য শেষে 'ঐক্যতা' বক্তৃতার শেষে এই গান গেয়ে যবনিকা পতন ঘটিয়েছে :

"কেন ভয় ভীরু কর সাহস আশ্রয়
'যতোধর্মস্ততো জয়'
ছিন্ন ভিন্ন হীন বল ঐক্যতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?"...

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর দেশাত্মবোধক নাট্যরচনা 'ভারতে যবন' [১৮৭৪]। এই নাটকের বিষয়বস্তু হচ্ছে—ভারতমাতার দুঃখে ভারত সন্তান যবন বধ ক'রে স্বাধীনতা আনবার জন্য কিভাবে চেষ্টা করছেন তাই দেখানো। নাটকের ভূমিকাতেই নাট্যকার বলেছেন :

স্বাধীনতা সম কি আছে আর?
পামর যবনে করি কি ভয়?

নাটকের প্রধান চরিত্র বামদেব দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন :

বীরপ্রসূ এই ভারত জননী,
কত ক্লেশ আর সহিবে জানিনি?
স্বাধীনতা পদে সঁপ প্রাণ মন
লভিতে সে ধন কররে যতন।...

কিরণচন্দ্রের পর ১৮৭৫-এ হারাণচন্দ্র ঘোষ রচনা করেন চার অঙ্কের রূপক-নাট্য 'ভারতী দুঃখিনী', নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন 'এই কি সেই ভারত'। কিরণচন্দ্রের অনুকরণে কুঞ্জবিহারী বসু রচনা করেন 'ভারত অধীন' [১৮৭৬] এবং 'ধর্মক্ষেত্র' [১৮৭৭]।

জাতীয় ভাবোদ্দীপনা সমসাময়িক নাটকের মধ্যে প্রথম দেখা যায় হরলাল রায়ের নাটকে। তাঁর দু'খানি নাটক 'হেমলতা নাটক' [১৮৭৩] এবং 'বংগের সুখাবসান' [১৮৭৪] এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। অনেকটা ইংরেজী নাটকের আদর্শে পরিকল্পিত নাটক—'হেমলতা'। হেমলতা চিতোরের রাজা বিক্রম সিংহের কন্যা। হেমলতার ব্যক্তিচরিত্র এখানে গৌণ, বরং দেশের পরাধীনতার বেদনা এখানে বেশী পরিস্ফুট। বীর শ্রেষ্ঠ সত্যসন্ধ এই নাটকের প্রধান চরিত্র।

এই চরিত্রের মধ্য দিয়েই সমসাময়িক জাতীয় ভাবোদ্দীপনা প্রকাশিত হয়েছে। সত্যসখার একটি উক্তি : "ভারতভূমি পরাধীন হবার পূর্বে প্রত্যেক ভারত সন্তান প্রাণত্যাগ করুক" [৪।২]। এমন বীরত্ব ও মহাপ্রাণতার আদর্শে উদ্বোধিত নাটকে নাট্যকার যে গানগুলি দিয়েছেন তার একটিও জাতীয় ভাবোদ্দীপক নয়! অথচ পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রাজপুত কাহিনী নিয়ে লিখিত তাঁর নাটকে সুন্দর দেশাত্মবোধক সংগীত সংযোজন করেছেন।

হরলালের অপর দেশাত্মবোধক নাটক 'বংগের সুখাবসান' ব্যক্তিয়ার খল্‌জি কর্তৃক বংগ বিজয়ের কাহিনী নিয়ে রচিত। হরলাল বাংলার ইতিহাসের ঐ কলংকিত অধ্যায়টি অশ্রুজলে সিক্ত ক'রে উত্থাপিত ক'রেছেন।

লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে যে সব কিংবদন্তী ইতিহাসের আকারে প্রচলিত তা হচ্ছে এই : সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে ব্যক্তিয়ার খিলজী নবদ্বীপ অধিকার করেন। লক্ষ্মণ সেনের গুরুদেব জ্যোতিষ গণনা ক'রে বলেন—'এবার বাংলা যবনের হাতে যাবে' এবং এই কথা শুনে তিনি খিড়কীর দরজা দিয়ে পলায়ন করেন। একথা সত্য হলে এর চেয়ে কলঙ্কজনক ঘটনা আর কি হতে পারে। কিন্তু এ যুগের ইতিহাস থেকে লক্ষ্মণ সেনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, রাজা হবার আগে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন কলিঙ্গের একটি জেলার সামরিক গভর্ণর ছিলেন। রাজা হবার পর তিনি বিজয়ী বীর হিসাবে এবং সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি তাঁর রাজ্যের সীমা দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত করেন, কামরূপ জয় করেন এবং বেনারসের রাজাকে পরাজিত করেন।[৫] তা ছাড়া ব্যক্তিয়ার খিলজী বাংলা দেশের অধিকাংশই জয় করতে পারেন নি। তাঁর নদীয়া ও লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের পরেও পূর্ববংগে লক্ষ্মণ সেনের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল, এর প্রমাণও ইতিহাসে আছে। তাই লক্ষ্মণ সেনকে সাধারণভাবে যেরূপ ভীরু ও কাপুরুষ রূপে চিত্রিত করা হয়—তিনি প্রকৃতই সেরূপ কিনা এবিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

হরলাল রায় তাঁর নাটকে লক্ষ্মণ সেনকে [নাটকে লাক্ষ্মণ্য সেন] হতভাগ্য রাজা হিসেবে চিত্রিত ক'রলেও তাঁকে দেশপ্রেমিক বীর হিসেবেই উপস্থাপিত ক'রেছেন। ব্যক্তিয়ার খিলজী যখন নবদ্বীপ আক্রমণ করেন তখন তিনি বৃদ্ধ। কিন্তু সেই বৃদ্ধ বয়সেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। গুরুদেব গণনায় পেয়েছেন যবনের জয় এবং হিন্দুর নিশ্চিত পরাজয়। কিন্তু

পরাজয় নিশ্চিত জেনেও দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"বংগভূমির কি রক্ষক নাই, রাজা নাই? যবনেরা জয় পতাকা তুলে, জয়বাদ্যে গগন প্রতিধ্বনিত করবে আর বংগভূমি বিনা বাতাসে শুষ্কপত্রের ন্যায় নিঃশব্দে পতিত হবে এবং কাপুরুষ লাক্ষ্মণ্য সেন জীবিত থাকবে! রাজ্য, স্বদেশ, জন্মভূমির জন্য যুদ্ধ করবো না? নরদেহ বিশিষ্ট লাক্ষ্মণ্য সেন কি পাষাণমূর্তি মাত্র? গুরুদেব, লাক্ষ্মণ্য সেন বৃদ্ধ বটে, ভীরু নয়। যুদ্ধ করবো।"

যুদ্ধে পরাজিত হলেন লক্ষ্মণ সেন। এই মূল ঘটনাকে হরলাল বিকৃত করেন নি। তিনি যেমন লক্ষ্মণ সেনের বীর্যবত্তা দেখিয়াছেন, তেমনি মন্ত্রী বিরাট সেন চরিত্রকেও বিশেষ গৌরবান্বিত করেছেন। ব্যক্তিয়ার খিলজীর উচ্চপদের প্রলোভনকে তিনি অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যখন দেশ-জননীর হস্তপদ শৃঙ্খলে বাঁধা তখন বেঁচে থাকার মধ্যে কোনও সার্থকতা দেখতে পাননি। ব্যক্তিয়ার বিরাট সেনকে 'চির স্বাধীন' দেশে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলে, বিরাট সেন বলেছেন—"আপন মাকে দুরবস্থায় ফেলে কি পরের মাকে মা বলবো? আমি বঙ্গমাতার সন্তান, এ আমার পরম গৌরব। ওহে মুসলমান সেনাপতি, বংগভূমির তুল্য দেশ আর পৃথিবীর মধ্যে নাই। বিদেশের সুখের জন্য বংগভূমিকে ভুলিতে পারি না।" [৪।১]

বিরাট সেন দেশবাসীকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দান করবেন না—এই সর্তে ব্যক্তিয়ার তাঁকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তার উত্তরে বিরাট সেনের উক্তি:- "বিরাট সেনকে স্বাধীনতা দিলে সে স্বদেশীয়গণকে স্বাধীন হতে নিশ্চয়ই উত্তেজিত করবে, অতএব আমাকে স্বাধীনতা দিয়ে কাজ নাই। চল আমি ভয় নিবারণের জন্যে স্বেচ্ছাপূর্বক ফাঁসিকাঠে উঠছি।" এই জলন্ত দেশ-প্রেমের সুর এর পরেই ধ্বনিত হলো যাঁর নাটকে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

: জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটক :

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চারখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন: 'পুরুবিক্রম' [১৮৭৪], 'সরোজিনী' [১৮৭৫], 'অশ্রুমতী' [১৮৭৯] এবং 'স্বপ্নময়ী' [১৮৮২]। এই চারখানির মধ্যে প্রথমখানিতে মুসলমান-পূর্ব যুগের কাহিনী গৃহীত হয়েছে এবং শেষ তিনখানিতে গৃহীত হয়েছে মুসলমান আমলের কাহিনী। কোনও নাটকেই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাস সরাসরি

গ্রহণ করা হয়নি। 'পুরুবিক্রম'-এ গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে হিন্দু-রাজা পুরুর বীর্যবত্তার কাহিনী; 'সরোজিনী'তে মেওয়ারের রাজা লক্ষ্মণ-সিংহের স্বাধীনতা সংগ্রাম—পাঠানরাজ আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে; 'অশ্রুমতী'তে মোগল সম্রাট আকবরের সংগে প্রতাপ সিংহের সংগ্রাম এবং 'স্বপ্নময়ী-তে শুভসিংহের যে বিদ্রোহ তাও মোগল সম্রাট আরংজীবের বিরুদ্ধে।

মুসলমান-পূর্ব যুগের কাহিনী নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে নাটকখানি লিখেছেন সেখানে তো বটেই, মুসলমান আমলের বিষয়বস্তু নিয়ে লিখিত নাটকেরও মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিন্দু রাজাদের বীর্যবত্তা। আর এই নাটকগুলিতে যে দেশাত্ম-বোধ বা জাতীয়তাবোধ রয়েছে তার মধ্যে হিন্দু-প্রবণতা লক্ষণীয়।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তা সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ভারতবাসীর অখণ্ড জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে তিনি রীতিমত সংশয় প্রকাশ ক'রেছেন: "প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতবর্ষীয়দিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় কি না? ভারতবর্ষীয় বলিলে ভারতবাসী মুসলমান ও খৃষ্টান তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় কি না? যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া শুদ্ধ হিন্দু জাতিকেই ধরা যায়—তাহা হইলেও এক্ষণে হিন্দুগণের যেরূপ অবস্থা, তাহাদিগকে কি এক জাতি বলিয়া মনে হয়?"[৬]

এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তার ফলে তাঁর নাটকে যেমন হিন্দু মানসিকতাকে বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন, তেমনি আবার বৃহত্তর মানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দু ও মুসলমানকে সহজ স্বীকৃতি দান করেছেন।

নারীজাগরণ সম্পর্কেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পারিবারিক অবরোধ প্রথা দূর করার জন্যে একাগ্রতা দেখান, স্ত্রীকে অশ্বারোহণে অভ্যস্ত করান, তিনিই তাঁর কিঞ্চিৎ জলযোগ নামক প্রহসনে স্ত্রী-স্বাধীনতার ওপর কটাক্ষ করেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে গৃহের পবিত্রতা রক্ষা, সন্তান পালন ও সন্তানকে শিক্ষাদান, গৃহকে শ্রীভূষিত করার মধ্যে স্ত্রীলোকদের কার্য শেষ ব'লে মতামত জ্ঞাপন করেছেন। স্ত্রীজাতির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে তিনি নৈতিক অধঃপতনের আশঙ্কা পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন।[৭]

এই সব কারণেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে একদিকে যেমন ঐতিহ্যিক

['পুরুবিক্রম' নাটক], সরোজিনীর ['সরোজিনী' নাটক] মত চরিত্র—যারা দেশ প্রেমকে ব্যক্তি প্রেমের উর্ধ্বে স্থান দান করেছেন ; তেমনি আবার পাই অশ্রুমতী ['অশ্রুমতী' নাটক] এবং স্বপ্নময়ীর ['স্বপ্নময়ী' নাটক] মত চরিত্র—যারা ব্যক্তি প্রেমের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। অশ্রুমতী চরিত্রকে বীরাঙ্গনা ক'রে তোলা হয়তো সম্ভব ছিল না, কিন্তু স্বপ্নময়ীর চরিত্রে সে সম্ভাবনা ছিল।

নাটকে বিজাতীয় প্রেম কাহিনী রচনা করার ঝোঁক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আর এক বৈশিষ্ট্য। 'পুরুবিক্রম'-এ গ্রীক দেশীয় সম্রাট সেকেন্দর শা ও পঞ্জাব দেশীয় নরপতি তক্ষশীলের ভগিনী অম্বালিকার প্রেম, 'সরোজিনী'তে বাদশাধিপতি বিজয় সিংহ ও রোশেনার প্রেম, 'অশ্রুমতী'তে রাণা প্রতাপ-সিংহের কন্যা ও যুবরাজ সেলিমের প্রেম অম্বালিকা, রোশেনারা ও অশ্রুমতী তিনজনই বন্দী অবস্থায় বিজাতীয় পুরুষকে হৃদয় দান করেছে। এই তিন-জনের কারও প্রেমই শেষ পর্যন্ত সার্থকতা লাভ করেনি—একজন নিহত হয়েছে, আর দুজন সন্ন্যাসিনী হয়েছে। 'স্বপ্নময়ী'তে-ও প্রেম সার্থক হয়নি, স্বপ্নময়ী উন্মাদিনী হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অতিমাত্রায় রোমান্টিক প্রবণতা প্রেমকাহিনীকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যে, ঐভাবে সন্ন্যাসিনীতে পরিণত করে, হত্যা ক'রে বা পাগল ক'রে দিয়ে শেষ রক্ষার চেষ্টা হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আলোচ্য নাটকগুলি উদ্দেশ্যমূলক অর্থাৎ দেশপ্রেম প্রচারের জন্যে তিনি এই নাটকগুলি রচনা করেন। কিন্তু তাঁর রোমান্টিক মন ইতিহাসের কাহিনীকে এমন পর্যায়ে টেনে নিয়ে গেছে যে, যেগুলি ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স-নাট্যে পরিণতি পেয়েছে। তিনি ইতিহাসের সংগে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে ধরণের নাটক রচনা শুরু করেন, পরবর্তীকালে আরও কয়েকজন নাট্যকার সেই পথ অনুসরণ ক'রেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য তার দৈর্ঘ্য। নাটক দীর্ঘায়তন করতে গিয়ে তিনি সুদীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার করেছেন। শুধু তাই নয় তাঁর নাটকে বিস্তারিত স্বগতোক্তির ব্যবহারও রয়েছে। অবশ্য স্বগতোক্তির চেয়ে তিনি বেশী ব্যবহার করেছেন জনান্তিক উক্তি। এ সবই নাটকের গতি মন্থর করেছে। তা ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে যাত্রার প্রভাবও কিছু কম নয়। যাত্রার মতই কর্মহীন দীর্ঘ বক্তৃতাগুলি চরিত্র বিকাশের পক্ষেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য দীনবন্ধু ও মাইকেলও এ থেকে মুক্ত নন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও মাইকেলের অনুসরণে নাটকে গদ্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন। অবশ্য দেশাত্মবোধের আবেগ সৃষ্টির জন্যে তিনি মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ সংলাপও ব্যবহার করেছেন। গদ্য সংলাপ ব্যবহারের সময়ও কোন শ্রেণীর চরিত্রের মুখে এই সংলাপ বসাচ্ছেন নাট্যকার সেদিকেও লক্ষ্য রেখেছেন।

॥ পুরুবিক্রম ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক রচনা সুরু হবার পাঁচ বছর আগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হয় [১৮৬৭]। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি রচনায় এই হিন্দুমেলার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তাঁর নিজের কথায়: "জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষ্যে একবার গুণুদাদার সঙ্গে আমাকে কটকে যাইতে হইয়াছিল। হিন্দুমেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশ প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতেই আমি 'পুরুবিক্রম' নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।"[৮] দেশপ্রেমের প্রেরণা দানের জন্যে এই নাটকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মিলে সব ভারত-সন্তান......' শীর্ষক যে বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গানটি ব্যবহার করা হয়েছে: [১।১ এবং ৩।২] সেটিও 'হিন্দুমেলা'র দ্বিতীয় অধিবেশনে [১১ই এপ্রিল, ১৮৬৮] প্রথম গাওয়া হয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে ইতিহাসের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার চেয়ে দেশাত্মবোধের প্রচারেই বেশী সচেষ্ট ছিলেন। সেকালের 'মধ্যস্থ' পত্রিকা ও [২৩ অগ্রহায়ণ, ১২৭৯] মন্তব্য করেছিল: "গ্রন্থকর্তা কেবল স্বদেশানুরাগের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন, মানব হৃদয়সিন্ধুর মধ্যে ডুবিতে অধিক্ষণ সময় দেন নাই।" ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই রকম: "ইহা বুঝা উচিত, নাটক ও ইতিহাস এক জিনিষ নহে। কোন দেশের কোন নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় না।"[৯] এ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে তিনি রীতিমত সচেতন ভাবেই ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকে অনুক্ত গৌণ ঘটনা নাট্যকার রূপায়িত করতে পারেন বা ইতিহাসের সংগে সংগতি রেখে দু'একটি চরিত্রও তিনি সৃষ্টি করতে পারেন— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তা ক'রেছেনও। কিন্তু তাঁর অধিকারের সীমা তিনি নানাভাবে লঙ্ঘন করেছেন।

'পুরুবিক্রম'-এ 'ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের অতীত গৌরব কাহিনী কীর্তন' করতে চেয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং তা করেছেনও, বরং বলা যায় একটু বেশী মাত্রায়ই করেছেন। এই জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন: "গ্রন্থখানি বীররস প্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়।"[১০] এই বীররস বীরত্বব্যঞ্জক ভাষার সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়নি, বরং অসি-নিষ্কাসন, অসি-যুদ্ধ, [৩।১. এবং ৫।১] রণবাদ্য, কোলাহল প্রভৃতির সাহায্যে বীররস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। এই জন্যে ড. সুকুমার সেন বলেছেন: "পুরুবিক্রমের বীররস অবাস্তব, যুদ্ধের ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনা থিয়েটারী যুদ্ধের মত।"[১১]

'পুরুবিক্রম' নাটকের মূল বিষয়বস্তু দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর সেকেন্দার শাহর ভারত আক্রমণ এবং তাঁর সঙ্গে পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিলম ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের নরপতি পুরুরাজের যুদ্ধের কাহিনী। এই যুদ্ধে পুরুর বীরত্ব ছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে কুলু প্রদেশের রাণী ঐলবিলা ও পুরুর প্রেম, ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী পঞ্জাব দেশীয় অন্যতম নরপতি রাজা তক্ষশীলের সেকেন্দার শাহর কাছে আত্মসমর্পণ, তক্ষশীলের ভগিনী অম্বালিকার সঙ্গে সেকেন্দার শাহর প্রেম-কাহিনী।

৩২৭ খৃঃ পূঃ-এ সেকেন্দার শাহ হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম ক'রে যখন ভারতবর্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হন তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল বহু স্বাধীন ও অর্দ্ধ-স্বাধীন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এই সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত ছিল না। এর ফলে এদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকতো। রাজনৈতিক জীবনের এই অনৈক্য বিদেশী আক্রমণের সাফল্যে প্রভূত সহায়তা করেছিল।

সেকেন্দার শাহ প্রথমে সোয়াট ও কুনার উপত্যকার দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতিকে পরাজিত করেন। গ্রীকবাহিনী তার পরে অগ্রসর হলো; কিন্তু সীমান্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক অনৈক্য হেতু তাদের কোনও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। বরং তক্ষশীলার অধিপতি আম্ভি পুষ্করাধিপতি সঞ্জয়, শশীগুপ্ত প্রমুখ ভারতীয় রাজন্যবর্গ স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে গ্রীক আক্রমণকারীদের সাহায্যই করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের যে সমস্ত নরপতি মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সেকেন্দার শাহর অগ্রগমনে প্রাণপণ বাধা দান করেছিলেন তাঁদের

মধ্যে পুরু, অভিসার-রাজ এবং মালব ও ক্ষুদ্রক উপজাতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সীমান্ত অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন পুরু। সাড়ে ছয় ফিট লম্বা দৈত্যের মত দেহধারী বীর পুরু ৩০ হাজার পদাতিক, ৪ হাজার অশ্বারোহী, ৩ শত রথ এবং ২ শত হাতী নিয়ে বীর-বিক্রমে গ্রীক্ বাহিনীর সম্মুখীন হন। কিন্তু অসীম সাহসের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করেও প্রতিপক্ষের কাছে পরাজয় বরণে বাধ্য হন। তাঁর সৈন্যবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয় এবং ক্ষত বিক্ষত দেহে তিনি বন্দী হন। সেকেন্দার শাহ তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে হৃতরাজ্য প্রত্যার্পণ ক'রে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বন্ধুত্ব অবশ্য অধীনতামূলক ছিল,[১২] যার ফলে সেকেন্দার শাহ যখন পূর্ব-দিকের রাজ্য জয়ে অগ্রসর হন তখন পুরু শুধু নিরস্তই থাকেন নি, বরং তাঁকে রাজ্য জয়ে সাহায্য করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেও দেখা যাচ্ছে যে, পুরুর পরাজয়ের পর 'গঙ্গানদী কূলবর্তী প্রদেশগুলি জয় করবার জন্য' সেকেন্দার শাহ যাত্রা করছেন। তার পূর্বে পুরুর শৃঙ্খল মোচন করে দিয়ে বলছেন: "লৌহ শৃঙ্খল হতে তুমি এখন মুক্ত হলে—এখন রাজকুমারী ঐলবিলার সহিত প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে দুজনে সুখে রাজত্ব ভোগ করো।" [৫।২]। পুরুরাজও ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার কথা ভুলে গিয়ে সেকন্দর শার 'অসাধারণ মহত্ব ও উদারতা দেখে' চমৎকৃত হয়ে বললেন—"আজ হতে আপনি আমাকে আপনার হিতৈষী বন্ধু-গণের মধ্যে গণ্য করবেন।" [৫।২]।

ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে পুরুর এই পরিণতির মধ্যে অসংগতি নেই, কিন্তু দেশাত্মবোধ প্রচার যে নাটকের উদ্দেশ্য এবং নাটকীয় দৃশ্যে যিনি প্রকৃত বীরের মত 'ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু ইচ্ছা' করছেন এবং বিজয়ীর কাছে 'রাজার প্রতি রাজার ন্যায়' আচরণ দাবী করছেন, সেখানে ঐতিহাসিক সংগতি রক্ষা করেও পরিণতি অন্য রকম করা সম্ভব ছিল।

দেশপ্রেম প্রচারের তাগিদেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিন্তু খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর ঘটনা সম্বলিত নাটকে উনবিংশ শতাব্দীর অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবোধ আরোপ করেছেন। নাটকে উদাসিনীর গান 'মিলে সব ভারত সন্তান' এবং নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণে [১৮৭২] সংযোজিত রবীন্দ্রনাথের 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গান দু-টিই উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারার বাহক।

পুরুর বীরত্ব ইতিহাসে স্বীকৃত। কিন্তু বৃহত্তর ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছিল—একথা মেনে নেওয়া যায় না। অথচ নাটকের পুরু তাঁর সৈন্যদলকে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই উদ্বুদ্ধ করেছেন :

"এত স্পর্ধা যবনের স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিতে হরণ
তারা কি করেছেন মনে সমস্ত ভারত ভূমে
পুরুষ নাহিক একজন ?" [৩।১]।

সেকেন্দর শাহর ভারত আক্রমণের সাফল্যের অন্যতম কারণ ভারতের রাজন্যবর্গ সম্মিলিতভাবে তাঁকে বাধা দিতে পারেননি এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদের জন্যেই এরূপ ঘটেছিল। অথচ 'পুরুবিক্রম' নাটকে দেখা যাচ্ছে "পঞ্চনদ কূলবর্তী সমস্ত প্রদেশের রাজগণ যবন রাজের বিরুদ্ধে বিতস্তা নদীকূলে প্রথম সমবেত হন"। [২।১]। পুরু সেকন্দর শাহর দূত এফেষ্টিয়নকে 'দেশের প্রতিনিধি' হিসেবেই যুদ্ধ ঘোষণার কথা ব্যক্ত করেছেন। অথচ ইতিহাসে আমরা যা পাই তা হচ্ছে নিজ রাজ্য রক্ষার সীমিত দায়িত্ব পালনের জন্যেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে 'পুরুবিক্রম' নাটক রচিত হলেও শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি হয়েছে পটভূমিকা—মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রেম-উপাখ্যান। এই উপাখ্যানগুলির কোনটিই ঐতিহাসিক নয়। যে নারী চরিত্র দুটিকে অবলম্বন করে প্রেমকাহিনী রচিত তারাও কেউ ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। এই চরিত্র দুটির মধ্যে একটি কুদ্র পর্বতের রাণী ঐলবিলা। দেশাত্মবোধক নাটকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ এমন একজন রাণীর চরিত্র সৃষ্টি কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে পুরু ও তক্ষশীলের যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে তা এমনই প্রাধান্য পেয়েছে যে, মনে হয় এইটাই মূল নাটকীয় দ্বন্দ্ব। শুধু তাই নয়, এই দ্বন্দ্বে বীর পুরুর মহনীয়তাও খর্ব হয়েছে। অত বড় বীর পুরুরাজ একটি জাল পত্রের দ্বারা প্রতারিত হয়ে ব্যর্থ প্রণয়ের নৈরাশ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলছেন : "হা! কেন আমি বেঁচে উঠলেম ? রণক্ষেত্রেই কেন আমার প্রাণ বহির্গত হল না?" [৫।১]। পরাজয়ের গ্লানিতে যদি তাঁর মুখ দিয়ে এই কথা উচ্চারিত হতো তা হলে চরিত্রটির মহনীয়তা রক্ষিত হতো।

স্বদেশ-প্রেমের পথ বেয়ে পুরুর প্রতি ঐলবিলার যে মহৎ প্রেম সৃষ্টি হয়েছিল তার বৈসাদৃশ্য রূপে সেকেন্দর শাহের প্রতি তক্ষশীলের ভগ্নি অম্বালিকার প্রেম-কাহিনী রচিত হয়েছে। কিন্তু দিগ্বিজয়ী বীর সেকন্দর শাহ নিজে প্রেমমুগ্ধ হয়ে এবং অপরের প্রেমের ব্যাপারে জড়িত হওয়ার ফলে তাঁরও মহত্ত্ব এবং গাম্ভীর্য রক্ষিত হয়নি।

'পুরুবিক্রম' নাটক মিলনান্তক; যদিও অম্বালিকা চরিত্রের বিষাদান্তক পরিণতি মিলনের আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা, যে উদ্দেশ্যে নাটকটি রচিত নাটক পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে সেই দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার মত ঘটনা সংস্থাপন করা উচিত ছিল। একটি প্রেমধর্মী রোমান্টিক নাটকের মত উপসংহার রচিত হয়েছে এই নাটকে। যথার্থ নাট্য-কৌশলের বেশ অভাব রয়েছে নাটকটিতে। চরিত্রগুলির ক্রমবিকাশ ঘটেনি এবং একটি জাল পত্র রচনা করে যা কিছু জটিলতা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। একটি দৃশ্যে [৩।১] সামান্য কিছু কবিতা ছাড়া নাটকটির সংলাপ আগাগোড়া গদ্যে লিখিত। সেই সংলাপকে অকারণ দীর্ঘ ও বক্তৃতাধর্মী করায় পুনরুক্তি-দোষ ঘটেছে এবং নাটকের গতি হয়েছে মন্থর।

এ সব সত্ত্বেও সে যুগে নাটকটি সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করেছিল[১৩] এবং মঞ্চাধ্যক্ষরা নাটকটি লুফে নিয়েছিলেন।[১৪] এর অন্যতম কারণ 'পুরু-বিক্রম'ই প্রথম পূর্ণাঙ্গ দেশাত্মবোধক নাটক। এই দেশাত্মবোধের সঙ্গে কাল্পনিক উপাখ্যান অংশও সে যুগে প্রশংসিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শনে লেখা হয়েছিল: "এই উপন্যাসে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু নাটকে তাদৃশ নাই।" [ভাদ্র, ১০৮১]।

॥ **সরোজিনী** ॥ 'পুরুবিক্রম'-এর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বনে দু খানি দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেন। এর একখানির নাম 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' [১৮৭৫]। এই নাটকটি সে যুগে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৮৭৬-এর ১৫ই জানুয়ারী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। তার পর থেকে শুধু রঙ্গমঞ্চে নয়—যাত্রার আসরেও 'সরোজিনী'র অভিনয় চলতে থাকে। "শহরে-মফঃস্বলে— রঙ্গমঞ্চে এবং যাত্রার আসরে অভিনীত হইয়া সরোজিনী নাটক একদা দেশকে মাতাইয়াছিল। আর কোনো বাঙালা নাটক এমন সর্বত্র সমাদর লাভ করে নাই।"[১৫]

এই নাটকের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ এই নাটকের মধ্যে দিয়ে হিন্দু

তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে উদ্বোধিত করা হয়েছিল। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রকৃত পক্ষে তাঁর যুগের ভাবধারাই ব্যক্ত করেছেন। লক্ষ্মণ সিংহ যখন বলছেন দেবতা রাজপুতদের প্রতিকূল, তখন বিজয়সিংহ উত্তর দিচ্ছেন: "ভবিষ্যৎ দৈববাণীর কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিঘ্নের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য কত্তে বলচেন তখন তাই যথেষ্ট, আর কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নেই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী।" [১।২]

নাটকের শেষ দৃশ্যে রামদাসের পদ্যময় সংলাপে যে কথা বলা হয়েছে তাও ভারতের পরাধীনতা-জনিত দুর্ভাগ্যের বিবরণ:

'স্বাধীনতা-রত্ন হারা, অসহায়া, অভাগা-জননি।
ধন-মান যত, পর-হস্তগত
পর-শিরে শোভে তব মুকুটের মণি।
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, কোষবদ্ধ নিস্তেজ-কৃপাণ
শর তৃণাশ্রিত রণবাদ্য হত,
ধূলায় লুটায় এবে বিজয়-নিশান।
দেখিবে নয়নে কি গো আর সে সুখের তপন,
ভারতের দগ্ধ-ভালে, উদিত হইবে কালে,
বিতরিয়া মধুময় জীবন্ত কিরণ।'

নাটকের পাঁচটি অঙ্কের পরেও আর একটি অঙ্ক সংযোজিত ক'রে রাজপুত রমণীদের আত্মবিসর্জনের গৌরবময় চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত যে গানটি শেষ দৃশ্যে বার বার ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে শুধু সতীত্ব রক্ষার জন্যে আত্মদহনের জ্বালারই অভিব্যক্তি নয়, আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ সৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও ধ্বনিত হয়েছে:

জ্বল, জ্বল, চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনই প্রাণের জ্বালা।
শোন্ রে যবন! শোন্‌রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালিলি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।

গানের মধ্যে ধ্বনিত এই আশা অবশ্য অমূলক ছিল না। কারণ এই পরাজয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই রাজপুতরা চিতোর আবার অধিকার করেন।

এই নাটকে রাজপুত রমণীদের 'জহরব্রতের' যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে অতিরঞ্জন নেই। আলাউদ্দিন [আল্লাউদ্দিন]-এর সৈনিকের ভাষায়: "ঘরে ঘরে এই রকম চিতা জ্বলছে, এ নগরে আর একটিও স্ত্রীলোক নেই।" আলাউদ্দিন নিজেই দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছেন; "সমস্ত চিতোর নগরই যেন একটি জ্বলন্ত চিতা ব'লে বোধ হচ্ছে।" টড তাঁর 'রাজস্থান'-এ বলেছেন: "That horrible rite, the *Jahur* where the females are imolated to preserve them from pollution or captivity. The funeral pyre was lighted within the 'great subterranean retreat, in chambers impervious to the light of the day, and the defenders of Chitor beheld in procession the queens, their own wives and daughters to the number of several thousands. The fair Padmini closed the throg.......They conveyed to the cavern, and the opening closed upon them leaving them to find security from dishonour in the devouring element."[১৬]

এই জহরব্রত ছাড়া 'সরোজিনী' নাটকে ইতিহাসের দিক থেকে কিন্তু অনেক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ আলাউদ্দিন যখন চিতোর আক্রমণ করেন [১৩০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে] তখন মেবারের [মেবারের রাজধানী চিতোর] রাণা ছিলেন রতন সিংহ। এখানে লক্ষ্মণ সিংহকে বলা হয়েছে [মেওয়ার] রাজা। তা ছাড়া এই রতন সিংহের স্ত্রী পদ্মিনী; অথচ নাটকে পদ্মিনীকে ভীমসিংহের স্ত্রী বলা হয়েছে [১।১ এবং ১।৬]। দ্বিতীয়তঃ আলাউদ্দিন ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। তিনি আলেকজেণ্ডারের মত বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখতেন। ভারতবর্ষে বহুরাজ্য তিনি জয় করেন। নাটকে আলাউদ্দিনের প্রকৃত চরিত্রে আলোকপাত করা হয়নি, বরং 'আলাউদ্দিন-পদ্মিনী' সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর[১৭] দ্বারা নাট্যকার বেশী প্রভাবিত। তৃতীয়তঃ ভৈরবাচার্য নামে যে চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে তা একেবারে অবাস্তব। এঁর প্রকৃত নাম মহম্মদ আলি। চিতোরের রাজপুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত থেকে রাজপুতদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ক'রে আলাউদ্দিনের চিতোর জয়ের পথ প্রশস্ত করার কাজে তিনি নিযুক্ত। একজন

মুসলমান কি ভাবে রাজপুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন? এই প্রশ্ন যে কোনও পাঠকের বা দর্শকের মনে উদিত হবেই—একথা নাট্যকার নিশ্চয়ই অনুমান করেছেন। তাই তিনি নাটকের সংলাপের মধ্য দিয়ে কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করেছেন। ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা লক্ষ্মণ সিংহের বিশ্বস্ত অনুচর ভৈরবাচার্য সম্পর্কে রাজাকে জানাচ্ছেন: "মহারাজ! তার মত ধূর্ত আর জগতে নাই। সকলেই তার কাছে প্রতারিত হয়েছে। চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরের পূর্ব পুরোহিত সোমচার্য মহাশয়ের নিকট সে ব্রাহ্মণের পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে তার ছাত্র হয়েছিল। পরে তাঁর এমনই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল যে তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি ওকেই আপন পদে নিযুক্ত ক'রে যান।" এই কৈফিয়তের পরেও মনে প্রশ্ন জাগবে যে, কতদিন চেষ্টা করলে একজন মুসলমান আতপচাল-কাঁচকলা ভক্ষণেই শুধু অভ্যস্ত হওয়া নয় ইচ্ছামত বেদমন্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে অনর্গল সংস্কৃত উদ্ধৃতি দিতে পারে? নাট্যকার এই সন্দেহও সম্ভবত নিরসনের জন্যে মহম্মদ আলির চ্যালা ফতেউল্লাকে দিয়ে তার পূর্ব ইতিহাস বলিয়েছেন: "বাদশার ভাইঝিরে নিয়ে তুই যে পেলিয়েছিলে, তার লাগি তো তোমার গর্দান নেবার হুকুম হয়। তুমি তো সেই ভয়ে দশ বছর ধরি পেলিয়ে বেড়ালে, শ্যাষে হাঁদুদের মন ভোলায়ে, এই হ্যাদু মস্‌জিদের মোল্লা হয়ে বসলে।" মহম্মদ আলিকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সাজার জন্যে দশ বছর সুযোগ দিতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিন্তু আর এক মস্ত ভুল ক'রে ফেললেন। কারণ আলাউদ্দিন ১৩০৩-এ চিতোর আক্রমণ করেন এবং তিনি বাদশাহ হন ১২৯৬-এ। সুতরাং মহম্মদ আলির পক্ষে 'দশ বছর' আগে বাদশাহর ভাইঝিকে নিয়ে পালাবার সুযোগ কোথায়?

এই ভৈরবাচার্যই নাটকে মূল দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন। রাজপুত জাতির আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ইতিহাসে সুবিদিত। তাদের ধর্মীয় কুসংস্কারের সুযোগ গ্রহণ ক'রে ভৈরবাচার্য রাজপুতদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। তিনিই রাজা লক্ষ্মণ সিংহের কুলদেবতা চতুর্ভুজা মন্দির থেকে এক কপট আকাশবাণী শোনালেন যে, লক্ষ্মণ সিংহের দ্বাদশ পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত না হ'লে এবং 'সরোজ-কুসুম সম' তাঁর পরিবারের কোনও রমণীকে দেবীর সম্মুখে বলি না দিলে আলাউদ্দিনের আক্রমণ থেকে চিতোর রক্ষা পাবে না। লক্ষ্মণ সিংহ এই কপট দৈববাণী এবং ভৈরবাচার্যের ব্যাখ্যা শুনে তা বিশ্বাস করলেন। সন্তান

বাৎসল্য এবং রাজকর্তব্য বা স্বদেশপ্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো। সেনাপতি রণধীর তাকে রাজকর্তব্য পালনে অর্থাৎ সন্তানকে বলি দিয়ে দেশ রক্ষার জন্যে লক্ষ্মণ সিংহকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। এদিকে সরোজিনীর প্রণয়ী বিজয় সিংহ [যার সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছিল] এ ব্যাপারে ঘোর আপত্তি তুললেন। লক্ষ্মণ সিংহের মহিষী বিজয় সিংহের সহায়তায় সরোজিনীকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। সরোজিনী যখন জানতে পারলো যে, এই ব্যাপার নিয়ে তার পিতার সঙ্গে বিজয় সিংহের বিবাদ বেধেছে তখন সে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেই দেবী চতুর্ভুজার কাছে আত্মবিসর্জনে আগ্রহ প্রকাশ করলো। বলির আয়োজন সম্পূর্ণ—সেই মুহূর্তে বিজয় সিংহ সরোজিনীকে উদ্ধার করলেন। এই ব্যাপার নিয়ে রাজপুতদের মধ্যে যে আত্মকলহের সৃষ্টি হলো। তার সুযোগে আলাউদ্দিন চিতোর দখল করলেন। যুদ্ধে লক্ষ্মণ সিংহ এবং তাঁর দ্বাদশ পুত্র প্রাণ বিসর্জন দিলেন। বিজয় সিংহও নিহত হলেন। আলাউদ্দিন পদ্মিনী ভ্রমে সরোজিনীকে ধরবার উদ্যোগ করলেন, কিন্তু অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সরোজিনী সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। পদ্মিনী সহ আরও বহু রাজপুত নারী ইতিপূর্বেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

এই নাটকের আর একটি ঘটনা রীতিমত চাঞ্চল্যকর। যে ভৈরবাচার্যের ষড়যন্ত্রে লক্ষ্মণ সিংহ তাঁর কন্যা সরোজিনীকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেই ষড়যন্ত্র শুধু ব্যর্থই হলো না, তিনি নিজে তাঁর নিরপরাধ কন্যা রোশেনারাকে হত্যা ক'রে বসলেন। এই হত্যাকাণ্ডের সংগে সংগে বিজয় সিংহের প্রেমপ্রার্থী রোশেনারা এবং ভৈরবাচার্যের পরিচয় উদ্ঘাটিত হলো। নাটক এইখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নাট্যকার তা করেন নি ; কারণ দেশ-প্রেমের জন্য আত্মত্যাগে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা তাঁর মূল লক্ষ্য—সেই জন্যে এক বিস্তৃত দৃশ্যে চিতোরের চিতা সাজিয়েছেন।

দেশের জন্যে সন্তান বলিদান—এই বিষয়টি নিয়ে মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচিত। এই 'কৃষ্ণকুমারী'তে যে গ্রীক নাটকের ছায়া আছে, **Euripides** রচিত সেই ***Iphigeneia én Aulis*** নাটকের দ্বারা সরোজিনী অনেক বেশী প্রভাবিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের লক্ষ্মণ সিংহ, রণধীর এবং বিজয় সিংহের সংগে ইউরিপিডিসের নাটকের যথাক্রমে অ্যাগামেমনন, মেনেলাউস এবং অ্যাকিলিস-এর সাদৃশ্য রয়েছে। অ্যাগামেমনন যেমন বিবাহের

নাম ক'রে ইফিগেনেইয়াকে আউলিস-এ ডেকে পাঠিয়েছেন, লক্ষ্মণ সিংহও তেমনি সরোজিনীকে বিবাহের নাম ক'রেই দেবগ্রামে ডেকে পাঠিয়েছেন। দু'জনের উদ্দেশ্য কন্যাকে উৎসর্গ করা। অ্যাগামেমনন যেমন ইফিগেনেইয়াকে আসবার জন্যে প্রথম চিঠি দেবার পর মত পরিবর্তন ক'রেছেন এবং আসতে নিষেধ করে দ্বিতীয় পত্র পাঠিয়েছেন, লক্ষ্মণ সিংহও তেমনি ক'রেছেন। ইফিগেনেইয়ার সংগে এসেছিলেন তার মা, ঠিক তেমনি সরোজিনীর সংগে এসেছেন রাজমহিষী। অ্যাকিলিসের মত বিজয় সিংহও সরোজিনীকে রক্ষায় উদ্যত হয়েছেন এবং ইফিগেনেইয়ার মতই সরোজিনীও শেষ পর্যন্ত দেশের৷ জন্যেই আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

কিন্তু কৃষ্ণকুমারীকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, সরোজিনীকে হয়নি। এখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রীক নাটকটিকে অনুসরণ করেছেন কিন্তু অন্যভাবে : ইফিগেনেইয়াকে হত্যার জন্য পুরোহিত যখন ছুরি তুলে নিলেন তখন অলৌকিক উপায়ে সেখানে এলো এক চাগল ছানা [a kid]। কিন্তু সরোজিনী নাটকে পুরোহিতের ছুরির মুখে পড়লো রোশেনারা ; এই রোশেনারা আবার তাঁরই নিরুদ্দিষ্টা কন্যা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রীক ট্র্যাজেডীর অনুকরণ করতে গিয়ে এই ভাবে মেলোড্রামা সৃষ্টি করে ফেললেন। এখানে উল্লেখ্য যে বিখ্যাত সমালোচক **H. D. F. Kitto** *Iphigenia én Aulis* নাটককে ইউরিপিডেস-এর মেলো-ড্রামাগুলির মধ্যেই স্থান দিয়ে বলেছেন : **"The play is second rate because the whole idea was second rate.** [*Greek Tragedy*, **London. 1961. p 362**]।

মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী'র সংগে তুলনা করলেও দেখা যাবে কৃষ্ণকুমারী ও সরোজিনী দুজনেই বংশের সম্মান ও দেশের স্বাধীনতার জন্যেই আত্মবলিদানের জন্যে এগিয়ে এসেছে, দু'জনের কাছেই ব্যক্তি প্রেমের চেয়ে দেশপ্রেম বড় হয়ে উঠেছে। তবে ভীমসিংহের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুরণের সুযোগ ছিল, মাইকেল সে সুযোগ গ্রহণ করেননি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লক্ষ্মণ সিংহের ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইউরিপিডিসের অ্যাগামেমনন চরিত্রের মতই লক্ষ্মণ সিংহ দৃঢ় চরিত্রের লোক নন। তিনি দৃঢ় চরিত্রের লোক হ'লে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব অনেক তীব্র হ'তে পারতো।

সরোজিনী হচ্ছে প্রথম নাটক যেখানে হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপিত

হলো। নাটকের মূল দ্বন্দ্ব অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নয়—মূল দ্বন্দ্ব উদ্বেলিত হয়েছে রাজার হৃদয়ে। তবুও মুসলমানদের সম্বন্ধে এমন মন্তব্য আছে যেটা বাঞ্ছনীয় ছিল না। মন্তব্যটি এই :

সরোজিনী॥ মা চতুর্ভুজা। যাদের জন্য পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, সেই দুষ্ট মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত কর।

লক্ষ্মণ॥ বৎসে। মুসলমানদের নিপাত সহজে হবার নয়। তার পূর্বে অনেক অশ্রুপাত করতে হবে। [২।২]

এ সব সত্ত্বেও ট্র্যাজেডীর বৈশিষ্ট্য অনেকখানি রক্ষিত হয়েছে সরোজিনী নাটকে। বাইরের দ্বন্দ্ব [রাজপুত-পাঠান যুদ্ধ] এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব এক সঙ্গে চলেছে। নাটকীয় জটিলতাও সৃষ্টি করেছেন ভৈরবাচার্য এবং পঞ্চম অঙ্কের শেষে এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়েছেন। তবুও সার্থক ট্র্যাজেডী এটি হয়নি বলেও মন্তব্য করা যায় যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে এটি সার্থক রচনা।

॥ অশ্রুমতী ॥ সুলতানি আমলের ঘটনা নিয়ে 'সরোজিনী' নাটক রচনার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মোগল আমলের ঘটনা অবলম্বনে 'অশ্রুমতী' নাটক রচনা করেন [১৮৭৯]। দেশাত্মবোধে, বিশেষভাবে রাণা প্রতাপের অতুলনীয় দেশপ্রেমের কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এ নাটকটি তিনি রচনা করেছিলেন। টড-এর 'রাজস্থান' থেকে তিনি কাহিনী আহরণ করেছেন এবং নাটকীয় নামাঙ্কের নীচে রাজস্থান থেকে উদ্ধৃতিও দেওয়া হয়েছে।[১৮] রাণা প্রতাপের গৌরবময় কাহিনী দিয়েই নাটক শুরু হয়েছে, কিন্তু প্রথম অঙ্ক শেষ হতে না হতেই এক সম্পূর্ণ কল্পিত রোমান্টিক কাহিনী এর সংগে যুক্ত হয়েছে, সুদীর্ঘ নাটকের প্রবাহ চলেছে সেই কাহিনীর ধারা বহন ক'রে। আপন গৌরব রক্ষা ক'রে প্রতাপের মৃত্যু ঘটেছে বটে, কিন্তু নাটকের শেষে দেশাত্মবোধের আবেদন ফুটে ওঠেনি—বরং ব্যর্থপ্রেমের বেদনার মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এই প্রেম-কাহিনীর মূল চরিত্র অশ্রুমতী। মোগলেরা যেদিন প্রথম চিতোর আক্রমণ করে, নাট্যকারের কল্পনায় সেই দিন প্রতাপ সিংহের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে—কন্যার নাম রাখা হয় অশ্রুমতী। শৈশব অবস্থা থেকেই এই কন্যা ভীল সর্দারের পরিবারে মানুষ হয়েছে। তারপর যৌবনে সে যখন প্রতাপ সিংহের কাছে ফিরে এল তখন রাজ্যহারা প্রতাপ পরিবারসহ অরণ্য ও পর্বতে বিচরণ করছেন। মোগলের সহযোগী বলে মানসিংহকে প্রতাপ

অপমান করেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্তে মানসিংহ অশ্রুমতীকে অপহরণ করে মোগলদের হাতে সমর্পণ করার ষড়যন্ত্র করেন। মোগল সৈনিকেরা অশ্রুমতীকে অপহরণ করে। যুবরাজ সেলিম এই সময় ছিলেন চিতোর আক্রমণকারী মোগল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। সেলিম ও অশ্রুমতী পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেন এবং অশ্রুমতী সেলিমকে বিবাহ করতে সম্মত হন। যে প্রতাপ সর্বস্ব পণ করে মোগলের সংগে লড়াই করছিলেন তাঁর কন্যা মোগল যুবরাজকে বিবাহ করবেন—প্রতাপের ভ্রাতা শক্ত সিংহ এটা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি আকবরের সভাকবি পৃথ্বীরাজের সংগে অশ্রুমতীর বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে সেলিমের মনে এক মিথ্যা সন্দেহের সৃষ্টি হল যে, অশ্রুমতী বিশ্বাসঘাতিনী। এই সন্দেহের বশবর্তী হ'য়ে সেলিম পৃথ্বীরাজকে হত্যা করলেন এবং ছুরির আঘাতে অশ্রুমতীকে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে চলে গেলেন। শক্ত সিংহ যখন অশ্রুমতীকে প্রতাপের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন তখন প্রতাপ মৃত্যুশয্যায়। তিনি কন্যাকে বিষপানে মৃত্যুবরণের আদেশ দিলেন। তারপর যখন শক্ত সিংহের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, অশ্রুমতী নিষ্কলঙ্ক তখন তাঁকে যোগিনী-ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করে আজীবন কুমারী অবস্থায় থাকবার আদেশ দিলেন। প্রতাপের মৃত্যু ঘটলো।

'অশ্রুমতী' নাটক হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় অনূদিত হওয়ায় এর ব্যাপক প্রচার হয় এবং এই ব্যাপক প্রচারের ফলে বাঙালী ও অবাঙালী পাঠক এবং দর্শকরা সমালোচনায় মুখর হ'য়ে ওঠেন। রাণা প্রতাপসিংহের কন্যা অশ্রুমতী সেলিমের অনুরাগী হয়ে তাঁকে বিবাহে পর্যন্ত রাজী হবেন—হিন্দু সমাজ এতটা সহ্য করতে পারেন নি। বিশেষভাবে যে রাণা প্রতাপ রাজ্যহারা হয়ে অরণ্যে পর্বতে বিচরণ করেছেন তবুও মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেননি, তাঁর কন্যার ঐরূপ মতিগতি বরদাস্ত করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় নি।

বড়বাজার লাইব্রেরীর অবৈতনিক সম্পাদক পণ্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্র এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন: "...Considering the great regard which the Rajputs have for their religion and the spirit of exemplary independence possessed by the great Maharana Pratap Singh, the story of his alleged daughter, Ashrumati's

love for the Mohomedan Prince Salim, based upon pure imagination, is a slur cast on the sacred memory of the Maharana, who has been highly revered by the Hindu Society.
[জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯০১]

'অশ্রুমতী'র হিন্দী অনুবাদের প্রকাশক বারাণসীর রামকৃষ্ণ বর্মা ২৯শে অক্টোবর [১৯০১] তারিখের পত্রে লেখেন : "...আপনার রচিত 'অশ্রুমতী' নাটক আমি নিজ খরচে ছাপাইয়াছিলাম, কিন্তু কতিপয় পত্র উহার কুৎসা রটাইয়া আমাকে বাধিত করিল যে ভবিষ্যতে যেন আর বিক্রয় না করি। তন্নিমিত্ত আমাকে প্রতুল অর্থহানি সহ্য করিতে হইয়াছে।"

সে যুগের খ্যাতনামা সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০শে নভেম্বর [১৯০৩] তারিখের এক পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে জানান : "...ব্যাপার এই যে 'রাজস্থান সমাচার' নামক হিন্দী কাগজে এবং সেই সংগে 'বেঙ্কটেশ্বর সমাচার' প্রভৃতি অন্য সকল হিন্দী কাগজে আপনার 'অশ্রুমতী'র কথা ধরিয়া বাঙালী জাতির বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন চলিতেছে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অশ্রুমতীর অনুবাদ হইয়া উহার অভিনয়ও চলিতেছে। এই অভিনয় কারণ লোকের মনে অনায়াসেই বাঙালী-বিদ্বেষ যেন দৃঢ়ীভূত হইতেছে।"

লক্ষ্য করার বিষয় নাটকটি রচনার কুড়ি বৎসর পরে অশ্রুমতী চরিত্রটি নিয়ে বিরূপ সমালোচনা ব্যাপক ভাবে চলতে থাকে। এই সমালোচনার মূলে প্রধানত যে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই কাজ করেছিল—তা সমালোচনা পড়লেই বুঝতে পারা যায়। এর কারণ সুস্পষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জাতীয়তাবাদের নামে যা চলছিল তা হচ্ছে স্বজাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিক্ততা বেশ ভালভাবেই এই সময় সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় রাণা প্রতাপসিংহের কন্যাকে মোগল যুবরাজের প্রেমিকা হিসাবে দেখতে হিন্দুরা প্রস্তুত ছিলেন না।

এই হিন্দু মানসিকতা উদ্ভূত বিরূপ সমালোচনার জবাব কিন্তু নাটকের মধ্যেই রয়েছে : "...আমি রাজপুতও জানিনে, মুসলমানও জানিনে—আমার হৃদয় যাকে চায় আমি তাকেই জানি।" [অশ্রুমতীর উক্তি—৪।৮] বিশুদ্ধ শৈল্পিক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলে অশ্রুমতীর প্রেমের মধ্যে জাতি খুঁজবার প্রয়োজন হতো না। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'র 'অশ্রুমতী' নাটক বর্ণনের যে বিস্তৃত

বিবরণ রয়েছে [পৃঃ ৮০-৮৩], সেখানে নাটক দর্শনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য ক'রবার মত : "...অশ্রুমতীর অগ্নি প্রবেশ; সেলিমকে বিদায় দিচ্ছে : 'প্রেমের কথা আর বোলো না / আর বোলো না,......' হু হু ক'রে আমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। অশ্রুমতীর এই গানে সব মাত ক'রে দিলে।..." অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী মনে যদি জাতির কথা উদয় হতো তবে তিনি নাটকটি দেখে কাঁদতেন না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে সমর্থন করেছেন : "যদি কেহ বলেন, প্রতাপসিংহের দুহিতা একজন মুসলমানকে ভালবাসিবে—দেখুন কিরূপ অবস্থায় অশ্রুমতী মানুষ হইয়াছিল—সে জানিত না রাজপুত কে, মুসলমান কে। যে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল তাকেই সে ভালবাসিবে তাহাতে আশ্চর্য কি?" [কেশবপ্রসাদ মিশ্রকে লিখিত পত্রের অংশ]। ১৯২০-এ প্রকাশিত 'অশ্রুমতী'র অষ্টম সংস্করণের ভূমিকায় নাট্যকার-এর 'কৈফিয়ৎ'-এ লেখা হয়েছিল : "যিনি অশ্রুমতী নাটক ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন, যাহাতে রাণা প্রতাপসিংহের শুভ্র যশ কলঙ্কিত না হয়, যাহাতে অশ্রুমতীর বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কের স্পর্শ মাত্র না থাকে সে বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি ও যত্নবান হইয়াছি।"

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও রাণাপ্রতাপের চরিত্রকে কলঙ্কিত করা হয় নি। বরঞ্চ তাঁর অতুলনীয় দেশপ্রেমের কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

"...যতদিন না চিতোরের অস্তমান গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে পারি—ততদিন আমরা ও আমাদের উত্তরাধিকারিগণ একটিও বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার ক'রব না—রজত ও কাঞ্চন পাত্র-সকল দূরে নিক্ষেপ ক'রে তার পরিবর্তে বৃক্ষ-পত্র ব্যবহার ক'রব—আমাদের শ্মশ্রুতে আর ক্ষুর স্পর্শ ক'রব না—আর শুষ্ক তৃণশয্যায় আমরা শয়ন ক'রব।" [১।২]

কমলমেরু গিরি-দুর্গস্থ প্রাসাদশালায় মন্ত্রীর সম্মুখে প্রতাপ সিংহ এই দুর্জয় সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। তারপর থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি পর্বতে, অরণ্যে ঘুরেছেন। কমলমেরু, ধর্মমতী, গগুডা প্রভৃতি মেবারের প্রধান প্রধান স্থান শত্রুর হস্তগত হয়েছে, রাজকোষ হয়েছে শূন্য—প্রতাপ 'বন্য পশুর ন্যায় তাড়িত হয়ে পর্বতের গুহায়' বেড়িয়েছেন, বস্ত্রাভাবে শীতের ক্লেশ অসহনীয় হয়ে উঠেছে, মুখের গ্রাস বন-বেড়ালে লুটে নিয়ে গেছে, তবুও প্রতাপ মাথা

নত করেননি। চৌদ্দ বছর প্রতিকূল অবস্থার সংগে সংগ্রাম করার পরও তিনি বলেছেন: "আমার প্রতি অদৃষ্টের যতই অত্যাচার হোক-না, আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় দুঃখের মূল বিস্তৃত হোক-না কেন—তবু আমার উন্নত মস্তক মুসলমানদের নিকট কখনোই নত হবে না।" [৩।১]

সন্ধির প্রস্তাবকে পর্যন্ত রাণাপ্রতাপ প্রত্যাখ্যান করেছেন। শত্রুর কৃপার চেয়ে বরং ঘৃণাই তাঁর কাম্য। রণক্ষেত্রেই শুধু তিনি শত্রুর মোকাবিলা করতে রাজী। শেষ পর্যন্ত উদয়পুর পেষলা নদীর তীরস্থ কুটীরে পালঙ্কের উপর খড়ের শয্যায় শুয়ে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেছেন তখনও মন্ত্রীকে তিনি বলছেন: "আমার দেশ তুর্কের হস্তে কখনোই সমর্পিত হবে না—এই আশ্বাসবাক্য তোমাদের মুখে শোনবার জন্যই আমার অন্তরাত্মা দেহ হতে এখনো বেরোতে বিলম্ব হচ্ছে।" অপহৃতা কন্যা অশ্রুমতী ফিরে এসেছে, কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শয়ন ক'রেও প্রতাপ মোগলের সংগে তার সংস্রবের জন্যে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

অশ্রুমতীর মর্যাদাও নাট্যকার আগাগোড়া রক্ষা ক'রেছেন। অশ্রুমতীর প্রেমে কোনও খাদ ছিল না। তাই প্রতাপসিংহের সম্মুখেও সে অকপটে সেই প্রেমের কথা স্বীকার করেছে। আবার পিতৃদত্ত শাস্তিও সে মেনে নিতে দ্বিধা-বোধ করেনি। হিন্দু মানসিকতার কথা মনে রেখেই নাট্যকার শেষ পর্যন্ত অশ্রুমতী নিষ্কলঙ্ক হওয়া সত্ত্বেও তাকে যোগিনী-ব্রতে দীক্ষিত করেছেন। তবুও সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাননি। নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে দেশাত্ম-বোধের ভিয়েনে একখানি রোমাণ্টিক নাটকই রচনা করেছেন এবং এই নাটকের আলোচনা সে-দিক থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এই ন টকের প্রধান চরিত্র অশ্রুমতী কল্পনাজাত হওয়ায় এবং তার প্রেম-কাহিনী এই নাটকে প্রধান হয়ে ওঠায় নাটকটি ঐতিহাসিক মর্যাদা হারিয়েছে। নাটকে ঐতিহাসিক কাহিনীর সংগে কাল্পনিক কাহিনী সুন্দরভাবে মিশে যায়নি। অশ্রুমতীর অপহরণ প্রতাপ ভবিতব্য বলেই মেনে নিয়েছেন। অশ্রুমতি-সেলিমের প্রেম কাহিনীর সংগে মলিনা-পৃথ্বীরাজের প্রেম কাহিনী জুড়ে দেওয়ায় নাটকের দৈর্ঘ্য বেড়েছে মাত্র।

এই নাটকে দেশপ্রেম ও ব্যক্তিপ্রেম সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত। 'পুরুবিক্রম' নাটকে ঐলবিলার ব্যক্তিপ্রেম দেশপ্রেমের সংগে মিশে গেছে।

এখানে অশ্রুমতীর মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। অথচ প্রতাপসিংহের কন্যা হিসেবে তার মধ্যে ব্যক্তিপ্রেম ও দেশপ্রেমের দ্বন্দ্ব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা যেতো। এই দ্বন্দ্ব তো নেই-ই উপরন্তু একটি যুবতী মেয়ে সংসার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিতৃশত্রুর বন্দিনীরূপে বাস করলে তার মনে যে স্বাভাবিক বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়—অশ্রুমতীর মধ্যে তারও অভাব।

সেলিম চরিত্রে অবশ্য দ্বন্দ্ব আছে এবং সেটা বিশ্বাস ও ঈর্ষার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের সংগে শেকস্‌পীয়রের ওথেলোর দ্বন্দ্বের মিল লক্ষ্য করা যেতে পারে। 'ওথেলো' নাটকের ডেসডেমোনার মত অশ্রুমতীও বিজাতীয় পুরুষকে হৃদয় দান করেছে। সারল্যের দিক থেকে এই দুটি চরিত্রে বেশ মিল। তা ছাড়া প্রেমাস্পদের কাছ থেকে চরম আঘাত পেয়েও কেউ তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনেনি। ওথেলোর মতই সেলিমও শেষে অনুতাপের তীব্র অনলে দগ্ধ হয়েছে। 'ওথেলো' নাটকের ইয়াগো চরিত্রের অনুরূপ ক'রে আঁকা হয়েছে ফরিদ চরিত্র। সেলিমের মনে সন্দেহ জাগিয়েছে এই ফরিদ। সন্দেহকে তীব্রতর করবার জন্যে ইয়াগো ব্যবহার করেছিল একটি ছোট্ট রুমাল, ফরিদ ব্যবহার করেছে একখানি পত্র। তবে ইয়াগো সম্পর্কে Coleridge-এর উক্তি 'Motive-hunting of a motiveless malignity'—এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও ফরিদ সম্পর্কে কিন্তু তা মেনে নেওয়া চলে না। অশ্রুমতীকে অপহরণ ক'রে আনবার পর মানসিংহ ফরিদের সংগে তার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ফরিদ এই 'পুরস্কার' মাথায় তুলে নেয় নেয়। তারপর যখন সে দেখলো 'পুরস্কার' অপরে হস্তগত করে নিচ্ছে তখন সে হস্তগতকারীর মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে পুরস্কারটি পুনর্দখলের ষড়যন্ত্র করলো। এই উদ্দেশ্যের কথা ফরিদ গোপন করেনি : "আমি অশ্রুমতীকে হস্তগত করবার জন্য যে রকম জাল পেতেছি—মানসিংহকে তা তো সব লিখেছি।" [৪।১৪]

যা হোক, এই ফরিদের ষড়যন্ত্র জালের মধ্যে সেলিম-অশ্রুমতীর কাহিনী নিয়ে একখানি স্বতন্ত্র নাটক হতে পারতো। কিন্তু নাট্যকারের সে ইচ্ছা ছিল না। তিনি প্রতাপসিংহের দেশপ্রেম থেকেই এই নাটকের অনুপ্রেরণা লাভ করেন। নাটকের দ্বন্দ্বও সুরু হয়েছিল প্রতাপ সিংহ দ্বারা মোগলের সহযোগী মানসিংহের অপমান-এর ঘটনা দিয়ে এবং নাটক শেষ হয়েছে প্রতাপের মৃত্যুতে। অশ্রুমতীর অপহরণের ঘটনা ঐতিহাসিক না হলেও নাটকে

এটা স্থান পেতে পারে। কারণ অপমানিত মানসিংহ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্তে প্রতাপের কন্তাকে অপহরণ করে 'একজন সামান্ত মুসলমানের হস্তে দিয়ে রাণার উন্নত মস্তক অবনত' করার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু নাটকের মূল দ্বন্দ্ব সেক্ষেত্রেও প্রতাপ এবং মোগলের দ্বন্দ্ব রূপেই প্রবাহিত হতে হবে। কিন্তু হঠাৎ সেলিম-অশ্রুমতীর প্রেম কাহিনীর বিস্তার ক'রে ঐতিহাসিক ঔৎসুক্যকে রোমান্সের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাণাপ্রতাপের বক্তৃতা মাঝে মাঝে আছে, কিন্তু সক্রিয়ভাবে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে তিনি যেন অসমর্থ। বাইরের দ্বন্দ্বের সংগে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে তাঁকে সার্থক ট্র্যাজেডীর নায়ক ক'রে তোলেনি। নাট্যকার যেন টডের রাজস্থানের কাহিনীকেই হুবহু তুলে ধরেছেন।

॥ **স্বপ্নময়ী** ॥ মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস অবলম্বন ক'রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপ্নময়ী'নাটক [১৮৮২] রচনা করেন। এই নাটকের কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে এবং তা হচ্ছে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জমিদার শুভসিংহের [বা শোভাসিংহের] বিদ্রোহ। এই নাটকের কাহিনীর মধ্যে বর্ধমানের ভূপতি কৃষ্ণরাম রায় শুভসিংহ, এবং আফগান সদার রহিম খাঁ প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্র আছে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস নেই—ঐতিহাসিক কাহিনীকে নাট্যকার তাঁর ইচ্ছামত সাজিয়েছেন। তার ফলে শুধু স্বপ্নময়ী চরিত্রই সৃষ্টি হয়নি—গোটা নাট্য-কাহিনীই রোমান্টিক হ'য়ে উঠেছে। ইতিহাস থেকে[১৯] শোভাসিংহের বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা যা জানতে পারি তা হচ্ছে এই: শায়েস্তা খানের পর ঔরঙ্গজেবের ধাত্রীপুত্র খান-ই-জহান বাহাদুর বাংলার সুবাদার হন। এক বছর পরেই এই অপদার্থ সুবাদার পদচ্যুত হন এবং তাঁর স্থান অধিকার করেন ইব্রাহিম খান। এঁর শাসনকালে অর্থাৎ ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটালের চন্দ্রকোণা বিভাগের একজন সাধারণ জমিদার শোভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটে। রাজা কৃষ্ণরাম নামে পঞ্জাবের জনৈক অধিবাসী বর্ধমান জেলার রাজস্ব আদায়ের ইজারা নিয়েছিলেন। শোভাসিংহ চারদিকে লুঠতরাজ আরম্ভ করেন। তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে রাজা কৃষ্ণরাম নিহত হন [জানুয়ারী, ১৬৯৬]। শোভাসিংহ বর্ধমান সহর দখল করেন। কৃষ্ণরামের সমস্ত সম্পদ সহ তাঁর স্ত্রী ও কন্তাকে শোভাসিংহ আটক করেন। এইভাবে অর্থ সংগ্রহ ক'রে শোভাসিংহ তাঁর অনুচরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং রাজা উপাধি ধারণ করেন। ওড়িশার পাঠান সর্দার তাঁর সংগে যোগদান করেন।

গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে হুগলীর উত্তর ও দক্ষিণে ১৮০ মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড শোভাসিংহের হস্তগত হয়। সুবাদার ইব্রাহিম খান এই বিদ্রোহের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ না ক'রে পশ্চিম বাংলার ফৌজদারকে এই বিদ্রোহ দমন করার আদেশ দেন। এই ফৌজদার প্রথমে হুগলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরে পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা করেন। শোভাসিংহ হুগলীতে প্রবেশ করে শহর লুঠ করেন। এই সময় ওলন্দাজ বণিকেরা একদল সৈন্য পাঠালে শোভাসিংহ বর্ধমান যান। বর্ধমানে রাজা কৃষ্ণরামের কন্যার ওপর বলাৎকার করতে উদ্যত হ'লে এই বীর নারী প্রথমে ছুরিকাঘাতে শোভা সিংহকে হত্যা করেন এবং পরে নিজে আত্মহত্যা করেন। শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হিম্মৎসিংহ দলপতি হন, কিন্তু শোভাসিংহের অনুচরেরা রহিম খাঁকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে। রহিম খাঁ রহিম শাহ নাম ধারণ ক'রে রাজা হ'য়ে বসেন। তিনি লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে যান। ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুস্সান-এর সেনাবাহিনীর হস্তে তিনিও নিহত হন—১৬৯৮-এর আগষ্ট মাসে।

ইতিহাসের এই কাহিনীকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নতুনভাবে উপস্থিত করেছেন: ঔরঙ্গজেব [আরংজীব] তথা মুসলমান রাজশক্তি হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার চালাচ্ছেন। এই 'অত্যাচারের কথা জলন্ত ভাষায়' জনসাধারণের কাছে বর্ণনা করেও শুভসিংহ তাদের উত্তেজিত করতে পারেন নি। তাই অনুচর সুরজমলের পরামর্শে তিনি দেবতার ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে দেবতারূপে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার পথ ধরলেন। রাজা কৃষ্ণরাম ঔরঙ্গজেবের অনুগত, তাই তার বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করে রাজপ্রাসাদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করার প্রচেষ্টা হল। এই উদ্দেশ্যে রাজদুহিতা স্বপ্নময়ীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ক'রে তার সহায়তা লাভের ব্যবস্থা হলো। রহিম খাঁর সহযোগিতাও পাওয়া গেল। রহিমের স্ত্রী জেহেনা কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায়ের সংগে প্রেমের অভিনয় ক'রে তাকে বিলাসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলো। শেষ পর্যন্ত জগৎ সিংহের উদ্যানবাটীতে রহিমের মৃত্যু ঘটলো, শুভসিংহ কর্তৃক রাজপ্রাসাদ আক্রমণের সময় রাজা কৃষ্ণরামের মৃত্যু ঘটলো, আত্মগ্লানিতে শুভসিংহ আত্মহত্যা করলেন, স্বপ্নময়ী উন্মাদিনী হলেন।

দেখা যাচ্ছে কি কাহিনী, কি চরিত্র-চিত্রণ কোনওটাই ইতিহাস সম্মত হয় নি। কৃষ্ণরামের কন্যার নাম 'স্বপ্নময়ী' হতে পারে, কিন্তু তিনি যে

স্বপ্নচারিণী ছিলেন না—ইতিহাসেই তার স্বাক্ষর আছে। যে মহিয়সী নারী নারীর সম্মান রক্ষার জন্যে শুভসিংহকে হত্যা ক'রে নিজে আত্মহত্যা ক'রেছিলেন, তাঁকে বাতিকগ্রস্ত এবং শুভসিংহের অনুরাগিণী ক'রে তুলে শেষে তাঁকে নাট্যকার উন্মাদের জগতে নির্বাসিত ক'রেছেন। রহিম খাঁর মত চরিত্রকে 'জগৎ রায়ের মোসাহেব' ক'রে তার মধ্যে কৌতুকরস সৃষ্টির চেষ্টাও সমর্থন করা যায় না।

মূল চরিত্র শুভসিংহকে চিত্রিত করা হয়েছে ইতালীয় দার্শনিক Machia-Velli-এর আদর্শ অনুসারে ; অর্থাৎ লক্ষ্য মহৎ হোক বা নীচ হোক, যে কোনও উপায়ই সমর্থনীয় ['end justifies the means']। শুভসিংহকে এই আদর্শে যে অনুপ্রাণিত ক'রেছে সেই সুরজমলের উক্তি : "প্রতারণাটা যে বড়ো ভাল কাজ তা আমি বলছি নে—কিন্তু এ ভিন্ন যখন আর কোনো উপায় নেই, তখন কি করবেন বলুন—মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কখনো কখনো হীন উপায়ও অবলম্বন করতে হয়—তা না ক'রলে চলে কই?" [১৷১] অন্যদিকে শুভসিংহের বক্তব্য : …"আমি প্রতারণা করবো? চিরজীবন যা আমি ঘৃণা ক'রে এসেছি, যা আমার দুই চক্ষের বিষ, যার একটু গন্ধও আমার সহ্য হয় না সেই জঘন্য প্রতারণাকে কিনা আমি এখন আমার অঙ্গের ভূষণ ক'রবো…? আমি দেশের জন্যে মাতৃভূমির জন্যে, ধর্মের জন্যে—আর সকল ক্লেশ যন্ত্রণাকেই আলিঙ্গন করছি, কিন্তু-কিন্তু-দেবতার ভাণ ক'রে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা—ছদ্মবেশ ক'রে লোকদের প্রতারণা করা—ওঃ, কি জঘন্য—কি জঘন্য—।" [১৷১]

এই দ্বন্দ্ব দিয়েই নাটক সুরু। শুভসিংহ সুরজমলের আদর্শ গ্রহণ দেবতার ছদ্মবেশে জনগণকে উত্তেজিত করেছেন। রাজকন্যা স্বপ্নময়ীর অন্তরেও একই কৌশলে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেছেন শুভসিংহ :

শুভসিংহ [স্বপ্নময়ীকে]।

"কে তোর পিতার পিতা মাতার জননী?
কোথা হতে পিতা তব পেয়েছেন জ্ঞান?
কোথা হতে মাতা তব পেয়েছেন স্নেহ?
কে তিনি তোমার মাতা জান স্বপ্নময়ি?

স্বপ্নময়ী। না প্রভু, জানি নে।

শুভ। তিনি তোর জন্মভূমি।

স্বপ্ন। আমাদের জন্মভূমি? তিনিই জননী?

শুভ। হাঁ তব জননী সেই তোর জন্মভূমি।

... ...

বিদেশী মোগল যত দলে দলে আসি
দেখ্ চেয়ে দেখ্ তার করে অপমান,
দেখ্ তোর মায়েরে করিছে পদাঘাত।" [৩।২]

এই দেশ মাতৃকার যারা অপমান করছে, তাদের যে সহযোগী সে শত্রু এমন কি পিতা হলেও। শুভসিংহ তাই ব'লছেন:

"মায়েরে যে বিদেশীরা করে অপমান
তাদের যে হাসিমুখে করে সমাদর
সে জন তোমার পিতা, শত্রু সে তোমার।"

শুভসিংহের মধ্যে ভারতীয়বোধের পরিচয় রয়েছে:

অযুত ভারতবাসী মোর ভাই বোন
একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতামাতা।

এই জাতীয়তাবোধ উনবিংশ শতাব্দীর।

স্বপ্নময়ীকে অনুপ্রাণিত করার জন্যে শুভসিংহের কণ্ঠে যে কবিতা[২০] প্রথম উদ্গীত হয়েছে, স্বপ্নময়ীর মারফৎ—সেটাই বার বার ধ্বনিত ক'রে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কাহিনী যেভাবে সাজানো হয়েছে তাতে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার অবকাশ ছিল কম। এতে যা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। অত্যাচারী শুধু রাজশক্তি নয়, গোটা মুসলমান সমাজই। স্বপ্নময়ী বলছেন:

.........দেবমন্দির সকল
চূর্ণ চূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে,
বেদমন্ত্র ধর্ম কর্ম করিতেছে লোপ
গোহত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে। [৩।৩]

এটা শুভসিংহের উক্তির হুবহু প্রতিধ্বনি। অন্যত্র সুরজমল বলেছেন: "যেখানে মুসলমান থাকে সেখানকার বাতাসও যেন আমার বিষতুল্য বোধ হয়।" [১।১]

মোগলেরা দেশমাতৃকাকে 'অপমান' করছে, 'পদাঘাত' করছে—এই অমূর্ত অভিযোগের সংগে যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে দেবমন্দির ধ্বংস এবং

রাজপথে গো-হত্যা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিকই বলেছেন: "বিধর্মী ঔরঙ্গজীব হিন্দুদিগকে নানা দিক হইতে উৎপীড়ন করিতেছেন, এইজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে শুভসিংহের বিদ্রোহ। অতএব ধর্ম ইহার লক্ষ্য, দেশ ইহার লক্ষ্য নহে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'হিন্দুমেলা'র ভিতর দিয়া যে দেশাত্মবোধের উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা এই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকখানির মধ্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইবে।"[২১]

শুভসিংহের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত সেই দ্বন্দ্ব। এমন কি শেষ পর্যন্ত নিহত কৃষ্ণরামের জন্যে বিলাপ—নিজ কাজের জন্য অনুতাপ: "হা অদৃষ্ট। আমার জন্য একজন স্ত্রী অনাথা হ'ল—একজন বীর অধঃপাতে গেল— একটি দুহিতা পিতৃহীন হ'ল—আমা অপেক্ষা পাষণ্ড আর কে আছে?" [৫।৪] শুভসিংহের চরিত্র অনুধাবন ক'রলে মনে হয় নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন যে, একজন মানব-প্রেমিক অন্ধ দেশাত্মবোধের প্রেরণায় ভুল পথ অবলম্বন ক'রে করুণ পরিণতি বরণ করলো! দেশপ্রেমের ছকে ফেলতে গিয়ে নাট্যকার তাঁর মানসকন্যা স্বপ্নময়ীকেও রক্তমাংসের নারী ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেন নি। এই নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার চরম স্ফূর্তিলাভ ঘটেছে।

: পৌরাণিক নাটকে দেশাত্মবোধ :

এই যুগের কোনও কোনও নাট্যকার পৌরাণিক নাটকেও দেশাত্মবোধের সঞ্চার করেন। হিন্দুমেলার যুগের একজন প্রখ্যাত নাট্যকার মনোমোহন বসু। পৌরাণিক নাটক লিখেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। যে ১২৭৩ সালের [১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ] চৈত্র সংক্রান্তির দিনে 'হিন্দুমেলা'র প্রথম অনুষ্ঠান হয়, সেই বছরই মনোমোহনের প্রথম নাটক প্রকাশিত হয়। তিনি দেশাত্মবোধক বা ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন নি, কিন্তু 'হিন্দুমেলার' একজন সক্রিয় উদ্যোক্তা হিসাবে সমকালীন দেশ-প্রীতির ভাবাবেগকে পৌরাণিক নাটকেও সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন। অবশ্য পৌরাণিক নাটকের কাহিনীকে তিনি সমকালীন ভাবাবেগের ওপরে দাঁড় করাননি; একটি নাটকে দেশাত্মবোধক গান জুড়ে দিয়ে সমকালীন মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের

শাসনভার বৃটীশ সরকার গ্রহণ করার পর একদিকে তারা যেমন ভারতের মাটিতে কায়েম হ'য়ে বসলো, তেমনি নানা করভারে দেশবাসীকে জর্জরিত করা হ'লো : আয়কর, পথ-কর, লবণ-কর তো বটেই, মাদক দ্রব্যের ওপর কর বসলো। সংগে সংগে মদের দোকান খোলার ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া হলো। পরাধীন দেশের করভার পীড়িত জনগণের দুঃখ মনোমোহনের 'হরিশ্চন্দ্র নাটকে' [১৮৭৫] ফুটে উঠেছে :

দে কর, দে কর রব নিরন্তর	করের দায়ে অঙ্গ জরজর
সিন্ধু-বারি যথা শুষে দিনকর	শোণিত শোষণ করে শত কর,
কর-দানে নর-নিকর কাতর,	রাজা নয় যেন বৈশ্বানর।
আয়-কর শুনে গায় আসে জ্বর	অস্থিভেদী রথ্যা-কর কি দুষ্কর।
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর!	কত আর কব মুনিবর!
মাদকতা-কর-ছলে রাজ্যময়	মদের বিপণি নিত্য বৃদ্ধি হয়;
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়!	হাহাকার রব নিরন্তর।

এই নাটকের আর একটি গানে সে-যুগের পরাধীনতাবোধের এক তথ্যবহ ইতিহাস ধরা পড়েছে। দেশের অতীত গৌরবের সংগে সমকালীন পরাধীন অবস্থার তুলনা ক'রে গানটির সাহায্যে জনচিত্তে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা হয়েছে :

দীনের দিন সবে দীন
ভারত হ'য়ে পরাধীন
অনশনে তনু ক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভূমে,
পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হ'ল ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে
লজ্জা-রাহু-মুখে লীন।
অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল
যাদুকর-জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল
এমনি কৈল দৃষ্টিহীন।

তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সারা শস্ত গ্রাসে যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা-ভুষি শেষে
হায় গো রাজা কি কঠিন।
তাঁতি-কর্মকার, করে হাহাকার ;
সুতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না আর,
হলো কি দেশের দুর্দিন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ
কলের বসন বিনে কিসে রবে লাজ
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ
বাকল টেনা ডোর কপিন্।
সুচ্, সুতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে
দিয়াশলাই-কাটি, তাও আসে পোতে
প্রদীপ জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।

গান দু'টি নাটকের প্রয়োজন না মেটালেও জনচিত্তে সাড়া জাগিয়েছিল নিশ্চয়ই।

এ যুগে অবশ্যই সোজাসুজি বৃটীশ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। তাই গানে বৃটীশ, ইংরেজ, ইংলণ্ড—এ সব শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। প্রথম গানটিতে 'রাজা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় গানটিতে 'তুঙ্গ দ্বীপ' শব্দের দ্বারা গ্রেট-বৃটেন এবং 'পঙ্গপাল' শব্দ দ্বারা যে ইংরেজদের বোঝান হয়েছে—এটা অনুধাবন করতে শ্রোতাদের কষ্ট হয় নি। কারণ, আমাদের দেশীয় অর্থনীতিকে ইংরেজরা কী ভাবে ভেঙ্গে দিয়ে পদে পদে তাদের প্রতি নির্ভরশীল করে তুলেছিল গানটির মধ্যে সেই কথাই বলা হয়েছে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির যে চিত্রটা গানের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে সেটা তো লোকের চোখের সামনেই ছিল।

১। ইতিপূর্বে রাজনারায়ণ বসু 'জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভা' নামে

এক সমিতি স্থাপন করেন। এই সভার কার্যবিবরণী অবলম্বনে ১৮৬১-এ তিনি যে প্রস্তাবনা পত্র প্রকাশ করেন তা থেকেই হিন্দুমেলা ও পরে জাতীয় সভা প্রেরণা লাভ করে।

২। যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

৩। বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', দ্বিতীয় পর্যায়।

৪। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মিলে সব ভারত সন্তান' গানটির শেষাংশ।

৫। *An Advanced History of India*: Majumdar, Roy-Chaudhuri and Dutta,

৬। ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, 'প্রবন্ধ মঞ্জরী', ১৯০৫।

৭। স্ত্রী পুরুষভেদে অপরাধের ন্যূনাধিক্য, 'প্রবন্ধ মঞ্জরী', ১৯০৫।

৮। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি': বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত কলিকাতা [১৯২০], পৃঃ ১৪১।

৯। বড়বাজার লাইব্রেরীর অবৈতনিক সম্পাদক কেশবপ্রসাদ মিশ্রকে লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্রের অংশ।

১০। 'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র, ১২৮১

১১। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস': ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২।

১২। "The Macedonian king had no desire to renounce his new conquests. He wished to incorporate them permanently into his extensive empire. Beyond the river [Hydaspes] he created a system of protected states under vassal kings, among whom the great Paurava [i. e. Puru] and the king of Abhisara were the most eminent."—R.C. Majumdar, H.C. Raychaudhuri and K. Dutta, *An Advanced History of India*: New York

১৩। বেঙ্গল ম্যাগাজিনে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখেছিলেন: "The story is well-told, the descriptions are lively, some of the characters are well-drawn, and the language is simple and idiomatic." বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ [ভাদ্র ১২৮১] লিখেছিলেন: "লেখক

যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়।"

১৪। অমৃতলাল বসু তাঁর 'স্মৃতিকথায়' লিখেছেন: "গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর আমরা একে একে দীনবন্ধু ও মাইকেল মধুসূদনের নাটক প্রহসনগুলি অভিনয় করিয়াছিলাম। তাহার পর অভিনয়যোগ্য উৎকৃষ্ট নাটক আর খুঁজিয়া পাই নাই—বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের তখন এমন দুর্দশা। এই সময়ে পুরুবিক্রমের ন্যায় উৎকৃষ্ট নাটক প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। যদিও তখন স্বত্ব-সংরক্ষণের এত কড়াকড়ি ছিল না, ভদ্রতার খাতিরে আমরা কয়েকজন রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য গ্রন্থকারের অনুমতি ভিক্ষা করিতে গেলাম। তিনি সানন্দে অনুমতি দান করিলেন।"

১৫। সুকুমার সেন: 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,' দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা [১৩৭০], পৃ: ২৯৫।

১৬। Tod: *Annnals and antiquities af Rajasthan*, New Delhi. Edn, p 1971 Vol I. p. 215.

১৭। G. H. Ojha, Dr. K. S. Lal প্রমুখ আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকগণ এই কাহিনীকে সাহিত্য জগতের সৃষ্টি বলে মনে করেন। কারণ, মালেক মুহম্মদ জায়সী তাঁর 'পদ্মাবত' কাব্যে [১৫৪০ খৃ:] এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা এই বই থেকেই কাহিনীটি গ্রহণ করেন। অবশ্য A. L. Srivastava-এর মতে এই কাহিনীর বীজ নিহিত আছে আমীর খসরুর *Khazain-ul-Futuh* [translated by M. Habib, p 48] গ্রন্থে। আমীর খসরু চিতোর অভিযানের সময় আলাউদ্দিনের সংগে ছিলেন। (A. L. Srivastava, "*The Sultanate of Delhi*, Agra [1959], p, 168.)

১৮। "There is not a pass in the Alpine Aravulli that is not sanctified by some deed of Pertap—some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat. Huldighat is the Thermopylae of Mewar; the field of Deweir her Marathon." [New Delhi Edn., 1971, Vol I. p. 278]

১৯। Jadu Nath Sarkar, *History of Bengal* Vol. II Chap.

XX, pp 393-4 এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, কলিকাতা [১৩৭৩] পৃঃ ১৫০ দ্রষ্টব্য।

২০। "রবীন্দ্রনাথের দিল্লীর দরবারের বিরুদ্ধে লিখিত কবিতা অদলবদল করিয়া আশ্রয় পাইল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী নাটকে।" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন,' কলিকাতা [১৯৬৫] পৃঃ ৮৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে সব জায়গায় 'বৃটীশ' শব্দ ছিল সেইসব জায়গায় 'মোগল' শব্দ বসিয়ে দেন।

২১। 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস,' প্রথম খণ্ড, কলিকাতা [১৯৬০] পৃঃ ৩৩৬।



৪০

নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে বাংলা নাটক

১৮৭৬-এ বৃটীশ পার্লামেন্টের একটি আইন অনুসারে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধি দেওয়া হলো। গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট লর্ড লিটন মহাসমারোহে দিল্লীতে দরবার বসিয়ে মহারাণীকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করলেন।

দিল্লীতে যখন দরবার চলছিল ঠিক তখনই দাক্ষিণাত্যে, মধ্যপ্রদেশে ও পঞ্জাবে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হলো—এই দুর্ভিক্ষে মারা গেল ৫০ লক্ষ লোক। এক দিকে প্রচণ্ড শোষণের ফলে উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হতে থাকলো, অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আঘাতে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার অপহৃত হতে থাকলো। লর্ড লিটন ভারতবাসীর মাতৃভাষায় মতামত প্রকাশের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করলেন—তিনি দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব করলেন 'ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'-এর সাহায্যে। এরপর প্রবর্তন করলেন অস্ত্র আইন, যার দ্বারা ভারতবাসীদের পক্ষে সরকারের অনুমতি ছাড়া অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ হলো। এইরূপ স্বাধীনতা হরণেরই একটি প্রচেষ্টা নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন।

১৮৭৬ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে উত্তেজনা কম ছিল না। 'ইলবার্ট বিল' নিয়ে আন্দোলন [১৮৮২], সুরেন্দ্রনাথের জেল [১৮৮৩] এবং ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ, ন্যাশনাল কনফারেন্স [১৮৮৩], জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম [১৮৮৫] প্রভৃতির মধ্যে উত্তেজনা ছিল প্রচুর। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ১৮৭২-৭৬ এই চার বছর বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ জাতীয়তাবাদের জয়ধ্বনিতে যেমন মুখর, ১৮৭৬-১৯০৩ এই বছরগুলি তেমন মুখর নয়। এমন কি রঙ্গমঞ্চের সংখ্যা এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়া সত্ত্বেও সেই অনুপাতে নাটকের উপস্থিতি নেই। এর অন্যতম কারণ ১৮৭৬-এর নাট্যনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কালা কানুন।

এই আইন পাশ হবার আগে থেকে দেশের একদল উন্নাসিক নীতিবাগীশ নাটকের ওপর খড়্গ হস্ত হয়ে উঠেছিলেন। নাটকে কুরুচি স্থান পাচ্ছে,

'অসম্মানিত স্ত্রীলোকেরা' অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করছে—এ সব দেখে অনেকেই বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সাময়িক পত্রিকায় এ সব বিষয় ধিক্কৃত হচ্ছিল। 'ভারত সংস্কারক' [১৬ আগষ্ট, ১৮৭৩] লিখলেন : "এ পর্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোক-দিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্র সন্তানেরা আপনাদিগের মর্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।" কোনও কোনও পত্রিকায় নাট্যশালার দেওয়াল গুঁড়িয়ে দেওয়ার এবং আসবাব পত্র নীলাম করবার দাবী পর্যন্ত জানান হয়েছিল।

Indian Daily News লিখেছিলেন : "Satisfaction will not be fully realised as long as the walls of the pavillion of this infamous Company are not levelled to the ground, its furniture confiscated and sold under the hammar of the State. That this theatre has by the introduction of harlots on the stage become the hotbed of immorality and corruption none can deny." [17th March, 1773]।

নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইনটি পড়লেই [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] দেখা যাবে যে বিদেশী সরকার নাটকের বিরুদ্ধে ঐ ধরণের সমালোচনাকে লুফে নিয়েছিলেন এবং আইনে রাজদ্রোহ, মানহানিকর প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে কুৎসা, অশ্লীলতা প্রভৃতিও যোগ করে দিয়ে আইনটি জারী করেছিলেন।

এই আইনের ফলেই স্বাধীনভাবে নাট্যরচনা ব্যাহত হয়। একদল নাট্যকার ভগবৎ ভক্তিকে আশ্রয় করেন এবং আনন্দ দেবার জন্যে আসে রং তামাসা ; জাতীয় জীবনের বলিষ্ঠ আবেগ চাপা পড়ে যায়।

যে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' 'লীলাবতী' নাটকের [দীনবন্ধু মিত্র বিরচিত] অভিনয়ের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন সেই নাট্যসমাজই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গ্রহণ ক'রে ১৮৭২-এর ৭ই ডিসেম্বর 'নীলদর্পণে'র অভিনয় দিয়ে সাধারণ রংগালয়ের উদ্বোধন করে।[১] সে যুগের বৃটীশ শাসকেরা কিন্তু এই 'নীলদর্পণে'র ঘটনাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। এই নাটকের দ্বিতীয়বার অভিনয়ের [২১শে ডিসেম্বর] আগের দিন বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের মুখপত্র *The Englishman* 'নীলদর্পণের' অভিনয় বন্ধ করার দাবী জানান : 'A

Native paper tells us that the play of Nil Darpan is shortly to be acted at the National Theatre in Jorasanko. Considering that Revd. Mr. Long was sentenced to one month's imprisonment for translating the play, which was pronounced by the High Court a libel on Europeans, it seems strange that Government should allow its representation in Calcutta, unless it has gone through the hands of some competent censor, and the libellous parts been excised.'

২১শে ডিসেম্বর অভিনয়ের সময় নাটকের কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়। একথা নাট্যশালার সেক্রেটারীর লিখিত পত্র [২৩শে ডিসেম্বর ইংলিশ ম্যান-এ প্রকাশিত] থেকেই জানা যায়। এই পত্রে জানান হয় যে, নাটকের মানহানিকর অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। সেক্রেটারী আরও জানান যে, 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য—বাংলা দেশের গ্রাম্য জীবন যাত্রার চিত্র দেখান, ইংরেজদিগকে বিদ্রূপ করা নয়, ইংরেজ চরিত্রের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

'মানহানিকর অংশ বাদ দিয়ে', 'নীলদর্পণ' বাঁচলো। কিন্তু বৃটীশ শাসকেরা বেশীদিন স্বাধীনভাবে নাটকের অভিনয় বরদাস্ত করেন নি ; চার বছরের মধ্যেই তাঁরা নাটকের অবাধগতি রুদ্ধ করলেন।

: নাটকের অবাধ গতি রুদ্ধ :

১৮৭৫-এর ডিসেম্বর মাসে যুবরাজ এডওয়ার্ড [পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড] ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতা সফরে আসেন। সে সময়ে কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যুবরাজকে অভ্যর্থনার জন্যে উৎসাহ দেখা যায় নি। তা ছাড়া যুবরাজকে অভ্যর্থনা দেবার ব্যয় নির্বাহের জন্যে যে ভাবে জোর জবরদস্তি করে টাকা আদায় করা হচ্ছিল তাতে অনেকেই রুষ্ট হয়েছিলেন এবং সংবাদপত্রে এই রোষ প্রকাশ করা হয়েছিল একটি চিঠির মাধ্যমে [Amrita Bazar Patrika, 9. 9. 1875]। অন্যদিকে কলকাতার ভবানীপুরের খ্যাতনামা উকিল এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে নিজ ভবনে শুধু আমন্ত্রণ করেই নিয়ে গেলেন না, কুলমহিলাদের

যারা তাঁকে বরণ করালেন। এই ঘটনায় সারা দেশে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। *Hindoo Patriot*-এর ভাষায় বলতে গেলে 'National feeling has been outraged.' ১৮৭৬-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার জগদানন্দকে বিদ্রূপ করে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে এক প্রহসন মঞ্চস্থ করে। সরকার অর্ডিনান্স জারী ক'রে দ্বিতীয় অভিনয় রাতেই এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করে দেন। উদ্যোক্তারা দমে গেলেন না। তাঁরা 'হনুমান চরিত্র' নাম দিয়ে ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রহসনটি আবার অভিনয় করালেন। রাজভক্ত প্রজাদের মান রক্ষার জন্যে পুলিশ এবারেও অভিনয় বন্ধ করে দিল। এর পরে পুলিশ কমিশনার স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ল্যাম্বকে ব্যঙ্গ করে 'Police of Pig and Sheep' নামক প্রহসন রচিত হল। এটার অভিনয়ও পুলিশ বন্ধ ক'রে দেয়।

শাসকেরা এখানেই থেমে থাকলেন না। নাটক যে জনচেতনা সৃষ্টির একটা শক্তিশালী মাধ্যম তা ভালভাবেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই নাট্য-প্রচেষ্টা দমন করার জন্যে বড়লাট নর্থব্রুক ২৯শে ফেব্রুয়ারী এক অর্ডিনান্স জারী করলেন এবং এ সম্পর্কে একটি আইন প্রণয়ন করতেও কৃতসংকল্প হ'লেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় [১লা মার্চ] লেখা হ'ল: "A Gazette of India extra-ordinary was issued last evening containing an ordinance to empower the Government of Bengal to prohibit certain dramatic performance, which are scandalous defamatory, seditious, obscene or otherwise prejudicial to the public interest...

We need hardly say that the Ordinance is issued consequent on the performance of that scandalons farce, entitled 'Gaja nund' on the stage of a disreputable Native Theatre in Calcutta..."

এবার সরকার পূর্বে যে নাটক অভিনীত হয়েছে সেই নাটকেরও অভিনয় বন্ধ ক'রে দিলেন। তাঁদের লক্ষ্য হলো উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' [১৮৭৫] নাটক। এই নাটকটির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু এবং

মতিলাল সুর, বেলবাবু প্রমুখ আটজন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করা হলো। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের একমাস ক'রে বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টের বিচারে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' অশ্লীল প্রমাণিত না হওয়ায় উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল মুক্তি পান।

যে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়েছিল সেটি একখানি সামাজিক নাটক। নাটকের একটি দৃশ্যে যেখানে শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেল বিরাজ মোহিনীর সতীত্ব নাশের প্রচেষ্টায় তাকে রক্তাক্ত বস্ত্র সহ ধ'রে আনলেন সেই দৃশ্যটাকে [তৃতীয় অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক] অশ্লীল ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকে দেশপ্রেমের যে উন্মাদনা ছিল সেটাই কর্তৃপক্ষ সহ্য করতে পারছিলেন না। রোমাণ্টিক প্রণয়মূলক রোমহর্ষক কাহিনীর মধ্যে তিনি দেশপ্রেমের আরক দিয়েছেন সংলাপে ও গানে। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'র একটি দেশাত্মবোধক গান :

হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক-সাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব যশোরাশি কাঁদিতেছে অবিরাম,
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রুজল।

এই গানটি ছাড়াও সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকে ইংরেজের অত্যাচার এবং কারাগার ভাঙার একটা দৃশ্য ছিল [তৃতীয় অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]। আসলে এই দৃশ্যটাই বিদেশী শাসকদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এই দৃশ্যে দেখানো হয়েছিল কারাগারে বন্দী বিদ্রোহ :

'বন্দীগণ॥ ভাঙ, মার, কাট! এই দরজা ভাঙ, [কুঠারাদির দ্বারা কপাট ভাঙার প্রয়াস]

সকলে॥ ভাঙ দেল, ভাঙ দেল [ভিত্তি ভঙ্গীকরণের চেষ্টা]।

১ জন বন্দী॥ এই ইংরেজ অত্যাচার আর সওয়া যায় না। হয় পায়ের শেকল ছিঁড়বো, না হয় মরবো। আর শিকল টেনে নিয়ে বেড়াতে পারিনে। যে যেখানে আছিস আয় সব দৌড়ে আয়…এ বিলিতি শেকল ছেঁড়া এক আধজনের কর্ম নয়।

সকলে ॥ ভাজ, ভাজ [অস্ত্র হাতে দুইজন কারা রক্ষকের প্রবেশ ও বন্দী-দিগকে আক্রমণ—রিভলবার হাতে ম্যাক্রেণ্ডেলের প্রবেশ]।

বন্দীগণ ॥ মার বেটাকে, মার বেটাকে [ম্যাক্রেণ্ডেলকে আক্রমণ]

১ জন বন্দী ॥ [ম্যাক্রেণ্ডেলের তরবারী কাড়িয়া লইয়া তাহার বক্ষোপরি উপবেশন পূর্বক, সবলে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া উন্মত্তভাবে…] আমার নাম পরাণে, আমার চোখের সম্মুখে এ বেটা আমার স্ত্রীর ধর্ম নষ্ট করেছিল…কেমন রে বেটা, আর একবার আমার স্ত্রীকে চাইবিনে ? [আঘাত ও ম্যাক্রেণ্ডেলের মৃত্যু] তোর রক্তে চান করবো, তবে আমার রাগ যাবে।'

শ্রেণীঘৃণার এমন প্রকাশ যে নাটকে রয়েছে সে নাটক দেখে শাসকরা ভয় পাবে বই কি। শুধু তাই নয়, এই নাটকে ইংরেজের বিচার ব্যবস্থারও প্রকৃত রূপ তুলে ধরা হয়েছিল একটি সংলাপে। সুরেন্দ্র যখন অত্যাচারী ম্যাক্রেণ্ডেলের ওপর প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তা করছে তখন তার বোন বিরাজ বললো : "যখন বিচারালয় রয়েছে তখন সে ভার আমাদের নিজের হাতে নেওয়া উচিত ?" তার উত্তরে :

সুরেন্দ্র ॥ বিচারালয় থেকেও নেই। আত্মসমর্থন করতে আমাদের সকলেরই অধিকার আছে এবং করাও একটি প্রধান কর্তব্য কর্ম। কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের সহিত সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যই সেই স্বত্ব ও অধিকার কতক-গুলি ব্যক্তিবিশেষের হস্তে ন্যস্ত হয়…কিন্তু তাহারাই যখন অত্যাচারী, উৎপীড়ক ও স্বার্থপরায়ণ হয়ে ওঠেন…তখন আমাদের সেই আদিম স্বত্ব আমাদের হস্তে প্রত্যাবর্তন করে। তখন উপেক্ষা করে থাকা মূর্খতা, ভীরুতা, তখন তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলে ঘোর প্রত্যবায় আছে।'

উপেন্দ্রনাথের 'শরৎ-সরোজিনী' [১৮৭৪] নাটকও এই ধরণের। অর্থাৎ সামাজিক নাটকের মধ্যে গান এবং কিছু উত্তেজক সংলাপের সাহায্যে দেশাত্মবোধ সঞ্চারের চেষ্টা দেখা যায়। শরৎ-সরোজিনী এবং বিনয়-সুকুমারীর বিবাহের মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি। কিন্তু যবনিকাপাতের আগে পরীরা এসে নৃত্যসহ দেশপ্রেমের গান গেয়েছে :

তোমাদের নিজ দোষে, আজ সব পরবশ
হীনবল, অপযশে ত্রিজগতে পূরিল।

নরনারী পরস্পরে, ভারত উদ্ধার তরে,
উদ্যোগী হও যত্ন ভরে, হও না তায় শিথিল।

: নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন :

এই ধরণের দেশপ্রেমের ভাবালুতাও বৃটিশ সরকার সহ্য করতে পারলো না। দেশবাসীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ১৮৭৬-এর মার্চ মাসেই Dramatic Performance Coatrol Bill নামে আইনের খসড়া কাউন্সিলে পেশ করা হলো এবং ১৬ই ডিসেম্বর এটা আইনে পরিণত হলো।[২] নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন-এর আর একটি তাৎক্ষণিক্ উদ্দেশ্য ছিল 'চা-কর দর্পণে'র মত নাটকের অনুষ্ঠান বন্ধ করা। এই আইনের ফলে ঐ নাটক অভিনীত হতে পারেনি। নাটকটির পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। এই আইন অনুসারে নির্দেশ দেওয়া হলো, পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন নাট্যানুষ্ঠান হ'তে পারবে না। যে কোনও নাটক অভিনয়ের আগে পুলিশের হাতে জমা দিতে হবে এবং সে নাটক প্রকাশের উপযুক্ত কি না সে বিচার পুলিশ কর্তৃপক্ষই করবে।

এর পর থেকে প্রায় এক শতাব্দী কাল পুলিশই ছিল নাটকের বিচারক। তাই নাটক লিখতে হলে, বিশেষভাবে মঞ্চের জন্যে নাটক রচনা করতে হলে পুলিশের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। মন্মথ রায়ের ভাষায়: "শিল্পের বিচারকের আসনে এসে উপস্থিত হলো পুলিশ। তারপর শতাব্দী ধ'রে এই কালা কানুন নাটকের স্বতঃস্ফূর্ততাকে ব্যাহত করেছে, নাটকের স্বাধীন চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে, কিন্তু বাংলার দেশপ্রেমিক নাট্যকারেরা এতেও দমিত হননি।"[৩]

পুলিশ বিভাগের কৃপায় বহু নাটক অভিনীত হওয়া তো দূরের কথা, লালবাজারের বন্দীদশা মুক্ত হয়ে কোনও দিন আলোর মুখ দেখতে পায়নি। ১৯৬৯-এ পুলিশ বিভাগ যে তথ্য প্রকাশ করেন[৪] তাতে দেখা যায় যে ১৯৬৭-এর মধ্যে [অর্থাৎ ৯০ বছরে; শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের ২০ বছর পর পর্যন্ত] লালবাজারে ১১০৬টি নাটকের পাণ্ডুলিপি জমা পড়ে। এর মধ্যে সব চেয়ে পুরানো তুলসীচরণ দাসের 'রত্নাকর' নামীয় নাটক। এটি জমা পড়ে ১৮৯১-এ। এই সহস্রাধিক নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংখ্যা ১৪। এই ১৪টির মধ্যে একটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটক 'বিসর্জন'। যে সমস্ত নাটকের

পাণ্ডুলিপি আটকে রাখা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলি ছাপা হয়ে প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু যেভাবে নাটক অভিনয় করতে চাওয়া হয়েছিল বা যেভাবে প্রকাশ করতে চাওয়া হয়েছিল সে ভাবে অভিনয় করতে বা ছাপতে দেওয়া হয়নি। পুলিশের নির্দেশ যাঁদের মনঃপুত হয়নি তাঁদের নাটক জনসমক্ষে আসেই নি। আবার কিছু নাটক পুলিশ একেবারেই অনুমোদন করেনি; সেগুলির অভিনয়ের বা প্রকাশের কথাই ওঠে না।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে 'রাজভক্ত প্রজার মান রক্ষা' এবং 'সরকার বিরোধী উত্তেজনা দমনের' উদ্দেশ্যে নাটক নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হলেও, যেহেতু পুলিশ হলো নাটকের বিচারক সেইহেতু 'অশ্লীলতা', 'সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি' —এমন যে কোনও অজুহাতে নাটক নিষিদ্ধ করা হতো।

বাঙালী নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে দেশপ্রেম প্রচারের যে পথ ধরেছিলেন নাটক নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে তাতে বেশ বাধার সৃষ্টি হলো। যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'পুরুবিক্রম'-এ জাতীয়তার উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন 'সরোজিনী'র পরেই তা ক্ষীয়মান হ'লো এবং শেষে গিরিশচন্দ্রের উপর নাট্য-রচনার ভার অর্পণ করে তিনি সরে গেলেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেন বন্ধ করলেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি অমৃতলাল বসুকে বলেছিলেন: "নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছেন, আমার নাটক রচনার আর প্রয়োজন নাই।"[৫]

: গিরিশচন্দ্রের প্রথম যুগের ঐতিহাসিক নাটক :

যে গিরিশচন্দ্রের হাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক রচনার ভার অর্পণ করলেন তিনি ঐতিহাসিক নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নন, তিনি পৌরাণিক নাট্যকার গিরিশচন্দ্র। এই গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক বর্ণাঢ্যতা রোমান্স ও ভক্তির প্লাবনে রঙ্গমঞ্চ প্লাবিত করে দিলেন। এই যুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার বৎসরে গিরিশচন্দ্র যে সব নাটক লিখেছেন তার অধিকাংশই পৌরাণিক নাটক, গীতিনাট্য, রোমান্টিক নাটক এবং পাঁচমিশালি রং তামাসা। ঐতিহাসিক নাটক যে কয়খানি এ সময় তিনি লিখেছেন সেগুলি গিরিশচন্দ্রকে ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করতে পারেনি। এই নাটকগুলি হচ্ছে, 'আনন্দ রহো' [১৮৮১], 'মহাপূজা' [১৮৯১], 'চণ্ড'

[১৮৯১], 'কালাপাহাড়' [১৮৯৬], 'সৎনাম বা বৈষ্ণবী' [১৯০৪], 'রাণা প্রতাপ' [১৯০৪]। শেষোক্ত নাটকখানি গিরিশচন্দ্র শেষ করতে পারেন নি।

রাজপুত ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনা গিরিশের পূর্বেই সুরু হয়েছিল। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দ রহো'ও রাজপুত কাহিনী অবলম্বনেই রচিত। ঐতিহাসিক নাটকে অবাধ কল্পনার সঞ্চার তাঁর পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই করেছেন—গিরিশচন্দ্রও তা থেকে মুক্ত নন। যাত্রার প্রভাবও তিনি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি তাঁর প্রথম যুগের ঐতিহাসিক নাটকে তাঁর পূর্বসূরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পথ থেকে সরে এসেছিলেন এবং সে পথ হচ্ছে ঐতিহাসিক নাটকে দেশাত্মবোধের উত্তেজনা সঞ্চারের পথ।

এর কারণ প্রথমত নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন। গিরিশচন্দ্র নাটক লিখতেন ব্যবসায়ভিত্তিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্যেই; সুতরাং সে নাটকে দেশপ্রেম প্রচারের ঝুঁকি ছিল। দ্বিতীয়ত সে যুগের দেশাত্মবোধের সংগে ধর্মবোধের মিশ্রণ এবং তৃতীয়ত জাতীয়তাবোধের আদর্শ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের বিশিষ্ট ধারণা। তাঁর বক্তব্য: "জাতীয় বৃত্তি পরিচালিত ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিসাবে হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয়তার মর্মে এই ধর্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে তাহাতে কেহ ভারতবর্ষের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভারত ধর্মপ্রাণ। যাহারা লাংগল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হাল সঞ্চালন করিতেছে তাহারাও কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটকের সার্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, তবে কৃষ্ণ নামেই হইবে।...হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্মাশ্রিত ধর্ম বিদেশীর ভীষণ তরবারি ধারে উচ্ছেদ হয় নাই। আকবরের রাজনৈতিক প্রভাবেও সমভাবে আছে।"[৬]

গিরিশচন্দ্র ব্যবসায়ের দিকটাও দেখেছিলেন অর্থাৎ ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চ সাফল্য লাভ করবে কিনা, এ বিষয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাঁর বক্তব্য: "ঐতিহাসিক নাটক দুই একখানি হইয়াছে, কৃতবিদ্য অনেক লোক তাহার প্রশংসাও করিয়াছে, কিন্তু সমালোচকেরা সে স্থানে নিস্তব্ধ ছিলেন। ......ইতিহাসবিদ কয়েকজন সকল মর্ম বুঝিবেন, কিন্তু তাহাতে নাট্যকারের ব্যবসা চলিবে না।..... না চলুক, যদি চরিত্র পাওয়া যাইত, যাহা পুরাণে নাই,

তাহা হইলেও কথা ছিল। ঐতিহাসিক নাটক সমস্তই স্থানীয় Shakespeare-এর ঐতিহাসিক নাটক স্থানীয়।… …স্থানীয় প্রসংগ স্থানেই চলিয়াছে।"[৭]

ধর্মবোধ এবং পুরাণের প্রতি নিষ্ঠার ফলে ১৯০৪ পর্যন্ত যে সব ঐতিহাসিক নাটক গিরিশচন্দ্র রচনা ক'রেছেন তার সবগুলিই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের বাহন হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি গিরিশচন্দ্রের নিষ্ঠা ছিল না তা নয়। কিন্তু এই সময়ে লিখিত নাটকগুলিতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে যে সব উপাদান তিনি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন তার ফলেই নাটকগুলি প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক হয়নি।

'আনন্দ রহো' নাটকের কাহিনীর ভিত্তি টডের রাজস্থান।[৮] কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যে যেমন কিছু কাল্পনিক ঘটনা সংযোজন করেছেন, তেমনি বেশ কিছু চরিত্র তিনি নিজে উদ্ভাবন করেছেন। ঘটনার পর ঘটনা সংস্থাপন করার ফলে নাটকের মূল সুর হারিয়ে গেছে। রাণা প্রতাপের মৃত্যু, মানসিংহকে হত্যার জন্যে আকবরের ষড়যন্ত্র, মানসিংহের কন্যা লহনার প্রেম এগুলি নাটকের বিষয়বস্তু। কিন্তু ঘটনাগুলি এতই বিচ্ছিন্ন যে এগুলির দ্বারা একটা সংহত নাট্যকাহিনী গড়ে তোলা যায় নি। এই নাটকে বেতাল বলে পরিচিত একটি গুপ্তচরের চরিত্র রয়েছে। সে 'আনন্দ রহো' এই ধ্বনি দিয়ে তার কার্যসিদ্ধি করতো এবং সেই ধ্বনিটিই নামকরণ-এ এসেছে। এই বেতালের পরিচয় প্রসঙ্গে মানসিংহ বলেছেন ": ওর নাম কি তা জানি না। যেখানে সেখানে একটা বেতালা কথা কয়ে ফেলে, তাই ওর নাম বেতাল।" [১।১]। এই বেতালের উপস্থিতি সর্বত্র—রাজপথ, বনপথ থেকে সুরু ক'রে রাণা-প্রতাপের রাজসভা এবং আকবরের দরবার পর্যন্ত।

ইতিহাসের চেয়ে রোমান্টিক ঘটনাই আলোচ্য নাটকে বেশী: অনায়াসে মানসিংহের ভগিনী কারাগারে প্রবেশ করে নারায়ণ সিংহকে মুক্ত করতে চাইছে, কারাগারে বালক বেশে মানসিংহের ভাগিনেয়ী যমুনা বেতালের সংগে প্রবেশ করছে।

নাটকে প্রতাপের দেশপ্রেমের কথা আছে এবং "রাজপুতনার আত্ম-বিচ্ছেদ"ই যে রাজপুত জাতির পরাজয়ের কারণ সে ইঙ্গিতও আছে। এমন কি আকবরের মুখ দিয়েই বলানো হয়েছে যে, মানসিংহের বাহুবলেই তিনি দিল্লীশ্বর, প্রজার প্রেমে নয়। [১।১]। 'চণ্ড' নাটকের কাহিনীও টডের

রাজস্থান থেকে নেওয়া। রাঠোরের ভাট চিতোরের রাণার কাছে তাঁর পুত্রের জন্যে রাঠোর রাজকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে। কিন্তু রাণার দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে রাজকুমার চণ্ড বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। কিছুতেই যখন রাজকুমার রাজী হলেন না, তখন বৃদ্ধ রাণা নিজেই রাঠোর রাজকন্যাকে বিবাহ ক'রলেন। এই রাজকুমারীর নাম গুঞ্জমালা। এই কনিষ্ঠা রাণীর সন্তান মুকুল। মুকুল শৈশবে পদার্পণ করা মাত্রই রাণা সংসার ত্যাগ করলেন। তখন চণ্ড মুকুলকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেই তার নামে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। কিন্তু গুঞ্জমালা ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখলেন না। তিনি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে চণ্ডকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করলেন এবং নিজের পিতাকে চিতোরে ডেকে আনলেন। রাঠোরাধিপতি রণমল্ল চিতোরে এসে শুধু রাজ্যের কর্তৃত্বভারই গ্রহণ করলেন না—মুকুলকে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করে নিজেই চিতোরের রাণা হ'তে চাইলেন। গুঞ্জমালা এর জন্যে স্বভাবতই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি নিরুপায় হয়ে চণ্ডের সাহায্য চাইলেন। চণ্ড তাঁর ভীল সৈনিকদের নিয়ে চিতোর আক্রমণ করলেন এবং রণমল্লের হাত থেকে চিতোর উদ্ধার করলেন। চণ্ড সিংহাসনে বসলেন না, মুকুলকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন

মেবার ও রাঠোরের দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে রচিত এই নাটকে নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট আছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রেম, ঈর্ষা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির লীলা-ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই নাটকের নায়ক চণ্ড একটি আদর্শ চরিত্র। ধাত্রী কুশলার ভাষায় বলতে গেলে চণ্ড :

> "অতি উচ্চ মতি স্বদেশ বৎসল
> ধীর বীর গভীর সাগর সম শ্রেষ্ঠ
> শ্রেষ্ঠ হতে, দেবোপম উদার হৃদয়।" [৩।২]

তাঁর বীরত্ব, মহত্ত্ব, দেশপ্রেম, ত্যাগ ও উদারতার তুলনা হয় না। আবার শুধু এই কয়টি গুণ নিয়ে সে মহাপুরুষ-এ পরিণত হয় নি, তার মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রতিশোধ স্পৃহা, শৌর্যে ও বীর্যে তাকে প্রকৃত মানুষ ক'রে তুলেছে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রাঠোরাধিপতি রণমল্ল কাপুরুষ না হলেও দুর্বৃত্ত শ্রেণীর। কামান্ধতা তাকে অনেক নীচে নামিয়েছে। তাঁর সিংহাসনের নীচে লুকানো

স্থূল রসিকতা ; ঠিক তেমনি ব্যাপার বসুদেবের বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে বিজয়ীর নিকট উপস্থিতি।

এই বিজয়ী চরিত্রকে নাট্যকার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সে গুঞ্জমালার সখী। কিন্তু নাটকে তার এক বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সে মধ্যমকুমার বসুদেবজীকে ভালবাসে। সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এই ভালবাসা গভীর। তার মৃত্যুর সময়েও সে দৃপ্ত কণ্ঠে নিহত বসুদেবকে সে স্মরণ ক'রে বলেছে : "করিয়াছি বসুদেবে মানসে বরণ,/বসুদেব প্রাণপতি।" এই বিজয়ীর রণংদেহি মূর্তিও দর্শকদের চমকিত করে।

নাটকের রঘুদেব একটি আদর্শ চরিত্র, কিন্তু নাটকীয় চরিত্র নয়। রঘুদেব পিতৃ-ইচ্ছা পূরণের জন্যে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী ব্রত অবলম্বন করেছেন—তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা সবই দেবতার চরণে সমর্পিত, দেবকার্যে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। মাঝে মাঝে আদর্শবাদী বক্তৃতা ছাড়া তাঁর কার্যক্রম কিছুই নেই। তবে গিরিশচন্দ্র 'রাজস্থান'-এর সংগে সংগতি রেখে তাঁর চরিত্র উপস্থিত করেছেন। রাজস্থান-এ আছে : "Ragoodeva was so much beloved for his virtues, courage and manly beauty, that his murder became martyrdom and obtained from him divine honours, and a place among the 'Di Patres' [Pitrideva] of Mewar"[১০] এই জন্যেই দেখতে পাই তৃতীয় অঙ্কে ঘাতকের হাতে মৃত্যু বরণের পরে ঠিক শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজারের spirit-এর মত তিনি নাটকের চরিত্রগুলির ওপরে প্রভাব বিস্তার না করলেও তাঁর স্মৃতি বেঁচে ছিল। রঘুনাথের সমাধি-মন্দির প্রাঙ্গণে চিতোরবাসী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের গান 'জয় জয় বসুদেব, জয় জয়' [৪।১] এবং শেষ দৃশ্যে বসুদেবের সমাধি মন্দিরে পুষ্প-বরিষণের সংগে সমবেত সংগীত এদিক থেকে লক্ষণীয়।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম যুগের ঐতিহাসিক নাটকগুলির অন্যতম 'সৎনাম' বা 'বৈষ্ণবী' নাটক। তাঁর দেশাত্মবোধক নাটক 'সিরাজদ্দৌলার' দু-বছর আগে লেখা এই 'সৎনাম'ও দেশাত্মবোধক নাটক। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজীব-এর বিরুদ্ধে সৎনামী সম্প্রদায়ের যে বিদ্রোহ হয়েছিল সেই কাহিনী অবলম্বন করে এই নাটক। স্বাধীনতাকামী, ব্রতধারী সম্প্রদায়ের আশা ও আশাভঙ্গের কাহিনী এই নাটকে বিধৃত। এই নাটকে স্বদেশ-প্রেমের প্রবল তরঙ্গ সৃষ্টি করা

হয়েছে সত্যি, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোড়কে পরিবেশিত হওয়ায় তার মধ্য থেকে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প উদ্গীরিত হয়েছে। জোর করে ধর্মান্তর গ্রহণ করানো, অন্যথায় হত্যা—হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের এই ধরণের নানাবিধ অত্যাচারের ঘটনা এতে উপস্থিত করা হয়েছে। ফকীর হিন্দু-ক্লীবত্বের প্রতি কটাক্ষ করছে;[১১] বৈষ্ণবী সোজাসুজি মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুকে উত্তেজিত করছে।[১২]

নাটক হিসেবেও 'সংনাম' উচ্চস্তরের নয়। সাত সাতটি চরিত্রের পতন ও মৃত্যুর ঘনঘটা নাটকটিকে মেলোড্রামার দিকেই ঠেলে নিয়ে গেছে; ট্র্যাজিক গাম্ভীর্য একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। অধিকন্তু, এই শ্রেণীর নাটক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির সহায়ক হয় নি; বরং দিনের পর দিন মঞ্চে অভিনীত হয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতারই সঞ্চার করেছে।

এই সংনাম নাটকের প্রতি মুসলমান দর্শকেরা এমন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়েছিল: "গিরিশবাবুর সংনাম মহানাটক লইয়া গত শনিবারে ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। মুসলমানের কুৎসাপূর্ণ নাটক অভিনয় করিতে দিব না বলিয়া কলিকাতা সহরের প্রায় ২।৩ সহস্র মুসলমান ক্লাসিক থিয়েটারের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিলেন, শহরে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, নাটক অভিনয় বন্ধও হইয়াছিল।" ['মিহির ও সুধাকর', ২৭ মে, ১৯০৪]

'কালাপাহাড়' নাটকটিকে গিরিশচন্দ্র নিজেই 'ভক্তিরসাত্মক নাটক' বলে অভিহিত করেছেন। এই নাটকে ভক্তিভাব বা আধ্যাত্মবোধ দ্বারা এমন প্রভাবিত যে, এটিকে ঐতিহাসিক নাটক বলাই কঠিন। নাট্যকার ইতিহাসের কালাপাহাড় চরিত্রকে বর্জন করে নাটকের কালাপাহাড়কে দিয়ে প্রেম, ভক্তি এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের জয়গান গাইয়েছেন।

গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার প্রথম যুগে দেশাত্মবোধক কাব্য ও উপন্যাসের নাট্যরূপ দান করার একটা রেওয়াজ চালু হয়। ১৮৮২-এ আনন্দমঠ প্রকাশের পর বৎসরই কেদার চৌধুরী কৃত তার নাট্যরূপ ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ ক'রে গিরিশচন্দ্র যে সব উপন্যাস ও কাব্যের নাট্যরূপ দান করেন তার মধ্যে রয়েছে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ।'

: রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রচেষ্টা :

রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনা সুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশক থেকে। শৈশব থেকেই জাতীয় ভাবধারার সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হিন্দুমেলার অধিবেশনে তিনি স্ব-রচিত দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করেছেন।[১৩] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঞ্জীবনী সভারও তিনি সভ্য ছিলেন। তাঁর নিজের কথায় "আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন উড়িয়া চলিতাম।...এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।" —[জীবনস্মৃতি]।

এই 'উত্তেজনার আগুন' সে যুগের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ নাট্যকারদের নাটককে স্পর্শ করেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটককে স্পর্শ করেনি। রবীন্দ্রনাথের নাট্যিক পরিকল্পনার সর্বপ্রথম উন্মেষ দেখা গেল যে 'রুদ্রচণ্ড'-এ [১৮৮১]। তাতে পৃথ্বীরাজ আছেন, মহম্মদ ঘোরী আছেন এবং পৃথ্বীরাজের পরাজয়ও আছে, কিন্তু সেটা না হয়েছে নাটক এবং সেটায় না রক্ষিত হয়েছে ইতিহাসের মর্যাদা। নাটকের নাম পত্রে 'নাটিকা' কথাটি আছে এবং দৃশ্য বিভাগও আছে, নাটকীয়তাও আছে কিন্তু সমালোচকেরা তাকে "গাথা-কাব্য"-ই আখ্যা দিয়েছেন। Edward Thomspon অবশ্য এটিকে বলেছেন—"The piece is poor melodrama"[১৪]

রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম পূর্ণাবয়ব নাটক 'রাজা ও রাণী'তে [১৮৮৯] রাজা আছেন, রাণী আছেন, মন্ত্রী আছেন—কিন্তু তাঁরা ইতিহাসের কেউ নন। একটি রোমান্টিক কাহিনীকে ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের মধ্যে ফেলে ইতিহাসের রূপ দানের চেষ্টা হয়েছে। এর মধ্যে গ্রথিত তথ্য ও তত্ত্ব কোনটাই ঐতিহাসিক নয়। কিন্তু তথাপি নাটকটিতে বিদেশী শাসনের প্রতি বার বার কটাক্ষ থাকায়[১৫] Edward Thompson এর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার আভাষ পেয়েছেন। তিনি লিখেছেন: **It will be at once grasped that the play has a double meaniug, it had a political reference, which helps to explain its very considerate measure of popularity on the stage. The Minister's reply to King's demand that his generals turn the aliens out—'our general is a foreigner—this**

repeated by the King of Kashmir himself, is almost the burden of the play. Later, the King of Kashmir indignantly repudiates the suggestion that his son came before Bikram's Court to be condemned or forgiven by a 'foreigner'. Non-co-operation is here in the germ, generated before Mr. Gandhi launced it."[১৬]

রাজনৈতিক চেতনার আভাস সম্পর্কে টমসনের উক্তিতে কিছু সত্যতা থাকতে পারে, কিন্তু এই নাটকের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের বীজ খুঁজতে যাওয়া নেহাতই কষ্ট কল্পনা।

: জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুসরণ :

অপহৃতা হিন্দু কন্যা অশ্রুমতী এবং মুসলমান যুবরাজ সেলিমের প্রণয় কাহিনী রচনা ক'রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রীতিমত বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছিল। 'অশ্রুমতী' নাটকের ১৮ বছর পরে ১৮৯৭-এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু একই ধরণের কাহিনী নিয়ে 'সতী' নামক কাব্যনাট্য রচনা করলেন।

'অশ্রুমতী'র কাহিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বকপোলকল্পিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাহিনী 'মিস ম্যানিং সম্পাদিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় প্রকাশিত মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়ার্থ সাহেব রচিত প্রবন্ধ বিশেষ হইতে সংগৃহীত।' 'অশ্রুমতী' নাটকে অশ্রুমতীকে নিষ্কলঙ্ক রেখে শেষ পর্যন্ত তাকে যোগিনী ব্রতে দীক্ষিত করা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাট্যের কাহিনী অনেকদূর এগিয়ে গেছে—বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাইকে বিবাহ-সভা থেকে অপহরণ করে বিজাপুর রাজ্যের মুসলমান সভাসদ তাকে বিবাহ করেছে; অমাবাইও স্বেচ্ছায় তাকে পতিরূপে গ্রহণ করেছে। সে একটি পুত্র সন্তানও লাভ করেছে। যে রাত্রে অমাবাই অপহৃতা হয়, সেই রাত্রে বিনায়ক রাও অমাবাই-এর বাগদত্ত স্বামী জীবাজিসহ ঐ মুসলমান সভাসদ-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। সুযোগ মত যুদ্ধ ঘোষিত হলো, যুদ্ধে জীবাজি ও ঐ মুসলমান সভাসদ নিহত হল। অমাবতী যুদ্ধক্ষেত্রে এসে স্বামী হত্যার জন্য পিতাকে অভিযুক্ত করলো। বিনায়ক রাগে জ্বলে উঠলো। তখন অমা পতিগৃহে পুত্রের কাছে ফিরে যেতে

চাইলো। কিন্তু পিতা তাকে বাগ্‌দত্ত স্বামীর চিতায় সহমরণে যাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু অমা দৃঢ়ভাবে জানাল—এ অসম্ভব। কারণ যাকে সে ভালবেসে শ্রদ্ধাভরে বরমাল্যে বরণ করেছে সেই মুসলমান সভাসদই তার পতি—অন্য পতির কথা চিন্তা করাও পাপ। অমাবাই এর মাতা রমাবাই কন্যাকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন এবং তিনিও তাকে জীবাজির চিতায় সহমরণে যেতে আদেশ দিলেন। বিনায়ক রাও-এর মন ঘুরলো—তিনি অমাকে পতিগৃহে ফিরতে বললেন। কিন্তু রমাবাই-এর আদেশে সৈন্যগণ চিতা সজ্জিত ক'রে জীবাজির সঙ্গে অমাকেও ভস্মীভূত করলো। এইভাবে বাগদত্ত স্বামীর সংগে সহমরণে পাঠিয়ে রমাবাই ও সৈন্যগণ সতী বলে অমাকে ধন্য ধন্য করেছে। কিন্তু অমা ধর্মরাজকে উদ্দেশ্য ক'রে তার শেষ আবেদন জ্ঞাপন করেছে: 'তব নিত্যধর্মে করো জয়ী ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত রবীন্দ্রনাথও অন্তরের শাশ্বত প্রকৃতিকেই বড় করে দেখেছেন। অশ্রুমতী বলেছে: "আমি রাজপুতও জানিনে, মুসলমানও জানিনে—আমার হৃদয় যাকে চায়, আমি তাকেই জানি"। রমাবাইও দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে:

> যবন ব্রাহ্মণ
> সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়।
> সেথায় সমান দোঁহে।
> অন্তরের অন্তর্যামী যেথা যেগে রয়

তাই অশ্রুমতীর উক্তির প্রতিধ্বনি ক'রে রমাবাই বলেছেন:

> উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
> ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যে মনে
> পূজিয়াছি পতি বলি, মোরে করে ঘৃণা
> এমন সতী কে আছে। নহি আমি হীনা
> জননী তোমার চেয়ে—হবে মোর গতি
> সতীস্বর্গলোক।

: রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' :

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' [১৮৯০] নাটক ঠিক ঐতিহাসিক নাটক নয়, যদিও এতে ইতিহাসের পাত্রপাত্রী আছে এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকেই এই নাটকের ভাব আহৃত হয়েছে। মোগল রাজত্বেও বাংলা দেশের কোন কোন

অঞ্চল অল্প বিস্তর স্বাধীন ছিল। এইরূপ একটি অঞ্চল ত্রিপুরা। কল্যাণ-মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দমাণিক্য ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নক্ষত্র রায় সিংহাসন অধিকারের চক্রান্ত করেন। কিন্তু "রাজ্যলোভে ভ্রাতৃবধ জনিত পাপে লিপ্ত হওয়া নিতান্ত অযশস্কর। অতএব আত্মরক্ষার জন্য তিনি বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আরাকান যাত্রা করেন। এদিকে নক্ষত্র রায় ছত্রমাণিক্য নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন"।[১৭] ছত্রমাণিক্যের সাত বছর রাজত্বের পর গোবিন্দমাণিক্য রাজা হন। 'বিসর্জন'-এ তুজনের বিবাদের কাহিনী আছে, কিন্তু তার বিন্যাস ও পরিণতি অন্যরূপ। "গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্ঞী কমলা মহাদেবী তৎকালে রমণীকুলের মধ্যে অদ্বিতীয়া ধর্মিষ্ঠা ছিলেন।"[১৮] বিসর্জনে এই কমলা দেবী 'গুণবতী' হয়েছেন। অবশ্য রাজার সঙ্গে ধর্মাচরণ নিয়ে বিরোধের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন'-এ একটি তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন এবং সে তত্ত্ব হচ্ছে: 'প্রেমের পথ ও হিংসার পথ এক নয়, প্রেমেই দেবতার পূজা, হিংসায় নয়।' এই তত্ত্ব প্রচারের জন্যে তিনি 'রাজর্ষি' নামে প্রথমে যে উপন্যাস রচনা করেন তার কাহিনী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—"এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে।"[১৯] এই 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ নিয়ে বিসর্জন রচিত; অবশ্য পাত্র-পাত্রী কিছু অদল বদল করা হয়েছে। একটা কথা স্বভাবতই মনে হতে পারে যে, ঐ রকম স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা রাজপরিবারকে ঘিরে দেখলেন কেন এবং বাস্তব ইতিহাসের পটভূমিকায় এটা কতকটা সংগতি সম্পন্ন?

ত্রিপুরার রাজারা বরাবর শক্তিদেবীর উপাসক। পশুবলি তো দূরের কথা 'রাজমালা' থেকে জানা যায় যে, নরবলি প্রথাও এখানে প্রচলিত ছিল। মহারাজ ধন্যমাণিক্য বাৎসরিক নরবলি প্রথা রহিত করেন, কিন্তু যুদ্ধে বন্দীকৃত শত্রুকে বলি দেবার প্রথা প্রচলন করেন। ১৬১১-এ রাজধর মাণিক্য রাজা হন। তাঁর সময় নিত্যানন্দ বংশজ গোস্বামিগণ রাজপরিবারে কৃষ্ণমন্ত্রের বীজ বপন করেন। রাজধরমাণিক্য বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন এবং তিনি সেখানে সর্বদা বিষ্ণুর উপাসনা করতেন। এরপর থেকেই ধর্মীয় আচরণ নিয়ে দ্বন্দ্ব সুরু হয়। সুতরাং এর ৫০ বছরের মধ্যে গোবিন্দমাণিক্যের সময়ের হিংসা ও প্রেমের

দ্বন্দ্ব সমন্বিত কাহিনী রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে ধরা পড়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।

স্বপ্নলব্ধ কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্ববাহী নাটক লিখেছেন তাতে বৃটীশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হিংসাত্মক কোনও প্ররোচনা সৃষ্টি তো দূরের কথা, দেশাত্মবোধক কোন কথাও ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নাটকটিকে পুলিশ লালবাজারে আটক করেছিল। এর একটা সম্ভাব্য কারণ, নাটকে জয়সিংহ ও রঘুপতির কিছু উক্তি। জয়সিংহ বলেছেন দেবীকে উদ্দেশ্য করে :

> চাই তোর রাজরক্ত দয়াময়ী জগৎপালিনী
> মাতা ? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবেনা
> তৃষা ?.........

রাজরক্তের কথা। কী সাংঘাতিক ব্যাপার! সর্বোপরি রাজপুরোহিত রঘুপতি পর্যন্ত বললেন :

> "...কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ।
> এ জগৎ মহা হত্যাশালা।"

এর পরে কী আর পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'-কে লালবাজারে আটক করা হলো।

শুধু বিসর্জন নয়, রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটকে রাজা আছে। কিন্তু তাঁরা ইতিহাসের রাজা নন। নাটকগুলিতে ইতস্তত: যে সব উক্তি আছে সেগুলির উল্লেখ করলে বা দু-একটি চরিত্র ব্যাখ্যা করলে মনে হতে পারে যে সমসাময়িক যুগের ভাব তাতে ধরা পড়েছে, কিন্তু তাই বলে নাটককে ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা দেওয়া ঠিক হবে না। যেমন 'রাজা ও রাণী' নাটকে জালন্ধরের উৎপীড়িত প্রজাদের সামনে দেবদত্ত বলেছেন : "তোমাদের বল কী ? না, 'দুর্বলস্য বল রাজা'—কিনা রাজাই দুর্বলের বল। আবার 'বালানাং রোদনং বলং'—রাজার কাছে তোমরা বালক বই নও। অতএব এখানে কান্নাই তোমাদের অস্ত্র।" এটা কি সে যুগের জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের উদ্দেশ্যে লেখা ? হতে পারে।

আবার 'মুক্তধারা' নাটকের কথাই ধরা যাক। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন : "১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর ভারতব্যাপী অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তাহার পরের বৎসরই এই নাটকের

রচনাকাল। প্রথম উত্তেজনার মুখে তখন সমগ্র ভারতবর্ষ এই আন্দোলনে প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এই নাটকের মধ্যেও বিজিত জাতি শিবতরাইর অধিবাসীদিগের উপর বিজেতা উত্তরকূটের অধিবাসীদিগের আচরণের যে সকল কাহিনী বর্ণিত আছে তাহাদের মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম এই অভিনব অহিংসা মুক্তি-আন্দোলনের কতকটা স্বরূপও প্রকাশ পাইয়াছে। দুর্বল প্রজাকে রাজশক্তির পীড়ন হইতে মুক্তি দিবার ধর্মে দীক্ষিত ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়।" [রবীন্দ্র নাট্যধারা, ১৩৭৩, পৃঃ ৩৬৯]।

এইভাবে নাটকে 'রাজা' আছেন বা কাল চেতনাও মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে বলেই সেগুলি ঐতিহাসিক নাটক নয়।

: অমৃতলাল বসুর প্রচেষ্টা :

নাট্য-জগতে অমৃতলাল বসু 'রসরাজ' আখ্যায় ভূষিত। প্রচুর ব্যংগ-রংগরস তিনি বাঙালী দর্শককে পরিবেশন করেছেন তাঁর প্রহসনগুলির মাধ্যমে। হাস্যরস ও বিদ্রূপের জ্বালা সমন্বিত তাঁর জটিলতাহীন নাট্য-কাহিনীতে বৈচিত্র্য কম। সে যুগের বাঙালীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় চেতনার দ্বারা তিনি উদ্‌বুদ্ধ হন নি, উপরন্তু নবজাগরণকে তিনি বিদ্রূপই করেছেন। অথচ এরই মধ্যে তাঁর তিনটি নক্‌সা জাতীয় নাট্য-প্রচেষ্টা দেখা যায় যেগুলিতে দেশাত্মবোধের স্পর্শ লেগেছে। এই তিনটি হচ্ছে 'সাবাস আটাশ' [১৩০৬], 'নবজীবন' [১৩০৮] এবং 'সাবাস বাঙালী' [১৩১২]।

লর্ড কার্জনের আমলে [১৮৯৯-এ] কলকাতায় যে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্তিত হয় তার প্রতিবাদে নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রমুখ কলকাতা ও শহরতলীর আটাশ জন কমিশনার পদত্যাগ করেন [একজন পদত্যাগ করেন নি]। এঁদের বাহবা দিয়ে 'সাবাস আটাশ' রচিত হয়। অমৃতলাল স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন ; সুতরাং পদত্যাগী কমিশনারদের তিনি প্রশংসা করতেই পারেন। তবে এতে এক পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনদাতার নিন্দা এবং অন্য এক পেটেণ্ট কেশ তৈলের প্রস্তুতকারকের প্রশংসা থাকায় স্বভাবতই মনে হবে যে, উক্ত কেশ তৈলের প্রচারে সাহায্য করাই এর উদ্দেশ্য ছিল।

'সাবাস বাঙালী' : এই সামাজিক নক্সাটি দীর্ঘতর রচনা। এটিকে নাট্যকার সামাজিক নক্সা বলে অভিহিত করলেও প্রকৃতপক্ষে এতে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ছবিই ফুটে উঠেছে। এতে দেশের স্বদেশী আন্দোলনের, বিশেষ করে বিদেশী বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণের যে আন্দোলন চলছিল তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন আছে। এই নাটকের চরিত্রগুলিকে উচ্চ আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ক'রে তাঁদের দিয়ে রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ানো হয়েছে। এই নাটকের গানগুলি একই উদ্দেশ্যে রচিত। গানই প্রকৃতপক্ষে 'সাবাস বাঙালী'র প্রাণ। বিদেশী পোষাক, বিদেশী রাজদত্ত খেতাব, বিলাতী শিক্ষা, গোলামী সব কিছুর বিরুদ্ধেই ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে গানের মাধ্যমে। ঘটকী, মুচি, চুড়িওয়ালী, বালক, ধোপানী, মহিলা—সবার গানেই দেশাত্মবোধক স্বর ধ্বনিত। ধিক্কার দিয়ে হবু-বরদের মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে চেয়েছে ঘটকীরা। অন্যদিকে চুড়িওয়ালীরা বুঝেছে যে, বিলাতী চুড়ি বিক্রির দিন শেষ হয়েছে; এদিকে ধোপানীরা গানের মাধ্যমে বিলাতী কাপড় কাচতে অসহযোগিতা করার সংকল্প গ্রহণ করেছে; মাতাল বিলাতী হুইস্কি ছেড়ে দু-দশ ছটাক খাঁটি টেনে গান গেয়েছে; আবার মুদি বুঝতে পেরেছে ছোকরারা দেশী ধুতি চাইছে। বালকেরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে:

> …তোমার দুঃখ ঘুচাব মা নিজে
> মাথায় মোট করে
> অলস বিলস ছেড়ে মাগো
> পূজবো তোমায় প্রাণ ভ'রে।…

দাদারা মোট মাথায় নেওয়ায় বোনেরা খুসী হ'য়ে বিদেশী পোষাক ছাড়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে, আবার মহিলারা চরকা কাটছে আর গান গাইছে। এইভাবে আগাগোড়া গানের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ জাগাবার প্রচেষ্টা রয়েছে।

অমৃতলালের 'নবজীবন' নামক "নাট্যলীলা" [নাট্যকার কথিত]-য় কোনও ধারাবাহিক কাহিনী নেই; তবে দেশপ্রেমের উত্তেজনা আছে। 'নবজীবন'-এ তিনটি দৃশ্য আছে। প্রথম দৃশ্যে কংগ্রেস কি কি ভাল কাজ ক'রেছে তার বিবরণ, দ্বিতীয় দৃশ্যে গীত সহযোগে ভারত-লক্ষ্মীর কলকাতা পরিক্রমা, তৃতীয় দৃশ্যে হিমালয় পর্বতে সিংহাসনে ভারতমাতা উপবিষ্টা—সম্মুখে ভারত সন্তানগণ নিদ্রিত। এই নাট্যলীলায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারত সন্তান',

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখ চন্দ্রমা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অয়ি ভুবনমোহিনী' গান ব্যবহার করা হয়েছে। নাটক শেষ হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গান দিয়ে। এই নাট্যলীলাতেও দেশাত্মবোধের উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যে প্রধানত গানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

প্রহসনাদির মাধ্যমে প্রচুর রঙ্গরস পরিবেশনের জন্য সে যুগে অমৃতলাল বসু 'রসরাজ' আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। সে যুগের বাঙালীর আত্মিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন নি। উপরন্তু নতুন আলোকপ্রাপ্ত বাঙালীদের মধ্যে সে যুগে যে জাগরণ এসেছিল তাঁকে তিনি বিদ্রূপই করেছেন। কিন্তু তথাপি তাঁকেও লিখতে হয়েছে দেশাত্মবোধক নক্সা।

আগেই বলেছি যে অমৃতলাল যে তিনটি দেশাত্মবোধক নক্সা জাতীয় নাট্য-প্রচেষ্টায় নিরত হয়েছিলেন তার মধ্যে দিয়ে 'সাবাস আটাশ' [১৩০৬]-এ কলিকাতা ও সহরতলীর পদত্যাগী আটাশ জন কমিশনারের কাজের তারিফ ক'রেন। অমৃতলাল মিউনিসিপ্যালিটি শ্রেণীর স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। তাই শুধু এই নক্সাটিতে নয় 'গ্রাম্য বিভ্রাট', এমন কি আরব্য উপন্যাস ভিত্তিক 'যাদুকরী'তেও তিনি মিউনিসিপ্যালিটি এনেছেন। অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গিটা তাঁর আধুনিক নয়, মিউনিসিপ্যালিটির 'কর'-এর দিকটাই দেখেছেন, তার কল্যাণকর দিক দেখেন নি।

'সাবাস বাঙালী' দীর্ঘতর রচনা। একে নাট্যকার সামাজিক নক্সা বলে আখ্যাত করলেও এটি প্রকৃতপক্ষে প্রচারধর্মী রাজনৈতিক রচনা। এতে সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ছবিই ফুটে উঠেছে। দেশে স্বদেশী আন্দোলন বিশেষ করে বিদেশী বর্জন এবং স্বদেশী গ্রহণ-এর যে আন্দোলন চলছিল তার প্রতি এই নক্সা-র অকুণ্ঠ সমর্থন আছে। নাট্যকার এই নাটকের চরিত্রগুলিকে উচ্চ আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ক'রে তাদের দিয়ে রাজনৈতিক বক্তৃতা করিয়েছেন। এই নাটকে সংযোজিত গানগুলিও একই উদ্দেশ্যে রচিত।

শুধু বিদেশী পোষাক নয়, বিদেশী রাজদত্ত খেতাব, বিলাতী শিক্ষা, গোলামী সব কিছুর বিরুদ্ধেই ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে বক্তৃতা ও গানের মাধ্যমে। যেমন :

পাঁশ চাপা দাও পাশ করাতে
পুড়িয়ে ফেল খেতাব

দায়ে পড়া রায় বাহাদুর পুড়িয়ে দাও খেতাব,
আর পরের পোষাক পোরে
করো না মুখ কালা।
ধিক ধিক বি-এ এম-এ পাশ
ডবল সেলাম দিয়ে গোলামীর আশ
ধিক সে মামলা, ধিক সে সামলা
ধিক সে আমলা—দেশের জঞ্জাল জ্বালা।

* * *

নেব দেশীটুকু বারাণসী বোলে
গাব বঙ্গমাতার জয়, জয় বাঙলা।

সাবাস বাঙালীতে বহু গান—ঘটকী, মুচি, চুড়িওয়ালী, বালক, ধোপানী, মহিলা—এদের গান নাট্যসংগীত নয়, সবার গানই পরিকল্পিত দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে।

অমৃতলালের প্রথম রচনা 'হীরক চূর্ণ' নাটক [১৮৭৫] ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে রচিত। বরোদা রাজ্যের বৃটিশ রেসিডেণ্টকে পানীয়ের সঙ্গে হীরকচূর্ণ মিশিয়ে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত গাইকোয়াড় মলহর রাও হোলকারকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করার ব্যাপার নিয়ে নাটকটি রচিত।

পঞ্চাঙ্কে গঠিত পূর্ণাঙ্গ এই নাটকটি। অমৃতলালের একমাত্র ঐতিহাসিক নাটক। তা-সত্বেও কিন্তু এটি সত্যিকার নাটক হয়ে ওঠেনি। এতে ঐতিহাসিক কাহিনী আছে ঠিকই, তথাপি নাটকীয় ক্রিয়া অনুপস্থিত। আগাগোড়া কতকগুলি ঘটনার পর্যালোচনা করা হয়েছে। শুধু সংলাপ ও দীর্ঘ স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে কাহিনীকে রূপদানের চেষ্টা হয়েছে। এমন কি একটি সংলাপ ছয় পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপ্ত [গাইকোয়ারের বিচার সভায় আসামী পক্ষের উকিলের বক্তৃতা]। গাইকোয়ারের প্রতি নাট্যকারের যথেষ্ট সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই জন্যই তাঁর স্বপক্ষে বক্তৃতা এবং নাট্যকারের নিজ আদর্শ প্রচারের জন্য দীর্ঘ সংলাপের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাতে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে সত্যি, কিন্তু নাটক সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটেছে। তা ছাড়া লক্ষণীয় যে, গাইকোয়াড়ের প্রতি নাট্যকার সহানুভূতিশীল হওয়া সত্বেও তদানীন্তন বৃটিশ কর্ণধার লর্ড নর্থব্রুকের

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। অর্থাৎ জনমতকে যেমন তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি, তেমনি রাজভক্তি বিসর্জন দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

জাত তুলে বিদ্রূপ করা অমৃতলালের একটা স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা। 'হীরক চূর্ণ' নাটকের কাহিনী বাংলা দেশের কোনও ঘটনা নিয়ে নয়। তবুও তিনি এই নাটকে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদককে 'জাত্যংশে তেলি' বলে অহেতুক কিছু বিদ্রূপ করেছেন। [৪।২]

: রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রচেষ্টা :

ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক লেখবার চেষ্টা রাজকৃষ্ণ রায়ও করেছেন; কিন্তু সার্থক ঐতিহাসিক নাটক তিনি রচনা করতে পারেন নি। তাঁর তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটক তিনখানি: 'রাজা বিক্রমাদিত্য' [১৮৮৪], 'বনবীর' [১৮৯৩] এবং 'লৌহ কারাগার' [১৮৭৮]। শেষোক্ত দু-খানি রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। তিনি কিম্বদন্তীকে মূলধন করে মীরাবাঈ নামেও একখানি নাটক লেখেন।

গিরিশচন্দ্রের অনুসরণেই রাজকৃষ্ণ নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। গিরিশচন্দ্রের মতো তাঁর নাটকেও ভক্তি-ভাবের প্রাবল্য। পৌরাণিক নাটক, গীতিনাট্য তিনি বেশ কয়েকখানি রচনা করেছেন এবং তার মধ্যে কয়েকখানি জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। তিনি এই ধরণের নাটকে ইতিহাসের বিষয়-বস্তুকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন সত্যি; কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার তা তাঁর ছিল না।

তিনি 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নাটকে ইতিহাসের ঐ ব্যক্তিপুরুষের নামটিই শুধু গ্রহণ করেছেন। এই নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনা কিছুই নেই—কয়েকটি অলৌকিক চরিত্র সম্বলিত এই নাটকটি সম্পূর্ণভাবে কিম্বদন্তীর ওপরে নির্ভর করে রচনা করা হয়েছে। দৃশ্যাবলীও সব এই মর্ত্যভূমিতে স্থাপিত নয়—'কৈলাস', 'মায়া স্বর্গ' প্রভৃতি স্থানে দৃশ্য সংস্থাপিত হয়েছে।

ধাত্রী পান্নার অপূর্ব স্বার্থ ত্যাগের কাহিনী নিয়ে 'বনবীর' রচিত। লেখক নাটকটিকে 'ভয়ানক-রৌদ্র-বীর-হাস্য-করুণ রসাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক' বলে চিহ্নিত করেছেন। এক নাটকে এত রকম রস সঞ্চার করার দিকে তাঁর দৃষ্টি

যতটা ছিল, নাটকের ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনায় ততটা দৃষ্টি ছিল না।

লৌহ কারাগার নাটকটিতেও ভক্তির আতিশয্য, ঐতিহাসিকতার দিকে দৃষ্টি নেই। এক কথায় বলা যায় যে, রাজকৃষ্ণ রায় ইতিহাসের কিছু পাত্র-পাত্রীকে নাটকে এনে স্থানে অস্থানে গান সংযোজিত করে রোমান্টিক পরিবেশ রচনার দ্বারা নাটকগুলি আকর্ষণীয় করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের নামে প্রধানতঃ কিম্বদন্তীর ওপর নির্ভর করলে এবং দেবতার লীলা খেলার প্রাধান্য বিস্তার করলে তা ভাল ভক্তি-রসাত্মক নাটক হতে পারে, প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক হয় না—এটা রাজকৃষ্ণ বুঝতে পারেন নি।

১। ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস': কলিকাতা [১৩৬৮]: পৃ. ৮৫-৬।

২। এই পাদটীকার জন্য পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

৩। মন্মথ রায়, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা', কলিকাতা [১৯৬৫] পৃঃ ১৬।

৪। ১৯৬৯-এর ৫ই অক্টোবর 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' এই তথ্য প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার ১০ই অক্টোবর [১৯৬৯] সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়: "বিসর্জন নাটকের যে পাণ্ডুলিপিটি সম্প্রতি লালবাজার পুলিশ দপ্তরে খুঁজে পাওয়া গেছে তার সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের একটি চিঠি এখনও ফাইলটির মধ্যে আছে। যে অফিসারটি পাণ্ডুলিপিটি পড়েছিলেন তিনি মন্তব্য করেছেন, 'কিছু কিছু অংশ আপত্তি-জনক'। [*সাম প্যাসেজেস্ আর অবজেকশনেব্‌ল্*] এগুলি বদলালে বা বাদ দিলে নাটকটি মঞ্চস্থ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

কবি সে পরিচ্ছেদগুলি নাকি বদলাতে বাধ্য হন। না করলে নাটকটি পুলিশ মঞ্চস্থ করতে দিতেন না। পাণ্ডুলিপিটি পাঠানো হয়েছিল ১৯২৬ সালে।"

৫। মন্মথনাথ ঘোষ: 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' পৃঃ ১০৯।

৬। গিরিশচন্দ্র ঘোষ: পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধ।

৭। ঐ

৮। Tod's *Annals and Antiquities of Rajasthan*. New Delhi Edition [1971], Vol I p. 108-115, 278

৯। ঐ p. 223-225

১০। ঐ p. 225

১১। ফকীর।……মনে হয় শাস্ত্রকারেরা যদি জান্‌তো যে, অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গীতার উপদেশ পাঠ করে ভারতবর্ষে হিন্দুরা মনুষ্যাকার গাছ পাথর হবে, সকল অত্যাচার সহ্য করবে, জড়ের ন্যায় বিচলিত হবে না, তা হলে বোধহয় শাস্ত্রগুলি পোড়াতেন এবং তুষানল করে প্রায়শ্চিত্ত করতেন [১।১]

১২। বৈষ্ণবী।……এই তো এ বাড়ীতে মুসলমানেরা আমোদ কচ্ছে। ঐ শোনো যন্ত্রের ধ্বনি শোনো, আকাশব্যাপী সুর লহরী শোনো, তলোয়ার হাতে আছে, যাও গিয়ে বধ করো।

১৩। হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে যে স্বরচিত কবিতা রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন তা এই :

> "ভারত কঙ্কাল আর কি কখন,
> পাইবে হায়রে নূতন জীবন ;
> ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া
> আর কি কখন দিবে সে জ্যোতি।"

১৪। Edward Thompson , *Rabindranath Tagore—Poet and Dramatist*, p. 30.

১৫। প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ; প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য ; পঞ্চম অঙ্ক, অষ্টম দৃশ্য দ্রষ্টব্য।

১৬। Edward Thompson, *'Rabindranath Tagore'—Poet and Dramatist'*, pp. 87-89.

১৭। কৈলাসচন্দ্র বসু, 'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত', কলিকাতা [১৮৭৬], পৃঃ ৩৯।

১৮। ঐ পৃঃ ৩৮।

১৯। রচনাবলী সংস্করণের ভূমিকা এবং 'জীবনস্মৃতি' দ্রষ্টব্য।



৫.

ঐতিহাসিক নাটকের জোয়ার

বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃভূমিকে বিদেশী শাসনের কবল থেকে মুক্ত করার যে ভাবনা বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিল তা জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে লর্ড কার্জনের শাসনকালে। ১৮৯৯-এর জানুয়ারীতে তিনি গভর্ণর জেনারেল হয়ে কলকাতায় আসেন। ১৯০৩-এর ৩ ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে, বঙ্গদেশ দু-ভাগ করে দু'টি প্রদেশ গঠন করা হবে। স্পষ্টই এই ঘোষণার দ্বারা বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজকে খুসী করার ব্যবস্থা হলো। কারণ, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ মুসলমান প্রধান অঞ্চল। ঐ অঞ্চল পূর্ববঙ্গ নামে পৃথক প্রদেশ রূপে গঠিত হলে সেখানে মুসলমানদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সংস্কৃতি বিকাশের সুবিধা ও সুযোগ মিলবে। কিন্তু বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের আসল মতলব ছিল ভবিষ্যতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে পাকাপাকি ভাবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং এই প্রচেষ্টায় তারা সাফল্যলাভ করেছিল একথা স্বীকার করতেই হয়।

কার্জন শাসিত আমলাতন্ত্রের এই পরিকল্পনায় ভারত সচিব সম্মতি দান করলেন এবং ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ হলো। বঙ্গচ্ছেদের এই দিনকে রাখীবন্ধনের দ্বারা উদ্‌যাপিত হলো। রবীন্দ্রনাথের সদ্য রচিত গান 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি পাড়ায় পাড়ায় গীত হলো। বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ক্রমশঃ স্বদেশী আন্দোলনের রূপ নিল অর্থাৎ স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জনের আন্দোলন সুরু হলো। জাতীয় জীবনে একটি উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হলো। কবিতায়, গানে, সাহিত্যে, স্বদেশী কথা প্রচারিত হতে থাকলো। দেশাত্মবোধের উন্মাদনা নাটক ও নাট্যশালাতেও প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করলো। ফলে, সৃষ্টি হলো দেশাত্মবোধক তথা ঐতিহাসিক নাটকের জোয়ার।

১৯০৩-এর ১৫ আগষ্ট ষ্টার থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের অভিনয় সুরু হয়েছিল। বঙ্গচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন

যখন স্বদেশী আন্দোলনের রূপ নিল তখন এই নাটক একটি মাত্র থিয়েটারে আর আটকে রইলো না, দেশের সর্বত্র এর অভিনয় চললো।

এই নাটক অবশ্য বঙ্গচ্ছেদ-এর পরিপ্রেক্ষিতে লেখা নয়, কিন্তু নাটকটিতে দেশাত্মবোধের প্রেরণা যথেষ্টই ছিল। সেই জন্যই দর্শকেরা এই সময়ে নাটকটিকে ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত করেছিল।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' রচনার ছ-বছর পরে রবীন্দ্রনাথ 'প্রতাপাদিত্য'কে নিয়ে তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনায় করেন। এই নাটক তাঁর ১৮৮৩-এ প্রকাশিত 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ।

: ঐতিহাসিক নাটক ও প্রতাপাদিত্য :

মোগল-পাঠানের যুদ্ধের একটি ক্ষীণ রেখা অবলম্বন এবং কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র সন্নিবেশিত ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'দুর্গেশনন্দিনী' [১৮৬৫] দিয়ে তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যের উদ্বোধন ক'রেন। এর পর ইতিহাসের পটভূমিকায় রোমান্স-এর ভিয়েন দিয়ে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স রচনা করতে করতে যখন তিনি তাঁর "প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস" 'রাজসিংহ'-এ পৌছলেন [১৮৮১], ঠিক সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'[১] রচনা করেন। এই উপন্যাসের কিছু চরিত্র ঐতিহাসিক এবং ঘটনাবলীর ওপরে ইতিহাসের ছায়াও পড়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি।

এই 'বৌঠাকুরানীর হাট কাহিনী অবলম্বন ক'রেই রবীন্দ্রনাথ ১৯০৯-এ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনা করেন। পরে আবার এই 'প্রায়শ্চিত্ত' কিছু পরিবর্তিত হ'য়ে 'পরিত্রাণ' [১৯২৯] নাটক রচিত হয়। এই নাটক দু-টির একটিও তাই প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক হ'য়ে ওঠেনি। "দু'য়েরই [অর্থাৎ বৌঠাকুরানীর হাট ও প্রায়শ্চিত্ত—লেখক] ঘটনা বিন্যাস ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে বিধৃত। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্য কোলাহলময় রঙ্গভূমি ছায়ার মত অস্পষ্ট, ইতিহাস একটা অর্থহীন আশ্রয় মাত্র। ইতিহাসের জীবন ও উদ্দীপনা উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার কোনও পরিচয় কোথাও নাই।"—[ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা']। তবে নাটকের ক্ষেত্রে নতুনত্ব হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে এ-যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের ছায়াপাত ঘটেছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীর হিসাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রতাপাদিত্য চিত্রিত হয়েছেন অত্যাচারী শাসকের প্রতিনিধিরূপে। নাটকের কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজিয়েছেন।

এই নাটক যখন তিনি রচনা করেন তার পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে এবং তার সংবাদ এদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০১-এ অনুষ্ঠিত কলিকাতা কংগ্রেসে[২] গান্ধিজী যোগ দেওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজীর আন্দোলন সম্পর্কে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। ১৯০৬-এর ১১ই সেপ্টেম্বর ট্রানস্‌ভালে এক জনসভায় গান্ধিজী সত্যাগ্রহের নীতি ঘোষণা করেন। তার পর থেকে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ [Passive Resistence]-এর কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও সেদিনের ভারতবর্ষ—একই মানবাত্মার দুই লাঞ্ছিত রূপ। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়রা বৈদেশিক শাসনে নিপীড়িত, আর ভারতবর্ষে ভারতবাসী নিজ বাসভূমিতেই শোষিত ও অত্যাচারিত। গান্ধিজী ভারতে ফিরে দক্ষিণ আফ্রিকার মত এখানেও সত্যাগ্রহের মন্ত্রে জনগণকে দীক্ষিত করার আগে ভারতবাসীরা বোমা-পিস্তল নিয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত নাটককে তাই এদেশে গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্কেত-ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা চলে।

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য। কোনও দয়ামায়া তাঁর মধ্যে নেই। এই প্রজাপীড়ক রাজা যুবরাজ উদয়াদিত্যকে মাধবপুর পরগণার ভার অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু পরদুঃখকাতর উদয়াদিত্য প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ে অসমর্থ হওয়ায় প্রতাপাদিত্য তাঁর কাছ থেকে ঐ পরগণার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করলেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে মাধবপুরের প্রজারা যশোরে এসে যুবরাজ উদয়াদিত্যকে ফিরিয়ে নিতে চাইলো। উপন্যাসে এই চরিত্র ছিল না, নাটকে এই চরিত্র নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ধনঞ্জয়ের কার্যকলাপের মধ্যে গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ছায়া পড়েছে। সে প্রজাদের নায়ক; সে প্রজাদের

ক্ষেপিয়ে তোলে, তাদের মধ্যে চেতনার সৃষ্টি করে, কিন্তু অহিংস তার আন্দোলন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার নির্ভীক অভিযান, অত্যাচারীর সামনে নৈতিক শক্তি নিয়ে যে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়—নির্যাতনের মধ্যেও তার সত্যনিষ্ঠা অবিচল। এমন কি তার খাজনা বন্ধের আন্দোলন, অত্যাচারকে নৈতিক শক্তিতে মোকাবিলা করার যে শিক্ষা তা গান্ধিজীরই শিক্ষা। এই ধনঞ্জয়কে প্রতাপাদিত্য বন্দী করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে ; তার নৈতিক শক্তির কাছে রাজা পরাজয় স্বীকার করেছেন।

প্রতাপাদিত্য যুবরাজ উদয়াদিত্যকে বন্দী করেছেন, কারণ প্রজারা তাঁর বদলে যুবরাজকেই রাজা করতে চেয়েছে। বসন্ত রায় কৌশলে যুবরাজকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন। কিন্তু তাঁকে আবার বন্দী করা হয়েছে এবং সিংহাসনের অধিকার ত্যাগ করে কাশী যাত্রার সঙ্কল্প ঘোষণা না করা পর্যন্ত তিনি রেহাই পাননি।

প্রতাপাদিত্য তাঁর খুল্লতাত বসন্ত রায়কে বধ করার জন্য দুইজন পাঠানকে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু পাঠানদ্বয় রাজাকে বধ করেনি। অন্যদিকে উদয়াদিত্যকে কারাগার থেকে মুক্ত করায় প্রতাপ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন এবং শেষ পর্যন্ত কৃতঘ্ন মুক্তিয়ারকে দিয়ে তাকে বধ করিয়েছেন।

প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিভার বিয়ে হয়েছিল চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে। কিন্তু রামচন্দ্র ছিলেন অপদার্থ। তাই প্রতাপ তাঁর ওপরে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি কন্যাকে পতিগৃহে যেতে দিতেন না। বসন্ত রায়ের ইচ্ছায় রামচন্দ্র যশোরে নিমন্ত্রিত হন। রামচন্দ্রের এক ভাঁড় প্রতাপের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে প্রতাপের পত্নীর সঙ্গে রসিকতা করার অপরাধে প্রতাপ রামচন্দ্রকে হত্যা করার জন্যে লোক নিযুক্ত করেন ; কিন্তু উদয়াদিত্যের চেষ্টায় রামচন্দ্র প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হন।

উদয়াদিত্যের পত্নী সুরমাও প্রতাপাদিত্যের রোষ-বহ্নি থেকে নিস্তার পান নি ; প্রতাপ তাঁকে প্রাসাদ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন ; কারণ তাঁর মত দয়াবতী মহিলাকেও তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। প্রতাপের আদেশে রাজমহিষী এক পরিচারিকার সাহায্যে সুরমাকে বিষপান করিয়ে তার প্রাণ সংহার করেন।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটিতে এইভাবে প্রতাপাদিত্য শুধু একজন অত্যাচারী

শাসক নয় রীতিমত নিষ্ঠুর হত্যাকারীর ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর মধ্যে কোনও মানবিক বোধ নেই। তা ছাড়া বৃহত্তর ইতিহাসের পটভূমিকাতেও তাকে স্থাপন করা হয় নি।

'প্রায়শ্চিত্ত'কে "রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক ও রূপক নাট্যরচনার যুগের ভূমিকা" হিসেবে[৩] কোনও কোনও সমালোচক গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ এর মধ্যে মিষ্টিসিজম এবং সাঙ্কেতিকতারও সন্ধান পেয়েছেন। রাজশক্তি যদি স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে তবে সে শক্তিই চরম নিষ্ঠুরতার মধ্যে পরিণতি লাভ করে —এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রতাপাদিত্য যদি উপলক্ষ হয় তবে অন্য কথা; কিন্তু ইতিহাসের অতি পরিচিত চরিত্র নিয়ে সাঙ্কেতিক বা রূপক নাটক রচনায় অসুবিধা আছে। তাই অন্য কোনও রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকে ইতিহাসের কোনও পরিচিত চরিত্র রবীন্দ্রনাথ আনেন নি, এমন কি যেখানে রাজা আছে, সেখানেও সেই রাজাও একজন ছাড়া সবই নামহীন রাজা ['রাজা', 'রক্তকরবী,' 'শাপ-মোচন', 'ডাকঘর' প্রভৃতি]।

প্রকৃতপক্ষে 'প্রতাপাদিত্য'কে নিয়ে ঐতিহাসিক নাটক লেখারই অনেক অসুবিধা। কারণ প্রতাপাদিত্য রীতিমত বিতর্কিত চরিত্র। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলা দেশের ইতিহাস'-এ [দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭৩, পৃঃ ২১৭] প্রতাপাদিত্যের জীবনের নানা কাহিনী উত্থাপিত করে মন্তব্য করা হয়েছে: "প্রতাপাদিত্য অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোনও যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঙালী জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘল সুবাদারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যাঁহারা বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন—ঈশা খাঁ, উসমান খাঁ প্রভৃতি—তাঁদের অধিকাংশই মুসলমান।" পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রতাপাদিত্যকে দস্যুর চেয়ে বেশী কিছু মনে করেন নি এবং তাঁর দেশপ্রেমকে অস্বীকার করেছেন। P. Leo Faulkner প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে বলেছেন: "He was a brave man, that is certain sure, but in my considered opinion he was a buccaneer on filibustering intent rather than a patriot actuated by motives disinterestedly pure."[৪]

অন্যদিকে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ-এর 'বঙ্গের বীর পুত্র' হারাণচন্দ্র রক্ষিতের

'বঙ্গের শেষ বীর' প্রভৃতি গ্রন্থে বীর প্রতাপাদিত্যের চরিত্রই চিত্রিত হয়েছে। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্রও প্রতাপকে বঙ্গের শেষ বীর বলেই অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন: "তেজস্বিতা, স্বধর্মনিষ্ঠা ও স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা তাঁকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।"

যে প্রতাপাদিত্য আত্মরক্ষার জন্য ১৪টি দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, নিয়মিত সেনাবাহিনী [পদাতিক, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ], এমন কি নৌ-বাহিনী পর্যন্ত গঠন করিয়াছিলেন তাঁকে 'দস্যু' বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া একাধিক যুদ্ধে তিনি অবতীর্ণ হন, তার মধ্যে দুইটি যুদ্ধে সন্ধি স্থাপিত হয়। শেষ যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছিল বলেই তিনি বীর নন—একথাও বলা যায় না। তবে 'দেশ প্রেম' বলতে প্রকৃত যা বুঝায় তা হয়তো প্রতাপাদিত্যের ছিল না। তিনি মোগল রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে বঙ্গভূমিতে নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। এর জন্য তিনি পাঠানের সাহায্য নিয়েছেন এবং পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি ও সৈনিকদের ব্যবহার করেছেন।

প্রতাপাদিত্যকে দেশপ্রেমিক জাতীয় বীর হিসাবে নাটকে প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ নাটক রচনার সময়ে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধের জোয়ার বইছিলো। এই আবহাওয়ায় মোগলের সঙ্গে হিন্দু প্রতাপাদিত্যের লড়াইকে স্বাধীনতার যুদ্ধ হিসাবে প্রতিভাত করানো হয়। এ দিক থেকে একটা সুযোগও ছিল। কারণ, ১৫৭৮-এর শেষ ভাগ থেকে তিনি দু-তিন বছর আগ্রায় মোগল রাজপ্রাসাদে অবস্থান করেন ঐ সময়ে রাণা প্রতাপের বীরত্ব কাহিনী রাজধানীতে রীতিমত ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই কারণে সম্ভবত ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, প্রতাপাদিত্য রাণা প্রতাপের দেশপ্রেমের দ্বারা বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের মুখে যে ক্ষীরোদপ্রসাদ সর্বপ্রথম প্রতাপাদিত্যের কাহিনীকে নাট্যরূপ দান করলেন এবং প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীররূপে চিত্রিত করার চেষ্টা করলেন, অথচ তিনিও প্রতাপাদিত্যের দেশপ্রেমের ঐ সম্ভাব্য উৎসটির সদ্ব্যবহার করেননি।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঘটনাবহুল নাটক 'প্রতাপাদিত্য'-এ রবীন্দ্রনাথের নাটকের চেয়ে ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল অনেক স্পষ্ট। তবুও নাটকটি রোমান্সধর্মী, অলৌকিক ঘটনা সমন্বিত [৩।২] এবং ভক্তিরস মিশ্রিত। এই ভক্তিরস জাগ্রত

করার জন্যে নাট্যকার গান হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলী, শ্যামাসঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। নাটকটি প্রধানত কিম্বদন্তীর ওপরে নির্ভর করে রচিত। নাট্য-রচনার যুগে দেশাত্মবোধের আবহাওয়ায় নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু পুরোপুরি দেশাত্মবোধক নাটক এটি নয়। নাটকের মধ্যে অবশ্য মাঝে মাঝে স্বদেশানুরাগের কথা আছে—কিন্তু এর সামগ্রিক আবেদনে দেশাত্মবোধ ফুটে ওঠেনি। একদিকে হিন্দু দেবী যশোরেশ্বরীর প্রভাব, অন্যদিকে সমসাময়িক চিন্তায় হিন্দু-মুসলমান মিলন কামনা :

> প্রতাপ॥ ভাই সব! তোমরা সবাই মিলে মা যশোরেশ্বরীর যশোরের সীমা বৃদ্ধি কর। হিন্দু-মুসলমান—এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত, এক স্নেহ-রস-সিঞ্চিত। বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃসেবা কার্যে প্রতিযোগিতায়, বার্দ্ধক্যে আত্মীয়তায়—এস ভাই সব—আমরা একপ্রাণে, একমনে মায়ের দুঃখ দূর করি। পরস্পরের সহায়তায় বঙ্গে মহাযশোহরের প্রতিষ্ঠা করি। মাতৃসেবা-কার্যে আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, সেখ নই, পাঠান নই—বঙ্গ সন্তান। [৩।৩]

ক্ষীরোদপ্রসাদ মঞ্চসাফল্যের কথা মনে রেখেই তাঁর নাটক রচনা করেছেন। তার ফলে নাটকে একই সঙ্গে ভক্তিরস আর দেশপ্রেমের ভিয়েন চাপিয়েছেন। তিনি যে ভাবে নাটকের কাহিনী সাজিয়েছেন তাতে নাটকটির নাটক হিসাবে সার্থক হওয়ার সুযোগ ছিল, যদি তিনি ভক্তির দিকটা বাদ দিয়ে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় একটি দেশাত্মবোধক নাটক সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি।

অবশ্য কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা বেশ নাটকীয় ঘটনাসংস্থানের মধ্য দিয়ে তিনি পরিস্ফুট করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের হত্যা দৃশ্যটির [৫।৪] উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নাটকেই দেখি প্রতাপ একজন কৃতঘ্ন লোক নিযুক্ত ক'রে বৃদ্ধকে হত্যা করেছেন। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে প্রতাপ নিজেই বসন্ত রায়কে হত্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'গঙ্গাজল' [এক অর্থে বসন্ত রায়ের তরবারি] নিয়ে ভ্রান্তি সৃষ্টি করে ঘটনাটিকে বেশ নাটকীয় করে তোলা হয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ ঘটনাটি রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' [১৮০১] থেকে গ্রহণ করেছেন।[৫] এই বইটিতে চিত্রিত প্রতাপাদিত্য চরিত্র অনুসরণ করার ফলেই নাটকটিকে সার্থক ট্র্যাজেডী করে তোলা সম্ভব হয়

নি। বসন্ত রায়ের প্রতি প্রতাপের বিদ্বেষ আগাগোড়াই আছে; সুতরাং হত্যাটা মুহূর্তের ভ্রান্তি নয়।

প্রতাপের পিতা বিক্রমাদিত্যের চরিত্রটিও রীতিমত লঘু চরিত্র হিসেবে আঁকা হয়েছে। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও প্রতাপাদিত্য নাটকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের হাস্যাস্পদ চরিত্র নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।[৬]

ভবানন্দ মজুমদারের বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ; ইনি মানসিংহ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েও তিরস্কৃত হয়েছেন: "আমিও হিন্দু কুলাঙ্গার, কিন্তু তুমি আরও নীচ—নেমক হারাম। যাও—দূর হও, এ মুখ আর দেখিও না।" [৫।৬]।

: ক্ষীরোদপ্রসাদের তিনটি দেশাত্মবোধক নাটক :

যে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় ক্ষীরোদপ্রসাদ 'প্রতাপাদিত্য' নাটক রচনা করেন, সেই প্রেরণাতেই তিনি রচনা করেন 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' [১৯০৭] এবং 'বাংলার মসনদ' [১৯১০]। রচনাকালের দিক থেকে 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রথম হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাংলার মসনদ-এর পরিশিষ্ট। যে অভিশপ্ত বাংলার মসনদে আলিবর্দী এসে বসেছিলেন, সেই মসনদের উত্তরাধিকারী তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে নিহত হলেন। কিন্তু সেই দেশদ্রোহীরা কী মূল্যে তাদের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছে তারই ইতিহাস 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত'।

নাটকটির মুখবন্ধে নাট্যকার লিখেছেন: "ইহার ইতিহাসাংশে বিহারীবাবুর 'ইংরাজের জয়', শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের 'মুরশিদাবাদ কাহিনী' ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'মীরকাশিম' নামক গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।" এই মুখবন্ধ থেকেই আমরা জানতে পারি যে, জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারীলাল সরকারের পলাশী প্রবন্ধ পাঠ করে ক্ষীরোদপ্রসাদের সিরাজ চরিত্র অবলম্বনে একখানি নাটক লেখার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষ সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে নাটক লিখে ফেলায় [১৯০৬-এ সিরাজদ্দৌলা রচিত] তিনি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত রচনা করেন।

আলিবর্দী খানের বাংলা অধিকারের কাহিনী নিয়ে 'বাংলার মসনদ' রচিত। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজেই লিখেছেন, "মদীয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত

নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় প্রণীত ইতিহাস হইতে এই নাটক রচনার সাহায্য লইয়াছি।" নাট্যকার প্রকৃতই একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনার চেষ্টা করেছেন। প্রথম সংস্করণে ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে যে ত্রুটিগুলি ছিল পরবর্তী সংস্করণে লেখক সেগুলির সংশোধন করেছেন।

প্রকাশকালের দিক থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' [১৯০৭] 'বাংলার মসনদ' [১৯০৭]-এর পূর্ববর্তী রচনা হলেও শেষোক্ত নাটকটিই প্রথমোক্ত নাটকের ভূমিকা স্বরূপ। কারণ 'বাংলার মসনদ'-এর ঐতিহাসিক পশ্চাদপট পূর্ববর্তীকালের। নাট্যকার বাংলার সিংহাসনকে অভিশপ্ত সিংহাসন বলতে চেয়েছেন। আলোচ্য নাটকের শেষ দৃশ্যেও তাই সরফরাজ খান আলিবর্দীকে বলছেন: "আলিবর্দী! তোমার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি স্বরূপ বাংলার মসনদ তোমাকে দান করলুম।" সত্যিই আলিবর্দী খান এবং হাজী আহমদ এই দুই ভাই বিশ্বাসঘাতকতার পথে নবাব সরফরাজ খানকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলার মসনদ অধিকার করেন।

ইতিহাসে আমরা দেখি যে নবাব মুর্শিদকুলী খানের কোনও পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান মুর্শিদকুলীর দৌহিত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী সরফরাজ খানকে না মেনে নিজেই বাংলা ও ওড়িশার সুবাদারের পদ অধিকার করেন [১৭২৭]। আলিবর্দী, তাঁর ভাই হাজী আহমদ, রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী আলমচাঁদ এবং ধনী জগৎশেঠ ফতেচাঁদ তাঁর সভায় খুব প্রতিপত্তি লাভ করে। আলিবর্দী খান বিহারের প্রথম নায়েব নাজির হন। শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাব হলেন। এই নবাব একেবারে অপদার্থ ও বিলাসী হওয়ায় রাজ্যের শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং নানা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠতে থাকে। এই সুযোগে হাজী আহমদ ও আলিবর্দী বাংলার মসনদ দখলের চেষ্টা করেন। এতে সহায়তা করেন জগৎ শেঠ ও আলমচাঁদ। মুর্শিদাবাদ দরবারের বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে সরফরাজকে হাজী আহমদ স্তোকবাক্যে সন্তুষ্ট রাখেন; অন্যদিকে আলিবর্দী পাটনা থেকে সৈন্য নিয়ে বাংলার দিকে অগ্রসর হন। মিথ্যা আশ্বাসে নবাবকে ভুলিয়ে রেখে শেষে হাজী আহমদ আলিবর্দীর সঙ্গে যোগ দান করেন। সরফরাজ এবার নিজেই সৈন্যসহ অগ্রসর হলেন। কিন্তু

গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন। আলিবর্দী মুর্শিদাবাদ অধিকার করলেন।

ইতিহাসের এই ঘটনা গ্রহণ করলেও নাট্যকার কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র-গুলিকেও যথাযথভাবে রূপায়িত করতে পারেন নি। নাটকের প্রধান চরিত্র সরফরাজ খান এবং তিনিই নাটকের নায়ক। বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটেছে তাঁর। কিন্তু তবুও তিনি সার্থক ট্র্যাজেডীর নায়ক হয়ে উঠতে পারেন নি। ইতিহাসের এই চরিত্রটিও তেমন হওয়ার উপযুক্তও ছিলো না। ইতিহাসে আমরা তাঁর যে পরিচয় পাই তা এই:

"While observing merely the external formalities of religion Sarfaraz was a man of low morals, too much addicted to the pleasures of the harem, and so he whiled away most of his hours in the company either of self-seeking and idle theologians or of the 1500 women of his harem. Not to speak of his want of strength of his character and administrative genius, he lacked all the essential qualities needed for the ruler of a state and developed a foolish simple mindedness unbecoming of the position he held:" [History of Bengal, Vol II, P. 436]

এই রকম একজন শাসকের রাজত্বে বিশৃঙ্খলা ঘটবে এবং নানা ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। সরফরাজের সিংহাসন এবং প্রাণ দুই-এ গেল তার অপদার্থতার জন্য। অথচ নাটকে তার এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য একেবারেই অনুপস্থিত।

নবাবের সম্পর্কে হাজী আহমদ সার্টিফিকেট দিয়েছেন: "কিন্তু সরফরাজকে আয়ত্তে আনা দূরে থাক—এখনও ভাল করে চিনতে পারলুম না। বহুমূল্য 'নজর নবাবের পায়ের কাছে ধরলুম, নবাব মর্যাদার সহিত ফিরিয়ে দিলে, ছুঁলে না।...শ্রেষ্ঠ রূপের প্রলোভনে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি, অকৃতকার্য হয়েছি।" [১।১]

নাট্যকার সরফরাজের নৈতিক অধঃপতনের কথা অস্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু আগাগোড়া তাঁকে একটি মহান্ চরিত্র হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। নবাবের হারেম সম্পর্কে ইতিহাস-ভিত্তিক প্রচলিত ধারণাকে

নাট্যকার নস্যাৎ করে দিয়েছেন। যে সরফরাজের হারেমে ১৫শত নারী ছিল সেই হারেমে নবাবের আচরণ বিস্ময়কর। হারেমের রীতি অনুসারে নিত্য নতুন নারী এখানে এসেছে। কিন্তু কোনও নারী পরিণত হয়েছে নবাবের 'ভগিনী'তে, আবার কোন নারী নবাবের মহত্বে অপমানিত হয়ে, প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গেছে হারেম থেকে।[৮] নবাব ছদ্মবেশে আর্ত রমণীকে উদ্ধার করেছেন, তাঁকে মাতৃ সম্বোধন করেছেন; বাংলার বিলীয়মান ভাগ্যলক্ষ্মীর দিকে চেয়ে হা-হুতাশ করছেন। এক কথায় নবাব একজন আদর্শ পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন নাট্যকারের লেখনীতে।

সরফরাজ খানের অন্তর্দ্বন্দ্বই এই নাটকের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু ঐ অন্তর্দ্বন্দ্বটাই ইতিহাসের ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাতে তীব্র হয়ে ওঠেনি। বরং তিনি ধার্মিক ও অনেকটা উদাসীন হওয়ায় ট্র্যাজিক চরিত্রের সংগ্রামী রূপ গ্রহণ করতে পারেননি। যুদ্ধের পরিণতি ঘটবার আগেই তিনি আলিবর্দীকে আহ্বান জানিয়েছেন: "এস আলিবর্দী। বাংলার মসনদ নিয়ে আমি বিপন্ন হয়েছি। তুমি এসে আমায় বিপন্মুক্ত কর। ধর্ম ফেলে এস না, মুসলমানদের অমূল্য অধিকার ফেলে এস না। আমি বাংলার মসনদ তোমাকে দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি।" [৪।৬

আসলে নাট্যকারের নাটক রচনার পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল তা হচ্ছে এইটাই দেখানো যে, বাংলার মসনদের উপর ভগবানের অভিশাপ রয়েছে। এই মসনদে যে আরোহণ করেছে তারই জীবন অভিশপ্ত, কারণ এই মসনদ ঘিরে লোভী, কুচক্রী, বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র চির-সঞ্চিত। ইতিহাসের যে কাহিনী নাট্যকার গ্রহণ করেছেন তাতে আলিবর্দীর ভূমিকা রীতিমত সক্রিয়। কিন্তু নাটকে এই সক্রিয় ভূমিকা তাঁর নেই। তাঁর ভাই হাজী আহমদই যেন ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক এবং নাটকের সে খল [vilain] চরিত্রও বটে।

নাটকে অকারণে বেশ কিছু অনৈতিহাসিক চরিত্র আনা হয়েছে। এগুলির মধ্যে এমন চরিত্র আছে যা আগাগোড়া রহস্যময়—যেমন মালেকা চরিত্র। নাটকীয় ভাবেই সে নাটকীয় কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করেছে [২।৬]। নাটকের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত তার উপস্থিতি; কিন্তু সে আগাগোড়াই রহস্যময়ী। এ-ধরণের চরিত্র নাট্যকারের রোমান্টিক মনেরই ফসল।

মহারাজ নন্দকুমারের বিষয় অবলম্বনে ক্ষীরোদপ্রসাদ একখানি নাটক রচনা

করেন। নাটকটির নাম নন্দকুমার [১৯০৮]। ইতিপূর্বে এই বিষয় অবলম্বনে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 'নন্দকুমারের ফাঁসি' [১৮৮৬] নামক একখানি নাটক রচনা করেন এবং এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, রচনাকালের পার্থক্যের জন্যেই এই দুটি নাটকের বক্তব্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে নন্দকুমারের স্বদেশ প্রেমিক রূপটি ফুটে উঠেছে। এতে ইতিহাসের ঘটনার চেয়েও দেশাত্মবোধের প্রেরণা বেশী। বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় রচিত এই নাটকে নন্দকুমার একজন জাতীয় বীর এবং তাঁর মধ্য দিয়ে "নাট্যকার বাঙালীর সৎ সাহস ও সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জনের সমুন্নত আদর্শ প্রচার করিয়াছেন"।[৯]

এই সব নাটক যখন লেখা হয়, তখন নাট্যকারের মূল লক্ষ্য ছিল দেশাত্মবোধ প্রচার। কারণ স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ায় দর্শক-মন দেশাত্মবোধের আদর্শকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত ছিল। তাই ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা ছেড়ে ইতিহাসের যে কোনও সম্ভাব্য সূত্র অবলম্বন করেই নাটক লেখা হচ্ছিল। আবার একই কারণে বিদেশী সরকার এই ধরণের নাটক সহ্য করতে পারছিলেন না। এই 'নন্দকুমার' নাটকটিও তাঁরা নিষিদ্ধ করেন।

: দেশভক্তি ও রাজভক্তি :

১৯০৫-এর বঙ্গচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে স্বদেশী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করায় দেশাত্মবোধ ছড়িয়ে পড়ছিল, দেশের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। এই উত্তেজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ প্রভৃতি কবিরা স্বদেশী সংগীত রচনা করে দেশকে উদ্দীপিত করলেন। স্বভাবতই নাটকেও এই দেশাত্মবোধের তরঙ্গ দেখা গেল। ঐতিহাসিক নাটক অবলম্বনে তো বটেই, সামাজিক নাটকেও দেশাত্মবোধক সংলাপ শোনা যেতে লাগলো।

এখানে আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সব ক্ষেত্রে নাট্যকারেরা দেশাত্মবোধের দ্বারা নিজেরা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন কিনা সন্দেহ। কারণ একই নাট্যকারের মধ্যে দেশভক্তির সঙ্গে রাজভক্তিও প্রবাহিত। আবার বঙ্গভঙ্গের যুগে এক নাট্যকার যখন তাঁর নাটকে দেশাত্মবোধক সংলাপ জুড়ে আসর জমাচ্ছেন, তখন অন্য নাট্যকার বৃটিশ রাজপুরুষের বন্দনা গান গেয়ে নাটক

রচনা করছেন। ব্যবসায়ের স্বার্থে সেদিনের নব চেতনা প্রাপ্ত মানুষের দেশাত্মবোধকে অস্বীকার করে নাটক লেখা কঠিন ছিল; আবার সরকারী দাক্ষিণ্য লাভের আশায় ব্যবসায়িক মঞ্চ থেকে বিদেশী সরকারের গুণগান না করেও তাঁরা পারছিলেন না।

আবার দেশাত্মবোধক নাটক লিখলে বা নাটকে দেশাত্মবোধক সংলাপ থাকলে তা বাজেয়াপ্ত হবারও ভয় ছিল। সাধারণ কিছু দেশাত্মবোধক সংলাপের জন্য ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' নামক একটি নাটক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' [১৯০৮] ঐতিহাসিক নাটক নয়। এটিকে বরং বলা যায় রূপক নাটক। কিন্তু এই নাটকটি সরকার নিষিদ্ধ করেন। কারণ এতে কিছু দেশাত্মবোধের কথা ছিল। অথচ সেই দেশাত্মবোধ কিন্তু তেমন উগ্রও ছিল না। যেমন:

> চন্দ্রবিন্দু॥ যখন সকল জাতিই বিদ্যুৎ বেগে উন্নতির পথে চলেছে, তখন আমরাই কেবল আমাদের হট্টমালাকে নিয়ে শ্মশানের আগুনে ঝাঁপ দেব! না, ফিরি! ফেরবার বল কি পাব না? তবে অন্যে পায় কি করে? কে দেয়—কোন্ অমৃত প্রস্রবিনী থেকে শক্তি স্রোত প্রবাহিত হয়? শুনেছি—তিনিই শ্মশানেই বাস করেন। তা হ'লে শ্মশানেশ্বরী! আমাকে ফিরিয়ে দাও।

এই অপ্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম দেশপ্রেমের কথাবার্তাও বিদেশী সরকার সেদিন সহ্য করতে পারেনি।

: রাজভক্তি মূলক নাটক :

আগেই বলা হয়েছে যে, বঙ্গচ্ছেদের যুগে নাট্যকারদের জনসাধারণের দেশাত্মবোধের উন্মাদনাকে শ্রদ্ধা না করে উপায় ছিল না। তাই দেখা যায় নটাধ্যক্ষ ও অভিনেতা অমরেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত, যিনি ব্যবসায়ী মঞ্চের জন্যে পৌরাণিক নাটক ও গীতি নাট্য রচনা করেছেন, তিনিও 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' [১৯০৫] নামে এক নাটক লিখে ফেললেন। অবশ্য সেই সঙ্গে রাজভক্ত দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে তিনি 'এস যুবরাজ' [১৯০৫] নামেও একখানি নাটক রচনা করেন।[১০] এই সময় ইংলণ্ডের যুবরাজ 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্'

[পরে পঞ্চম জর্জ] ভারত সফরে এসেছিলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই এই নাটকটি লেখা হয়।

এর আগে গিরিশচন্দ্র ঘোষও তিনখানি রাজভক্তিমূলক গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। 'হীরক জুবিলী' [১৮৯৭], 'অশ্রুধারা' [১৯০১] এবং 'শাস্তি' [১৯০২]। বৃটীশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ায় ডায়মণ্ড জুবিলী উৎসব উপলক্ষে 'নটের রাজভক্তি-উপহার স্বরূপ' 'হীরক জুবিলী' গীতিনাট্য রচিত হয়। ভিক্টোরিয়ার পরলোক গমন উপলক্ষে রচিত হয় 'অশ্রুধারা'। বুয়র যুদ্ধ অবলম্বনে 'শাস্তি' রূপক গীতিনাট্যটি রচিত হয়।

রাজভক্তি প্রদর্শনের কোনও সুযোগ গিরিশচন্দ্র ছেড়ে দেননি। বৃটীশ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এদেশের বৃটীশ শাসক এবং তাঁদের এদেশীয় সহযোগী, সমর্থক ও স্তাবকেরা উৎসবের আয়োজন করেন। গিরিশচন্দ্রও ষ্টার থিয়েটারে তাঁর 'হীরক জুবিলী' মঞ্চস্থ করে 'ভিক্টোরিয়া মহোৎসব'-এ সামিল হন। এই নাটকে স্বভাবতই এমন স্তাবকতা আছে, তা যে কোনও পরাধীন দেশের নাট্যকার লিখতে পারেন—একথা ভাবতেও বিশ্রী লাগে। যেমন: "হ্যাঁ হে, তুমি না বল যে সাদা কালো প্রভেদ আছে। কিন্তু এই উপযুক্ত সময়, আজ এস আমরা জগতকে দেখাই, যদিচ আমরা বিজিত, কিন্তু রাজভক্তিতে আমরা তাঁর শ্বেত সন্তান থেকে ন্যূন নই।" এমন কি গিরিশচন্দ্র 'দেবীপূজা করেও ভারতের মান' রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। [১ম দৃশ্য]।

এই রাজভক্তি আরও করুণভাবে উৎসারিত হয়েছে ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে। 'অশ্রুধারা'তে তিনি লিখেছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া "ঈশ্বরের প্রিয় দুহিতা, পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ভগবৎ প্রেরিতা।" [দ্বিতীয় দৃশ্য]। এই নাটিকা শেষ হয়েছে সপ্তম এডওয়ার্ড-এর স্তাবকতা দিয়ে ; কারণ ভিক্টোরিয়ার পরে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি লিখেছেন: "মহারাজ, মহাসম্রাট! আমরা যথার্থই তোমার কৃপার পাত্র।"...ইত্যাদি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে [১৮৯৯-এ] দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদের সঙ্গে ইংরেজদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, অর্থাৎ বুয়রদের স্বাধীনতা হরণের যুদ্ধ। ১৯০২-এ বুয়র সেনানায়কগণ আত্মসমর্পণ করেন এবং ইংরেজ ও বুয়রদের মধ্যে 'শান্তি' স্থাপিত হয়। সোজা কথায় বুয়ররা পরাক্রান্ত

সাম্রাজ্য শক্তির কাছে স্বাধীনতা হারায়। একে 'শান্তি' বলা চলে না এবং কোনও পরাধীন দেশের নাট্যকার একে 'শান্তি' আখ্যা দিয়ে নাটক লিখবেন এবং সে নাটকে দেখাবেন যে, বুয়রদের দেশ সাম্রাজ্যবাদের অধিকারে যাবার ফলে দেশের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য-এর পথ উন্মুক্ত হলো, শান্তি ফিরে এলো—এটা ভাবতে বেদনা বোধ হয়। ব্যাপারটা কিন্তু তাই ঘটলো। নাটকে এই সব দেখিয়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বুয়র রমণীদের দিয়ে রাজবন্দনা করালেন গানের মাধ্যমে :

দয়াগুণ গাহিছে সসাগরা মেদিনী
দূর কোলাহল—শান্তি বিরাজিনী
জয় জয় জয় সপ্তম এডওয়াডের জয়।......ইত্যাদি

অবশ্য এই সঙ্গে ভাবতে ভাল লাগে এবং মনে গর্বও জাগে যে, বুয়র যুদ্ধে নিয়ে যখন গিরিশচন্দ্র ইংরেজ-রাজভক্তিমূলক নাটক লিখছেন সেই সময় আমাদেরই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় [নৈবেদ্য গ্রন্থের ৬৪ এবং ৬৫ নং কবিতা] বুয়রদের স্বাধীনতা লুপ্ত হওয়ায় শুধু দুঃখ প্রকাশ নয়—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে প্রচণ্ড ধিক্কার দিচ্ছেন :

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতা নাগিণী
তুলেছে কুটীল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।...

এই পার্থক্য নাট্যকার ও কবির মধ্যে পার্থক্য নয় দু'টি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। তবে এই নাট্যকারকেও তিন বছরের মধ্যেই দেশাত্মবোধক নাটক

রচনা করতে হয়। তথাপি মনে সংশয় খচখচ করতেই থাকে যে এই দেশাত্মবোধ কতখানি মঞ্চের ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে চেয়ে, আর কতখানিই বা আন্তরিক দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায়।

ঐতিহাসিক নাটকে অশোক চরিত্র :

শুধু নিকট ইতিহাস নিয়ে নয় দূর ইতিহাস নিয়েও এই সময় কিছু নাটক রচিত হয়। ১৯০৮-এ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'অশোক' প্রকাশিত হয় এবং গিরিশচন্দ্রের 'অশোক' প্রকাশিত হয় ১৯১১-এ। অশোক সুপরিচিত ঐতিহাসিক চরিত্র। অনন্যসাধারণ প্রতিভা, সংগঠনশক্তি, মানবহিতে আগ্রহ, অসাধারণ ধর্মানুসক্তি, প্রজানুরঞ্জন, সর্বজীবে দয়া, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি নানাবিধ গুণের সমাবেশে অশোকের চরিত্র এক অপূর্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল। কিন্তু কি ক্ষীরোদপ্রসাদ, কি গিরিশচন্দ্র কারও নাটকেই এই অশোককে পাওয়া যাবে না।

দূর ইতিহাসের পটভূমিকায় ক্ষীরোদপ্রসাদ 'অশোক' নাটক রচনা করলেও তিনি এই নাটকে যুগচিন্তাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। অশোকের সিংহাসন লাভ এবং চণ্ডাশোকের ধর্মাশোকে রূপান্তরের কাহিনী এই নাটকে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনী অগ্রসর হয়েছে সেগুলি যত না ঐতিহাসিক তত অলৌকিক। নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের পটভূমিতে একখানি পৌরাণিক নাটক দাঁড় করিয়েছেন এবং তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের সপত্নী কলহ, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার কাহিনী।

বহু ঐতিহাসিক গবেষণা সত্ত্বেও আজও অশোকের বাল্যজীবন সম্পর্কে বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। সমসাময়িক যুগের সাক্ষ্যপ্রমাণ দৃষ্টে মনে হয় যে, অশোকের সিংহাসনারোহণ এবং রাজ্যাভিষেকের মধ্যে চার বছরের ব্যবধান ছিল। [অশোক খৃঃ পূঃ ২৭৩-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁর অভিষেক হয় খৃঃ পূঃ ২৬৯-এ]। এই ব্যবধান হেতু এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ঐতিহাসিকেরা অশোকের সিংহাসন লাভ এবং তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে অনেক রকম অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। মোটামুটিভাবে অশোক সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত তা হচ্ছে এই যে, অশোক নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে বিন্দুসারের পুত্রদের মধ্যে

যে যুদ্ধবিগ্রহ হয়, তাতে অশোক অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতৃগণকে পরাজিত ও নিহত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনেকে মনে করেন যে, অশোকের জীবনে বৌদ্ধধর্মের অপরিসীম প্রভাব দেখাবার উদ্দেশ্যেই তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে নিষ্ঠুরতার কলঙ্ক আরোপিত হয়েছে। কলিংগ যুদ্ধকেই অশোকের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ফেরানো ঘটনা বলা হয়ে থাকে। এই যুদ্ধের ভয়াবহ নৃশংসতা দেখে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। চতুর্দশ সংখ্যক শিলালিপির অনুশাসনে অশোকের এই তীব্র অনুশোচনা বর্ণিত হয়েছে। এই যুদ্ধের পরেই বুদ্ধদেব প্রচারিত ধর্মের প্রতি অশোকের আসক্তি জন্মে এবং তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর পর থেকে "বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'অশোক' নাটকে এই অশোককে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সপত্নী-সংঘর্ষ দিয়ে নাটকের সুরু। এই সংঘর্ষে স্বাভাবিক মহত্ত্বের অধিকারী অশোক রাজপ্রাসাদ থেকে বিতাড়িত। তাঁর সন্ধানে স্ত্রী অনীতাও পথে-প্রান্তরে ভ্রাম্যমান। তাঁদের পুত্র মহেন্দ্র, কুনালও রাজপ্রাসাদ থেকে পলায়মান। এদিকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অশোকের মাতা বন্দিনী। এইরূপ প্রবল প্রতিকূল অবস্থার চাপে চণ্ডাশোকের আবির্ভাব। এই চণ্ডাশোক বলপ্রয়োগের দ্বারা সিংহাসন অধিকার করেছেন এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে তার রাজ্য-প্রাপ্তির পথে যারা বাধা সৃষ্টি করেছিল তাদের 'মুণ্ডে মশানে পর্বত রচনা' করার আদেশ দিয়েছেন।

নাটকে চমকপ্রদ ঘটনাও কিছু কম নেই। নগরোপকণ্ঠে অশোক দস্যুতা করে নিজের ছেলের কাছ থেকে তার মুখের খাদ্য কেড়ে খেয়েছেন [৩।৫]; জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ অশোকের বিষপানে মৃত্যু ঘটেনি, বরং দেখতে দেখতে দেহ ব্যাধিশূন্য হয়েছে, অনাহারক্লিষ্ট দেহে শত মাতঙ্গের বল সঞ্চারিত হয়েছে [৪।২]; অশোক পুত্র কুনাল অগ্নিতে প্রবেশ করে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্যের পরিচয় দান করেছে অশোককে [৫।৫]। এই সব অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ এবং সেই সঙ্গে করুণ দৃশ্য সংযোজন করে ভক্তিপ্রাণ দর্শকদের চিত্ত আকৃষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে।

অশোকের ব্যক্তিগত জীবনের যে সন্ধিস্থল নির্দেশিত হয়েছে তার মধ্যে

নাটকীয় সংঘাত বলতে যা বোঝায় তা অনুপস্থিত। নাটকীয় সংঘাতের একদিকে অশোক এবং অন্যদিকে প্রতিপক্ষকে দাঁড় করিয়ে স্বাভাবিক নাটকীয় সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নাটক এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু তা না করে প্রথম থেকেই অশোককে পৌরাণিক কাহিনীর নায়কের মত সর্বংসহা করে সৃষ্টি করায় তাঁর জীবনে পরিবর্তনের জন্যেও অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করতে হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কৃপানন্দ এবং তাঁর শিশু শার্ঙ্গধরের কথোপকথনের মধ্যে ভগবান অবলোকিতেশ্বরের 'অমৃত ফলের' ভবিষ্যৎ-বিতরণকারী হিসেবে প্রকারান্তরে অশোককেই নির্দেশ করা হয়েছে। ধর্মাশোক রূপে যিনি সেই অমৃত ফল জগতে বিতরণ করবেন তাঁর চিত্ত শোকে রূপান্তরিত হবার কারণ কি? এটাও জানতে পারি আমরা কৃপানন্দ ও শার্ঙ্গধরের কথোপকথনের মারফৎ:

> শার্ঙ্গধর।......রাজকুমার অশোককে দেখে তার রাজ্যপ্রাপ্তির কামনা আমার মনে জেগে উঠেছিল। মনে মনে তাকে আমি রাজ্যেশ্বর হবার আশীর্বাদ করেছি।
>
> কৃপা। তোমার আশীর্বাদ নিষ্ফল হবে না। কিন্তু বৎস! যে ফল সুপক্ক হয়ে পড়লে মধুরতায় পৃথিবীর প্রাণী পরিতৃপ্ত হ'ত, তাকে অপক্ক অবস্থায় বৃন্ত হতে উৎপাটিত করেছ।......সময়ে যে ধর্মাশোক, তোমার সকাম আশীর্বাদ অসময়ে তাকে চণ্ডাশোকে পরিণত করেছে। [৩৷২]।

একটি ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রের পরিণতি ঘটাতে এমনি অলৌকিক কারণ নির্দেশিত হয়েছে। পৌরাণিক নাটকের ছাঁদ নাট্যকারের মনে এমন ভাবে গেঁথে আছে যে, তিনি কিছুতেই তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। রাজা বিন্দুসার ও রাণী চিত্রা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার উল্লেখ করছেন [১৷১]; পুরবাসিনিগণ ব্রজরাজের কীর্তন গাইছে [২৷২]—এ সব ব্যাপারের কোনটাই ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেনি। এই নাটকে ইতিহাসের একটি যুগের রাজকীয় কাহিনী যতটা ফুটে না উঠেছে, তার চেয়ে বেশী ফুটেছে বাঙালী পরিবারের পরিচিত কাহিনী: তরুণী ভার্যার আবদার, স্ত্রৈণ বৃদ্ধের দুর্বলতা, বিমাতার অত্যাচার এবং নাটকটি শেষ হয়েছে এক অলৌকিক চমক সৃষ্টির দ্বারা।

: ঐতিহাসিক নাটকে পদ্মিনী উপাখ্যান :

মধুসূদন দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের সমসাময়িক যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রাজপুত কাহিনী নিয়ে নাটক রচনা করেন। বলা যায় এঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর 'পদ্মিনী' নাটক [১৯০৬] রচনা করেন।

পদ্মিনীর কাহিনী বাংলা দেশে বহুল প্রচারিত কাহিনী। টড-এর রাজস্থান[১১] থেকে কাহিনী আহরণ করে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী উপাখ্যান' নামক আখ্যান কাব্য রচনা করেন ১৮৫৮-এ। তিনি টড-এর লিখিত উপাখ্যান পুরোপুরি অনুসরণ করেন। তিনি এই কাব্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের টুকরো টুকরো চিত্র তুলে ধরেন এবং ফাঁকে ফাঁকে দেশানুরাগের উচ্ছ্বাস-সর্বস্ব বক্তৃতার জন্যেই সে যুগে এই কাব্যটি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

রঙ্গলাল সিপাহী বিদ্রোহের যুগে কাব্য রচনা করেছেন, তাই জাতীয় স্বাধীনতাবোধের দিক থেকে ঐ কাব্যটিকে বেশী দূর এগিয়ে আনতে পারেন নি। কিন্তু সে সুযোগ ক্ষীরোদপ্রসাদের ছিল। তাই তিনি সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এনে তাঁর নাটক দাঁড় করিয়েছেন।[১২] ভারতের অনৈক্য, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা সবই তিনি উল্লেখ করেছেন।

পদ্মিনী নাটকে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে সেটা রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান তথা টডের রাজস্থানের কাহিনী। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই সন্দিহান। এম. এম. গৌরীশঙ্কর ওঝা তাঁর 'রাজপুতনে-কা-ইতিহাসে' ঐ কাহিনীর সত্যতা অস্বীকার করেছেন। এ.এল. শ্রীবাস্তব তাঁর '*The Sultanate of Delhi* [711-1526 A.D.] গ্রন্থে [আগ্রা থেকে প্রকাশিত ১৯৫৯ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৭] ঐ কাহিনীর স্বীকৃতি দানের চেষ্টা করলেও কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁর "*Studies in Rajput History*' গ্রন্থে এ বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে প্রমাণ করেছেন যে পদ্মিনীর ঐ কাহিনী সত্য নয়: "I published about fifteen years back one paper in Bengali in Prabasi,[১৩] with the conclusion that there is not even tolerably reliable evidence of the existence of Padmini as a historical personage of flesh and

blood, and the Padmini was purely a poetic creation of Jaisi,[১৪] whose literary genius practised a bluff on credulous Chroniclers of the Bhats of Mewar of latter times." [New Delhi, 1969, p. 4] জায়সীর কাব্যের পদ্মাবতী সিমহল দ্বীপের গন্ধর্ব সেনের কন্যা, অন্যদিকে টড তাঁকে করেছেন সিংহলের হামীর সিং চৌহানের কন্যা। আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন ১৩০৩-এ। সেই সময় চিতোরের রাণা ছিলেন রাওয়াল সমর সিং-এর পুত্র রতন সিংহ।[১৫] গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে,-লক্ষণ সিং-এর ঠাকুর্দা ছিলেন ভীমসিং, অথচ টড ভীমসিংকে লক্ষণ সিংহের খুল্লতাত বলে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারটা সবাই এখন স্বীকার করে নিয়েছেন যে পদ্মিনী রতন সিং-এরই স্ত্রী।

সুতরাং আধুনিক গবেষণার আলোকে পদ্মিনী নাটককে বিচার করলে এতে ঐতিহাসিক ভিত্তিই পাওয়া যাবে না। তারপর নাট্যকার অতি প্রাকৃত বিষয় ব্যবহারের মোহ ত্যাগ করতেও পারেন নি। শেষ দৃশ্যে চিতোর-রক্ষিণী মাতা শুধু নেপথ্য থেকে 'ম্যয় ভুখা হো' শব্দ করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, তিনি ছায়ামূর্তি ধ'রে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেক্সপীয়রের Julius Caesar নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সার্ডিস-এর রণক্ষেত্রের শিবিরে ব্রুটাস যে প্রেতাত্মার দর্শন লাভ করেছিল সেটা পরাজয়োন্মুখ ব্রুটাসের মনের অধ্যাস [Illusion] হিসাবেই গ্রহণ করা চলে। কিন্তু পদ্মিনী নাটকের ছায়ামূর্তি সে ধরণের নয়। এই ছায়ামূর্তি চিতোরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দীর্ঘ-বক্তৃতা দেবার জন্যেই যেন উপস্থিত।

"পদ্মিনী নাটকে ইতিহাসের আলাউদ্দীনকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। ইতিহাস বলে "Ala-ud-din acted according to his conviction, and followed a policy of 'thorough', calculated to help the establishment of a strong Governmeat at the Centre."[১৬] কিন্তু এই নাটকে আলাউদ্দীন যেন এক খেয়ালী সম্রাট। তাঁর নিজের উক্তি: "পিতৃব্যকে হত্যা করলুম—তা হতে আমার অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই জেনেও হত্যা করলুম। কেন? এ একটা কৌশল! সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নূতন নীতি। আমায় যদি লোকে চিনতেই পারবে, তা হ'লে রাজা হয়ে মজা কি? অন্যে যে পথটা সহজ ব'লে চলবে, আমি প্রাণান্তেও সে পথ মাড়াব না। অন্যে যে পথে চলতে

ভয় পাবে, আমি সেই পথেই পা দেব। লোকে সাধারণত যে কার্য এত কাল ক'রে আসছে আমি তার উল্টো করব।......" [১।২]

আলাউদ্দীন নিষ্ঠুর ছিলেন, বহু রক্তপাতের দ্বারা তাঁর শাসনকাল কলঙ্কিত। কিন্তু খেয়ালের বশে তিনি চলতেন না। তিনি অনেক নীচতার পরিচয় দেন এবং তাঁর ত্রুটিও অনেক ছিল—তবুও তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শাসক। নিজে নিরক্ষর হয়েও তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক। অতি দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন তিনি এবং জার্মানীর বিসমার্কের মতই ছিল তাঁর নীতি '—the end justifies the means." এই আলাউদ্দীন পদ্মিনী নাটকে নেই। নাট্যকার নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে আলাউদ্দীনের স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন।

আলাউদ্দীনের পরিত্যক্তা স্ত্রী নসীবনের যে চরিত্রটি নাট্যকার এঁকেছেন সে শুধু নাটকে অহেতুক প্রাধান্যই লাভ করেনি ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছে। চিতোর আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে এই নসীবনের প্ররোচনাতেই। দিল্লীর প্রাসাদ থেকে চিতোরের রাজপুত পরিবারে তার অবাধ গতি। নাটকের নাম পদ্মিনী. কিন্তু নায়িকা হয়ে উঠেছে নসীবন। নাট্যকারের ইতিহাসবোধের অভাব এবং রোমান্টিক মনের ফলেই এমনটি ঘটেছে।

: বীর রমণীর কাহিনী :

দেশাত্মবোধের উন্মাদনায় একদিকে যেমন অতীত ইতিহাসের নায়কদের জাতীয় বীর হিসাবে রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছিল তেমনি কোন কোনও বীর রমণীদের কাহিনীও নাটকে রূপ দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এমনই একটি প্রচেষ্টা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি নাটক' [১৯০৭]। ইতিপূর্বে ১৯০৩-এ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন 'তারাবাই' নাটক রচনা করেন, তখনও স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়নি। তাই দেশাত্মবোধের পরিচয় এতে কম। তবুও ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্ভবত তারাবাই-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া ফরাসী ইতিহাসের 'জোয়ান অব্ আর্ক' চরিত্রটিও তাঁর সম্মুখে ছিল।

আহমদ নগরের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ-এর সঙ্গে চাঁদ সুলতানা [চাঁদবিবি] নাম প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। সম্রাট আকবর যখন দাক্ষিণাত্যে তাঁর প্রভুত্ব

বিস্তারের চেষ্টা করেন তখন তাঁকে বাধা দেবার মত অবস্থা দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের ছিল না। তাঁরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ক'রে শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। আকবর বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুর রহিম এবং তাঁর নিজের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের অধীনে আহমদ নগরে এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। এই আহমদ নগরও তখন অন্তর্কলহে শক্তিহীন। ১৫৯৫-এ আহমদ নগর অবরুদ্ধ হলো। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে নগরকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন হুসেন নিজাম শাহ-এর কন্যা এবং বিজাপুরের মৃত সুলতানের পত্নী চাঁদবিবি। অবরোধকারীরা চাঁদবিবির সঙ্গে সন্ধি করেন। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে বেরার মোগলের হস্তগত হয় এবং আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে এক বালক রাজা আহমদ নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মোগল সৈন্য চলে যাবার পর চাঁদবিবি তাঁর দায়িত্ব ত্যাগ করেন এবং আহমদ নগরের এক চক্র সন্ধিকে অগ্রাহ্য করে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায়। চাঁদবিবির পরামর্শ তারা প্রত্যাখান করে। ১৫৯৭-এ মোগলেরা অশুির নিকটবর্তী [গোদাবরী নদীর তীরে] সুপার যুদ্ধে জয়লাভ করে। আহমদ নগরে অন্তর্কলহ চলতেই থাকে এবং চাঁদ হয় নিহত হন, না হয় বিষপানে আত্মহত্যা করেন। মোগলেরা সহজেই আহমদ নগর অধিকার করে [১৬০০-এর আগষ্ট মাসে]।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে ইতিহাসের এই ঘটনা মোটামুটি অনুসরণ করা হয়েছে। আহমদ নগরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ বিলাসী। তাঁর উজীর মিয়ানমঞ্জু আহমদ নগরকে মোগলের হাতে তুলে দিতে আগ্রহী, সরদার এখলাস তার বিরোধী। চাঁদবিবি মোগল আক্রমণের সময় আহমদ নগরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধে অসম্ভব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতক মিয়ানমঞ্জুর অস্ত্রাঘাতে আহত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ইব্রাহিম শাহও যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর বালক পুত্র বাহাদুরকে সিংহাসনে স্থাপন করে মোগলেরা আহমদ নগরের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। দেখা যাচ্ছে নাটকের পরিণতির সঙ্গে ইতিহাসের একটু অমিল রয়েচে। কারণ সন্ধিটা হয়েছিল চাঁদবিবির সঙ্গেই। চাঁদবিবি নিহত হন তার দুবছর পরে। অবশ্য শেষ দৃশ্যে মুরাদকে চাঁদবিবির সম্মুখে এনে তাঁর কাছ থেকে আহমদ নগরের সিংহাসনে ইব্রাহিম শাহের বালক পুত্রকে বসাবার স্বীকৃতি আদায়ের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত

ঘটনাগুলিকে নিয়ে একটা সংহত নাটকীয় রূপ দিতে নাট্যকার ব্যর্থ হয়েছেন।

চাঁদবিবি নামকরণের পেছনে নাট্যকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল চাঁদবিবি চরিত্রটি কিন্তু সে ভাবে রূপায়িত হয়নি। চাঁদবিবি কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে পারেননি, বরং বলা যায় নাটকে তাঁর প্রাধান্য নেই বললেই চলে। এটা হয়েছে ঘটনাবলী বাছাই না করার জন্যে, অর্থাৎ নাটকের দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ না দেবার জন্যে। চাঁদবিবির বীরত্ব ব্যঞ্জক মূর্তি তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে রণবেশে বালকদের না এনে সৈনিকদের দাঁড় করানোই উচিত ছিল।

প্রকৃত পক্ষে নাটকটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার শেষ পর্যন্ত দেশাত্মবোধের আবেদন রাখতে চেয়েছেন। চাঁদবিবির আহ্বান: "জীবন তুচ্ছ ক'রে সম্ভোগ সম্পদ তুচ্ছ করে মান, যশ, নাম, গৌরব, জন্মভূমির পবিত্র ধূলিরাশির মধ্যে চিরদিনের জন্য আচ্ছাদিত করতে কে কোথায় আছ, চলে এস।...মায়ের চরণরেণুতে অঙ্গ মেশাবার শুভ সুযোগ উপস্থিত—চলে এস।" [৫।৬]

অন্তিম লগ্নে এখলাস খাঁর উক্তি: "মা! জন্মভূমি! অধম সন্তান তোমার ওপর বড়ই অত্যাচার করেছে—তোমার শান্তিময় বক্ষে মুখ লুকিয়ে একটু কাঁদব, সে শক্তি আমার হলো না।" [৫।৪]

বিজাপুরের সুলতান আদিল শা, আহমদ নগরের সুলতান ইব্রাহিম শা প্রমুখ সবাই জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় কৃতসংকল্প হয়েছেন। ইব্রাহিম চাঁদবিবিকে বলছে: "মাতৃভূমি ভক্তের শোণিত অঞ্জলি চায়—দিতে পার দাও। পবিত্র মৃত্তিকায় দেবতরু জন্মগ্রহণ করে, স্বাধীনতা এক দিন না একদিন আসবে।" [৫।২]। বাংলা রঙ্গমঞ্চ থেকে এই আশার বাণীতে পরাধীন জাতির অন্তরের আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হয়েছে। শুধু তাই এখলাস খাঁর উক্তির মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথাও বলা হয়েছে এবং এই দেশ যে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দেশ—এ সম্পর্কেও বোধ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। [১।১]

উনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণের দিকে নাট্যকারের দৃষ্টি ছিল এবং এই নাটকে একাধিক নারীর সক্রিয় ভূমিকা সে দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে তাদের কাছে পুরুষ চরিত্রগুলি একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

: ছদ্ম ঐতিহাসিক নাটক :

ঐতিহাসিক নাটকগুলির পাশাপাশি এই সময়ে [বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে] এমন কতকগুলি নাটক রচিত হয় যেগুলিকে ছদ্ম ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে। উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য সম্পর্কিত একটি উপকথা অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যে 'আর্যরাজ মহিমা কীর্তিত গীতি প্রধান নাটক' 'বাসর' [১৯০৬] রচনা করেন সেটি ঐতিহাসিক নাটক নয়। অনার্য শক রাজত্বের অবসানে বিক্রমাদিত্যকে অবলম্বন করে কি ভাবে আর্য ধর্মের পুনরায় প্রতিষ্ঠা হলো, 'বাসর' নাটকে তাই বর্ণনা করা হয়েছে। নাটকটি রোমান্টিক। এই নাটকের পেছনে দেশাত্মবোধের প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় এবং এই নাটকের গানের মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে ভারত মাতার বন্দনার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ।

মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সৎনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে গিরিশচন্দ্র 'সৎনাম' বা 'বৈষ্ণবী' নাটক [১৯০৪] রচনা করেন। এই নাটকের কথা আগেই আলোচনা করে আসা হয়েছে।

এই সময়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও ইতিহাসের কল্পিত পটভূমিকায় দু-খানি নাটক রচনা করেন : 'রঘুবীর' [১৯০৩] এবং 'খাঁ জাহান' [১৯১২]। এই দু-টি নাটকের কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের ক্ষীণতম যোগসূত্র বর্তমান। তা ছাড়া নাটক দু-টি অতিরিক্ত রোমান্টিক ঘটনায় ভারাক্রান্ত। নিজ পারিষদ জাফর কর্তৃক গুজরাটের নবাব মামুদ শাহের হত্যা, জাফরের সিংহাসন অধিকার, ভীল যুবক রঘুবীরের সঙ্গে জাফরের যুদ্ধ, রঘুবীর কর্তৃক জাফর বধ—এইরূপ একটির পর একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা সাজিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর রঘুবীর নাটক রচনা করেছেন। কোনও চরিত্রই এই নাটকে পরিণতি লাভ করেনি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত বিচিত্র উপাদানগুলির সামঞ্জস্য বিধানেও নাট্যকার ব্যর্থ হয়েছেন।

মধ্যযুগের কল্পিত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় 'খাঁ জাহান' নাটকটি রচিত। খাঁ জাহানের প্রচণ্ড আত্মাভিমান এবং নারায়ণ ও সোফিয়ার প্রেমের করুণ পরিণতিই এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

: স্বদেশী যুগের তিনটি নাটক :

১৯০৫-এ লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিক্ষোভ তীব্র হয়ে যখন তা স্বদেশী

আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করলো সেই সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ তিনটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন : 'সিরাজদ্দৌলা' [১৯০৬], 'মিরকাশিম' [১৯০৬] এবং 'ছত্রপতি শিবাজী' [১৯০৭]। এই তিনটি নাটকই ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, এগুলির অভিনয় এবং মুদ্রণ বন্ধ করে দেয়।

নাটক প্রহসনাদি মিলে ৭৫ খানা গ্রন্থ গিরিশচন্দ্র রচনা করেন—এ ছাড়াও চারখানা আরম্ভ করেও শেষ করতে পারেন নি। এর মধ্যে পৌরাণিক ও গীতিনাট্যের সংখ্যাই বেশী।[১৭] ১৯০৫ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে তিনি ১১ খানা নাটক লেখেন—এর মধ্যে ৪খানা ঐতিহাসিক। পৌরাণিক ও গীতিনাট্য রচনার প্রবণতাই তাঁর মধ্যে বেশী ছিল। তা ছাড়া সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলন, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব বেশ প্রতিকূল ছিল। কুমুদবন্ধু সেন রচিত 'গিরিশচন্দ্র ও নাট্য-সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে এ সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানা যায়। গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন : "এই আন্দোলন [অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলন] misdirected ; কতকগুলি পেশাদার রাজনৈতিক নেতার হুজুগে ছেলেরা মেতে উঠেছে।"[১৮] বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : "যেখানে লাখ লাখ লোক অনাহারে অর্ধাহারে রয়েছে, ম্যালেরিয়ায়, প্লেগে আর অন্যান্য উৎকট ব্যারামে লাখ লাখ ভারতবাসী মরছে —যেখানে নৈতিক চরিত্রহীনতায়, মূর্খতায়, ব্যভিচারে, কদাচারে কোটি কোটি লোক উচ্ছন্ন যাচ্ছে সেখানে তাদের উদ্ধারে, তাদের সেবা, তাদের স্বার্থ ত্যাগ করা কি Bengal Partition রদ করার চেয়ে বড় নয়?"[১৯] বয়কট আন্দোলন, বিলাতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব সম্পর্কেও তিনি বিরূপ মন্তব্য করেছেন এবং কংগ্রেসের আন্দোলন সম্পর্কেও তিনি সুস্পষ্ট ভাবে মতামত ব্যক্ত করেছেন : "কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে যে রাজনৈতিক আন্দোলন তা বক্তৃতার ফোয়ারা। পড়তে বেশ শুনতে বেশ। তাতে কি হবে? দেশের দুর্দশা মোচন, দেশের দুর্দশার জন্য deep feeling বা গভীর বেদনাবোধ দুই এক-জনের থাকতে পারে—কিন্তু অপর সকলে হুজুগে পড়ে যায় এই তো আমার বিশ্বাস।"[২০]

এই সব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের মনোভাব মোটেই ভাল ছিল না—আন্দোলনের পদ্ধতি তাঁর পছন্দ মত ছিল না। তবুও ঐ উত্তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে কেন

তিনি এমন তিনটি নাটক লিখলেন যা ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করলেন?

গিরিশচন্দ্র মঞ্চ সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নাটক লিখতেন। তিনি জানতেন ঐ আবহাওয়ায় গরম নাটক না লিখলে জনসাধারণ তা নেবে না। ১৯০৬-এর ২৩ এপ্রিল গিরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনকে যে চিঠি লেখেন তা থেকেই এটা বুঝা যায়। তিনি লেখেন: "এখনও স্বদেশের মৌখিক অনুরাগ খুব উচ্চ। যতদূর নাটক হোক বা না হোক, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের এইরূপ মৌখিক ঝাঁজ এখন সাধারণের প্রিয়।" প্রধানত এইরূপ 'মৌখিক ঝাঁঝ'ই আমরা আলোচ্য নাটক তিনটিতে দেখতে পাই এবং ইংরেজ সরকার সেই ঝাঁজ সহ্য করতে পারেনি।

॥ **সিরাজদ্দৌলা** ॥ সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন লাভের সময় থেকে তাঁর জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি এবং মিরজাফরের মসনদ লাভ পর্যন্ত 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের বিস্তৃতি। এই সময়ের ঘটনাবলী নাটকে স্বভাবতই স্থান লাভ করেছে; কিন্তু ঘটনা বিন্যাস করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র যে যুগধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন কালকে অতিক্রম করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে পৌঁছে গেছেন। ১৮৭৬-এ নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে তিন দশক ধরে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,[২১] বিহারীলাল সরকার,[২২] নিখিলনাথ রায়,[২৩] কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আহরণ করেন এবং বিদেশী ঐতিহাসিকরা তাঁর ওপরে যে সব কলঙ্ক আরোপ করেছিলেন তা অপনোদনে যত্নবান হন। গিরিশচন্দ্র যে এদের রচনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা সিরাজদ্দৌলা নাটকের ভূমিকা থেকেই জানা যায়। তিনি এখানে নিজেই ঐ শিক্ষিত সুধিগণের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। তিনি নিখিলনাথ রায়কে তাঁর এই নাটক পড়ে শুনিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐ নাটক পাঠ করে ১৯০৬-এর ৮ ফেব্রুয়ারী গিরিশচন্দ্রকে লিখেছিলেন: "ইতিহাস যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, আপনি তাহাই প্রত্যক্ষ ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।"[২৪]

তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে বিরূপ হওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ ব্যবসায়িক প্রয়োজনে[২৫] গিরিশচন্দ্র ইতিহাস অবলম্বনে রচিত নাটকটিতে দু'টি যুগোচিত বিষয় আনলেন। এক: উত্তেজনাপূর্ণ স্বদেশপ্রেম যা

ইংরেজের সঙ্গে বাঙালী রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের চিত্রের মধ্যে রূপায়িত হলো; দুই: সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রেরণা।

সিরাজদ্দৌলা নাটকে কোনও রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। সিরাজ এখানে জাতীয় বীররূপে চিত্রিত; তিনি দেশের স্বাধীনতা অপহারক বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে কোনও অস্পষ্টতা নেই। তিনি নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মাধ্যমে বাঙালী জাতিকে স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁর পাশে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন। এই সংলাপ প্রায় সবটাই বক্তৃতাধর্মী এবং সংলাপ নাটকের পাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও তার আসল লক্ষ্য দর্শক সাধারণ। ঠিক একজন রাজনৈতিক নেতার মতই সিরাজ বার বার তার বক্তব্য রেখেছেন: "হে অমত্যগণ, আমায় শত্রু বিবেচনা করবেন না। কিন্তু আমি যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙ্গালার শত্রু নই।···স্থির জানবেন, ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার দুশমন।" [১।৫]

বিদেশী কখনই আপনার হয় না—এ কথা সিরাজ একাধিক বার উচ্চারণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি যে নিঃস্বার্থ ভাবে দেশরক্ষার যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেছেন তাও স্পষ্ট ভাবেই উল্লেখ করেছেন: "ইংরাজ পরাজিত হোক, বাঙ্গালার গৌরব রক্ষিত হোক।······বিদেশীর গর্ব খর্ব হোক। আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই।" [৪।২]

এ ধরণের কথা বলবার একটা বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। কারণ মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রমুখ যাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের জন্যই সিরাজকে এই কথা বলতে হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য: "মীরজাফর রাজেশ্বর হোক। রাজ্য প্রাপ্ত হলেও কি স্বদেশের গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখবে না? জন্মভূমির প্রতি লক্ষ্য রাখবে না? আমার বিপুল বাহিনীর অধিকাংশই বিশ্বাসঘাতকের অধীন, এ বিশ্বাসঘাতকেরা বাঙ্গলার পক্ষে যুদ্ধ জয় না করলে রণজয়ের আশা নাই।" [৪।২]। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সিরাজ সোজাসুজি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন: "বিদেশী বণিক দেখুক—এখনো বাঙ্গলার বীর্য নির্বাপিত নয়। নবাবের প্রভাবে ষড়যন্ত্রকারীর মন্ত্রণা বিফল হয় কিনা দেখুক।

হয় ইংরাজ নির্মূল হবে, নয় আলীবর্দীর বংশ নাশ হবে।" [৪।২]। এক দিকে এইভাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা যেমন সিরাজদ্দৌলা নাটকে আছে তেমনি পাশাপাশি আছে ইংরাজ প্রশস্তি। সিরাজ বলছেন হলওয়েলকে: "হলওয়েল তোমরা উচ্চ জাতি, তার আর সন্দেহ নাই। তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।" [১।১০]

গিরিশচন্দ্র তাঁর এই নাটকে ইংরেজদের "উদ্যমশীল, একতায় আবদ্ধ, উদ্যোগী পুরুষসিংহ" প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করে বলেছেন "বুঝেছি ইংরাজ সামান্য নয়। এ অপেক্ষা শতগুণ সৈন্য লয়ে ইংরাজ পরাস্ত করা আমাদের সাধ্য নয়।" [২।৬]

সোজা কথায় এই নাটকটির মধ্য দিয়ে সে যুগের [অর্থাৎ যে যুগে নাটকটি লেখা হয়] বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের দ্বৈধ মনোভাব [একদিকে জাতীয়তাবোধ অন্যদিকে বৃটীশ শক্তির প্রতি সপ্রশংস মনোভাব] প্রকাশিত হয়েছে।

হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে আহ্বান নাটকটিতে বার বার ধ্বনিত হয়েছে তাও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্রেরণা নয়। সেটাও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগেরই বিষয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোনও মুসলমান নবাব দেশরক্ষার আবেদন জানিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত শক্তিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করছেন, এটা কল্পনা করা যায় না। নাটকটি রচিত হয় ১৯০৫-এ [১৯০৬-এ প্রকাশিত হয়]। ১৯০৬-এর ৩০ ডিসেম্বর ঢাকা সহরে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ১৯০৩ বা তার কিছু আগে থেকেই বৃটিশ শাসকেরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারত সরকার ১৯০৩-এর ৩ ডিসেম্বর ঘোষণা করেছিলেন যে, তারা বঙ্গদেশ দুই ভাগে ভাগ করবেন; পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—ঢাকায় রাজধানী হলে নতুন প্রদেশে তাদের প্রভুত্ব বাড়বে, তাদের সংস্কৃতি বিকাশের সুবিধা হবে। লর্ড কার্জন স্বয়ং ঢাকায় গিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ১৯০৫-এর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি অনেকখানি কার্যকর হয়েছে। কারণ মুষ্টিমেয় মুসলমান ছাড়া কেউ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করলেন না। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ভালভাবেই ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে গিরিশচন্দ্রের

সিরাজদ্দৌলা সে যুগের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকের মতই আহ্বান জানালেন :

ওহে হিন্দু মুসলমান
এস করি পরস্পর মার্জনা এখন ;
... ...
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙ্গালায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব।
... ...
ইংরাজের অমাত্য ইংরাজ
মন্ত্রণায় স্থান নাহি পায় দেশবাসী।
বঙ্গের সন্তান—হিন্দু মুসলমান,
বাঙ্গালার সাধিব কল্যাণ
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ—
নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফর। [১।৫]

ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়ে সিরাজ হতাশ স্বরে বলেছেন : "জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়···যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়—এই দুর্দম ফিরিঙ্গি দমন তখন সম্ভব।" [২।৬]

যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তিকে সংহত করার জন্য সিরাজদ্দৌলা আহ্বান জানিয়েছেন তার নাটকীয় ফলশ্রুতি মীরমদন আর মোহনলালের বীরত্বে প্রতিফলিত।

এই নাটকের মূল দ্বন্দ্ব সিরাজদ্দৌলা আর ইংরেজের মধ্যে। কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে সিরাজদ্দৌলা আর মীরজাফর, জগৎ শেঠ প্রমুখ চক্রান্তকারীদের দ্বন্দ্বও। দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব এত তীব্র যে, একথা অনায়াসেই বলা চলে যে, পলাশীর রণক্ষেত্রে একটা যুদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা একটা অনুষ্ঠান মাত্র ; চক্রান্তের ভারে রাজশক্তি আগে থেকেই ভেঙ্গে পড়েছিল। মীরমদন ও মোহনলালের মিলিত প্রচেষ্টা তাকে রক্ষা করতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে সিরাজদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখনই রাজশক্তি দ্বিধা বিভক্ত এবং জন-

সাধারণের মধ্যেও এমন চেতনা ছিল না যে, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সিরাজের পেছনে দাঁড়াতে পারে। জনসাধারণের একটা বড় অংশ ছিল নিষ্ক্রিয় আর একটা অংশ নানা কারণে সিরাজের ওপরে বিরূপ ছিল।

: সত্যের সঙ্গে কল্পনা :

গিরিশচন্দ্র মোটামুটিভাবে ইতিহাসের ঘটনাগুলির ওপরেই নাটকটি সাজিয়েছেন—অনেক ক্ষেত্রে হুবহু ঘটনাগুলিকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রের নতুন বিন্যাস, নতুন চরিত্র সৃষ্টি এবং নতুন ঘটনা সৃষ্টির দ্বারা তিনি সে যুগের ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা দান করেছেন।

জলধর সেন তাঁর সম্পাদিত 'বসুমতী' [৫ ফাল্গুন, ১৩১২] পত্রিকায় লিখেছেন : "ইতিহাস বড় গম্ভীর, বড় সুসংহত বড় শৃঙ্খলাবদ্ধ। নাটক সেরূপ নহে, তাহাতে সত্যের সহিত কল্পনা মিশাইয়া গিরিশবাবু আসল কথা ফুটাইয়া তুলিয়া সিরাজদ্দৌলাকে রক্তমাংসের মানুষের মত লোক সমক্ষে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন।" এটা কিন্তু উচ্ছ্বাসের কথা। তখনকার দিনের বুদ্ধিজীবীরা সিরাজকে যেভাবে দেখাতে চেয়েছেন, গিরিশ তা পেরেছেন বলেই এই উচ্ছ্বাস। নতুবা সিরাজ চরিত্র কি এই নাটকে তার সত্যকার রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে ?

বিদেশী ঐতিহাসিকেরা সিরাজ চরিত্রের ওপর নানা কলঙ্ক আরোপ করে [অর্থাৎ সিরাজ মদ্যপ, চরিত্রহীন, অত্যাচারী] দেখাতে চেয়েছেন যে, এই রকম একটা দানব-চরিত্রের মানুষের হাত থেকে ইংরেজ বঙ্গদেশকে রক্ষা করেছে। অন্য দিকে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ দেশীয় ইতিহাসবিদেরা সিরাজদ্দৌলাকে জাতীয় বীর রূপে চিত্রিত করেছেন, তাঁর কলঙ্ক ভঞ্জন করেছেন। গিরিশচন্দ্র শেষোক্ত ইতিহাসবিদদেরই অনুসরণ করেছেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। বিদেশী ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী সিরাজদ্দৌলা একজন "mean ruffian"[২৬] মাত্র ছিলেন না—একথা ঠিক, কিন্তু বর্তমান যুগের এ দেশীয় ঐতিহাসিকরাও সিরাজ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে তিনি ছিলেন একজন…"wayward pleasure loving and erratic youngman, a typical product of the age in which he lived."[২৭] সিরাজের যুগে বর্তমানের মত জাতীয়তা অথবা দেশাত্মবোধ প্রকৃতপক্ষে অজানাই ছিল। সুতরাং উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ভাবাবেগে সিরাজকে

জাতীয় বীর হিসেবে চিত্রিত করা প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি-বিহীন ব্যাপার। মীরমদন, মোহনলালের চরিত্রও অনেকটা এ-যুগের দেশপ্রেমিকদের আদলে গঠিত। এদের উক্তি লক্ষণীয়। মীরমদন বলছে সিরাজকে "... বাঙ্গালার কি বীরবীর্য বিলুপ্ত...বাঙ্গালার বীরত্ব শত রণে পরীক্ষিত।...তবে কেন জন্মভূমির পরাধীনতার আভাস প্রদান করছেন।" [২।৬]। আর এদিকে "মোহনলাল [সৈন্যদের প্রতি]..."যদিচ মীরমদন পতিত, তোমরা জনে জনে তাঁর অনুসরণ কর, জনে জনে মীরমদন হও, স্বদেশের নিমিত্ত প্রাণ দিতে কাতর হয়ো না, মীরমদনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করো।" [৪।৩]

গিরিশচন্দ্র যে সব অনৈতিহাসিক চরিত্র সিরাজদ্দৌলায় এনেছেন—তারাও তাদের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ঐতিহাসিক নাটকে কিছু চরিত্র নাটকের প্রয়োজনে বাইরে থেকে আসতে পারে, কিন্তু তারা যদি রীতিমত প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করে তবে নাটকের ঐতিহাসিক গুণ নষ্ট হতে বাধ্য। সিরাজদ্দৌলা নাটকে এ ব্যাপার ঘটেছে। অলৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটা এখানে সম্ভব ছিল না, কিন্তু বেশ কিছু অবিশ্বাস্য ও অযৌক্তিক ব্যাপার এ নাটকে এসেছে।

নাটকের অন্যতম কাল্পনিক চরিত্র করিম চাচা। তার প্রকৃত নাম কামিনীকান্ত [সম্ভবতঃ বঙ্কিমের কমলাকান্তের অনুসরণ]। করিমচাচা ঐতিহাসিক ভাষ্যকার—তার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার যেন কথা বলছেন। করিম নিষ্ক্রিয়—তবে দেশপ্রেমিক। নাটকীয় ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করা ছাড়া তার বিশেষ কোনও কাজ নেই। অথচ ঐ কাজটি সে এত বেশী মাত্রায় করেছে যে, নাটক দেখে দর্শকদের আর বিশেষ কিছু নিজেদের চিন্তা করার থাকে না। তবুও করিম চাচা জীবন্ত চরিত্র। কিন্তু কাল্পনিক চরিত্র জহরা একেবারে মূর্তিমতী জিঘাংসা। তার নিজের কথায়: "প্রতিবিধিৎসা—জহরে জর্জরীভূত হয়ে জহরা নাম গ্রহণ করেছিলেম।" [৫।৪]। এই জহরা কিন্তু করিম চাচার মত নিষ্ক্রিয় নয়। সে সিরাজের পাঞ্জা যোগাড় করে জালিয়াতির সাহায্যে গৃহে গৃহে তাঁর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে; ক্লাইভকে নিশানের পরামর্শ দেয়, ওয়াটসকে বুদ্ধি যোগায়; যুদ্ধকালে সিরাজকে সৈন্যদের কাছ থেকে দূরে রাখে,—এমনি সব অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা করানো হয়েছে তাকে দিয়ে।

এমন অবিশ্বাস্য ও অসঙ্গতিপূর্ণ আরও ঘটনা নাটকে আছে। যেমন মীরণের বিলাস কক্ষে লুৎফার ওপরে মীরণ যখন অত্যাচার করতে উদ্যত তখন হঠাৎ দুজন ইংরেজ সৈন্য নিয়ে ওয়াটস পত্নীর প্রবেশ; কারাগারে সিরাজের গুপ্ত হত্যাস্থলে এবং ঠিক হত্যার মুহূর্তে লুৎফা, ওয়াটসপত্নী, জহরার প্রবেশ এবং ওয়াটস পত্নী কর্তৃক লুৎফাকে আশ্রয় দান—এ সবের মধ্যে চমক থাকতে পারে, কিন্তু এতে যে ঔচিত্যবোধের অভাব ঘটেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সিরাজের হত্যার ঘটনা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। সিরাজ নিহত হয়েছিলেন এবং মহম্মদী বেগ তাঁকে হত্যা করেছিল—এ সম্পর্কে সকলেই একমত। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে একমাত্র মীরণকে যুক্ত করে সেইভাবে ঘটনা সাজানো সম্পর্কে আপত্তি উঠবেই। গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর 'সিরাজদ্দৌলা'র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু সিরাজের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তিনি মোটেই অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ করেননি। অক্ষয়কুমার বহু তথ্য উদ্ধৃত করে ['সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থের অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ] প্রমাণ করেছেন যে, সিরাজকে হত্যার পেছনে ক্লাইভের হাত ছিল এবং মীরজাফর ক্লাইভ থেকে আরম্ভ করে পাত্রমিত্রগণের সঙ্গে পরামর্শক্রমেই সিরাজকে হত্যার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। অথচ হত্যাকাণ্ডের সব দায়িত্বই মীরজাফরের সতের বছরের পুত্র মীরণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অক্ষয়কুমার লিখেছেন: "মীরণের দুর্বৃত্ত চরিত্রই যদি সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের একমাত্র কারণ হইত, তবে মীরণ তাঁহাকে রাজমহলে অথবা পথিমধ্যে যে কোনও স্থানে নিহত করিলেই ত সকল গোলযোগের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিতেন। সিরাজদ্দৌলার ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য পাত্রমিত্র লইয়া মন্ত্রণা করিবার প্রয়োজন হইত না।"[২৮]

গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমারের সিরাজ-হত্যা সম্পর্কিত আলোচনাকে গুরুত্ব দেন নি; তার ফলে নাটকটি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেনি। উপরন্তু ওয়াটস্ পত্নীর সহৃদয়তা ও সহানুভূতিকে সবিস্তারে বর্ণনা করে তার সমস্ত সম্ভাবনাই নষ্ট করে দিয়েছেন।

: সিরাজদ্দৌলা কি ট্র্যাজেডী ? :

সিরাজদ্দৌলা সার্থক ট্র্যাজেডী হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন তুলতে গেলেই মনে হবে

যে, এই নাটকের ট্র্যাজেডী কি ব্যক্তির, না জাতির ট্র্যাজেডী। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁর পরাজয় ও মৃত্যুর অর্থ শুধু ব্যক্তির বিলোপ নয় একটা গোটা জাতির বিপর্যয়। কিন্তু ট্র্যাজেডীর এই ব্যাপক ব্যঞ্জনা এই নাটকে আসেনি। সেটা আনতে হলে জাতির সামগ্রিক জীবন তরঙ্গ এবং তার পতন জনিত হাহাকারকে নাটকের মধ্যে বিবৃত করতে হতো। শুধু মাত্র কয়েকটি দেশাত্মবোধক বক্তৃতা দিয়ে জাতির পতনের হাহাকারকে নাটকে সঞ্চারিত করা যায় না। যে নাটকে জনসাধারণের কোনও ভূমিকাই নেই এবং বক্তৃতার দ্বারা ষড়যন্ত্রকারীদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য শুধু চেষ্টা বা ব্যক্তিগত অনুশোচনার প্রকাশ রয়েছে সে নাটক গোটা জাতির পতনজনিত ট্র্যাজেডীর রস সৃষ্টি করবে কিভাবে ?

তা হলে নাট্যকার কি সিরাজকে ট্র্যাজেডীর নায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন ? যদি সে ইচ্ছা থেকে থাকে তবে তাও সার্থক হয় নি। সিরাজের ওপরে বিদেশী ঐতিহাসিকেরা যে সব কলঙ্ক আরোপ করেছিল এবং তার ফলে সিরাজ সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল তা অপনোদনের চেষ্টা নাট্যকার করেছেন। হোসেনকুলিকে হত্যা এবং বারবণিতা ফৈজীকে হত্যার পাপ থেকে সিরাজকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে করিম চাচার সাহায্যে। রানী ভবানীর কন্যা তারাবাঈ-এর প্রতি তাঁর আচরণের জন্যতিনি অনুতপ্ত। মদ্যপান থেকেও তিনি বিরত। নাট্যকার সিরাজকে একেবারে মহৎ ও প্রজাবৎসল করে তুলেছেন। সিরাজের নিজের মুখেই বলা হয়েছে :

> বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ শয্যায়,
> শেষ বাক্যে তাঁর—
> জন্মিয়াছে ধারণা আমার
> রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার ;
> নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে ;
> প্রজার মঙ্গল কার্য সতত সাধন,
> নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে। [১।৫]

এরূপ একজন মহৎ প্রজাবৎসল নবাবের পতনে তাঁর প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হওয়ারই কথা এবং হাহাকার জাগবারই কথা। কিন্তু তা কি হয়েছে ?

নাটকে দ্বন্দ্ব আছে, বাইরের বিমুখী দ্বন্দ্ব। তবে সিরাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বটা প্রায়ই অনুশোচনামূলক বক্তৃতা। ট্র্যাজেডীর নায়কের পতন ঘটে তার

নিজের দুর্বলতা থেকে। তাঁর ঔদ্ধত্যকে যদি দুর্বলতা বলে স্বীকার নাও করা হয়, তবুও তাঁর মধ্যে যে ক্ষমার আতিশয্য দেখা যায় সেটাই তাকে পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ট্র্যাজেডীর নায়কের মত দৃঢ়চিত্ত হয়ে সিরাজ কি সংগ্রাম করতে পেরেছেন? যিনি বুঝতে পারছেন 'কালচক্র পরিবর্তনে কারও সাধ্য নাই' বা যিনি শিখগুরু তেগ্‌বাহাদুরের অভিশাপ [অর্থাৎ শ্বেতকায় অর্ণবযানে এসে মোগল বংশ উচ্ছেদ করবে] সম্পর্কে নিশ্চিত তিনি সক্রিয় ভাবে সংগ্রাম করবেন কেমন করে? যতটা বক্তৃতা দিয়েছেন ততটা সংগ্রাম করেন নি তিনি। আর ঠিক হত্যার পূর্বক্ষণে সিরাজ যে ভক্তিরসাত্মক বক্তৃতা দিয়েছে তা করুণ হলেও ট্র্যাজেডীর রস সৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। সিরাজ বলেছেন: "ঈশ্বর দেখছেন পাপের পরিণাম আছে, তা এক মুহূর্তের নিমিত্ত মনে উদয় হয় নাই। সত্যই অনুতাপে কি প্রায়শ্চিত্ত হয়? জগদীশ্বর, আমার কি মার্জনা আছে? প্রভু! অন্ধ চৈতন্যহীন, নবাবী গর্বে গর্বিত, বহু অপরাধে অপরাধী। কিন্তু দয়াময়—প্যাগম্বর বলেন তুমি দয়াময়, প্যাগম্বরের বাক্য রক্ষা করো, আমার অনুতাপ গ্রহণ করো!" যে প্রজাবৎসল মহান নবাব বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে দেশকে স্বাধীনতার যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে বক্তৃতা দিয়েছেন এই কি তাঁর স্বাভাবিক পরিণতি?

অবশ্য পলাশীর যুদ্ধের পরই কূটচক্রী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতীক ক্লাইভ সরে গেছেন। তাঁর স্থানে এসেছেন সহানুভূতি পরায়ণা মহিয়সী ইংরেজ নারী ওয়াটস-পত্নী। খোসবাগে দীপমালা শোভিত সিরাজের সমাধিমন্দিরে ঐ ওয়াটস-পত্নীসহ লুৎফাকে হাজির করে এবং তাকে দিয়ে গান গাইয়ে নাট্যকার নাটক যেভাবে শেষ করেছেন তাতে ফুটে উঠেছে শান্ত করুণ রস।

॥ **মীরকাসিম** ॥ গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক মীরকাসিম ১৯০৬-এ রচিত হয় এবং ১৯০৬-এর ১৬ জুন প্রথম মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। নাটকটি 'একাদিক্রমে সাত মাস কাল ধরিয়া প্রত্যেক শনিবারে মিনার্ভায় অভিনীত হইয়াছিল, অথচ উহা কাহারও নিকট পুরাতন হয় নাই। দর্শক সমাগমে ইহা সিরাজদ্দৌলাকেও অতিক্রম করে। এই বৎসর মিনার্ভা থিয়েটারের আয় লক্ষাধিক টাকা হইয়াছিল।" ['গিরিশচন্দ্র' : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, : পৃঃ ৫৪৬]।

সিরাজদ্দৌলা নাটকের মতই তৎকালীন জাতীয় ভাবাবেগকে মূলধন করে

মঞ্চ-সাফল্য সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেই মীরকাসিম নাটকটিও রচিত হয়েছিল। অভিনয়ের দ্বিতীয় রজনী থেকে নাটকের কিছু কিছু অংশ বাদ দিতে হয়েছিল;[৩০] সময় সংক্ষেপ করার জন্যেই যে এরূপ করা হয়েছিল সে কথা গিরিশচন্দ্রই লিখেছেন।

মীরজাফরের সিংহাসন চ্যুতি থেকে আরম্ভ করে মীরকাসিমের মৃত্যু পর্যন্ত এই নাটকের বিস্তৃতি। এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের দু'দিন আগে গিরিশ-চন্দ্রের স্বাক্ষরিত ইংরেজী ভাষায় লেখা যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় তাতে বলা হয় যে, 'মীরকাসিমের সিংহাসনে আরোহণ করার পরবর্তীকাল আমাদের দেশের ইতিহাসে এক উত্তেজনাপূর্ণ ও ঘটনাবহুল সময়। ঐ সময়ে যে চরিত্র এবং মহান ব্যক্তিরা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন আমি তাদের যথাযথভাবে বর্ণনা করার চেষ্টায় ত্রুটি রাখিনি। আমি কতটা সফল হয়েছি তা আমার দেশবাসী হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণই বিচার করে দেখবেন।'

এ থেকেই বুঝা যায় যে গিরিশ মীরকাসিমকে নিয়ে খাঁটি ঐতিহাসিক নাটকই রচনা করতে চেষ্টা করেছেন। নাটকটি সে যুগে সমালোচকদের যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত *Bengalee* পত্রিকা লিখেছিলেন: **"Babu Girish Chandra Ghose's new historical drama, 'Mir Kaseem' which was put on the boards of the Minerva Theatre for the first time on Saturday last, has been a phenomenal success, both from the histrionic and literary points of view. [23rd June, 1906]**।

বসুমতী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল: "গিরিশবাবু তাঁহার পরিণত বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতার সহায়তায় এই নাটকখানিকে তাঁহার স্বকীয় কীর্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন। এই স্তম্ভের বনিয়াদ হইতে চূড়া পর্যন্ত পাকা সোনায় গঠিত।······ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি মীরকাসিম প্রজাহিতৈষী নরপতি ছিলেন, ইংরাজ বণিকের কর্মচারীর হস্তের ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়া তিনি নবাবী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই তিনি ইংরাজের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন, হটিয়াছিলেন এবং শেষে সর্বস্ব বঞ্চিত হইয়া নিরাশ্রয় অনাথের ন্যায় মরিয়াছিলেন। এই কঙ্কালটুকু অবলম্বন

করিয়া এমন একখানি বিচিত্র ও বিপুল নাটক গিরিশচন্দ্র ভিন্ন অন্য কেহ রচনা করিতে পারিবেন কিনা জানি না।" [৩০ আষাঢ়, ১৩১৩]

সিরাজদ্দৌলা নাটকের বেলায় যেমন গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থটি অনুসরণ করেছিলেন, মীরকাসিম নাটক রচনার সময়েও তিনি অক্ষয়কুমারের 'মীরকাসিম'[৩১] গ্রন্থটি অনুসরণ করেন।

অক্ষয়কুমারের এই গ্রন্থে মীরকাসিমের দোষক্রটি স্বীকার করে নিয়েও দেখানো হয়েছে যে, তাঁর মধ্যে বহু সৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, স্বদেশের শিল্প বাণিজ্য রক্ষা করতে গিয়েই তাকে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল এবং প্রজারক্ষার জন্যই তিনি আত্মবিসর্জন করেছিলেন। এই জন্যে মীরকাসিমও সিরাজদ্দৌলার মত জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমারের মীরকাসিম ছাড়াও সমকালীন ইংরেজ ঐতিহাসিকদের গ্রন্থগুলি থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন। নাটকটিকে পাছে কেউ অতিরঞ্জন মনে করেন তাই তিনি সে যুগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্বলিত Col. Malleson-এর লেখা *'The Decisive Battles of India'* নামক গ্রন্থের 'Undwah Nala' শীর্ষক অধ্যায় থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন নাটকের ভূমিকায় : ···the annals of no nation contain records of conduct more unworthy, more mean, and more disgraceful, than that which characterised the English Government of Calcutta during the three years[৩২] which followed the removal of Mir Jafar. That conduct is attributable to one cause, the basest and meanest of all, the desire for personal gain by any means and at any cost. It was the same longing which has animated the robber of the northern clime, the pirate of the southern sea, which has stimulated individuals to robbery, even to murder. In point of morality the members of the governing clique of Calcutta from 1761 to 1763, Mr. Vansittart and Mr. Warren Hastings excepted, were not one whit better than the pespertrators of such deeds."

ইংরেজদের নতুন গভর্ণর ভ্যানসিটার্ট মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর

জামাতা মীরকাসিমকে নবাব করেন। কারণ, তখন পর্যন্তও ইংরেজরা সোজা-সুজি দেশের শাসনভার গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না—কোনও সাক্ষীগোপাল নবাবকে দাঁড় করিয়ে লুণ্ঠন চালানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। মীরকাসিমকে নবাব করার মূল্য স্বরূপ কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী দিতে হয়েছিল। পুরস্কারের নামে কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রচুর উৎকোচও আদায় করেছিলেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বাদশাহী ফরমানের বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশে বিনা শুল্কে মাল আমদানী করতে পারতো। এই অধিকার ছিল শুধু কোম্পানীর। কিন্তু ক্রমশঃ কোম্পানীর কর্মচারিগণ কোম্পানীর দোহাই দিয়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে এবং নবাবের প্রাপ্য শুল্ক ফাঁকি দিতে লাগলো। ফলে, নবাব প্রতারিত হলেন এবং দেশীয় বণিকেরা মার খেলেন। মীরকাসিম বার বার কলিকাতায় কাউন্সিলের কাছে ঐ ধরণের অবৈধ বাণিজ্যের প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু কোনও ফল না হওয়ায় তিনি শুল্ক একেবারে উঠিয়ে দিলেন। ফলে দেশীয় ও বিদেশীয় সকল শ্রেণীর লোক অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পেলো। ইংরেজ বণিকদের ক্ষতি হলো। স্বার্থে আঘাত লাগায় ক্রোধে অধীর হয়ে পাটনার কুঠির অধ্যক্ষ এলিস অতর্কিত ভাবে পাটনা অধিকার করলেন। মীরকাসিম এলিসকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করলেন। তখন কোম্পানীও মীরকাসিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। মীরকাসিম কাটোয়ার ও গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হলেন। এরপর উদয়নালার যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হয়ে তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্তু তাঁর ও নবাবের সম্মিলিত সৈন্যদল বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত হন [১৭৬৪]। মীরজাফরকে পুনরায় নবাবের পদে বসানো হয়। সর্বস্বান্ত অবস্থায় অল্পদিন পরেই মীরকাসিমের মৃত্যু হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়েই গিরিশচন্দ্র মীরকাসিম নাটক রচনা করেন।

ইতিহাসকে নাট্যকার মোটামুটিভাবে অনুসরণ করেছেন। এমন কি কোনও কোনও স্থলে যে সব ইতিহাসের বই থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন সেই সব বই-এর ভাষা পর্যন্ত হুবহু ব্যবহার করেছেন। যেমন: "...Our conduct will be recorded by Historian as attributable to one cause, the basest and meanest of all, the desire for personal gain by any means and at any cost. [*The Decisive Battles*

of India, Chapter vi] তুলনীয় : তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে হেষ্টিংস-এর উক্তি।

এই নাটক শেষ হয়েছে মীরকাসিমের মৃত্যু দৃশ্য দিয়ে এবং এই দৃশ্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কারণ মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে মীরকাসিমের মৃত্যু ঘটেছে, এমন কথা জানা যায় না। এ সম্পর্কে এ যুগের ঐতিহাসিকদের মন্তব্য এই : "Mir Kasim fled and led a wandering life till he died in obscrity near Delhi in 1777 A. D." ['*An Advanced History of India* Majumder, Roy Chauduri and Dutta, New York (1965) p. 672]

এই নাটকে 'তারা' নামে যে কাল্পনিক স্ত্রী চরিত্রটি প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত দেশাত্মবোধক বক্তৃতা দিয়েছে, গান গেয়েছে, সেই তারা রাজপুতনার চারণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে অথবা তার প্রথম আবির্ভাব দৃশ্যে তার ভূমিকা সেকস্‌পীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের Witch-এর ভূমিকার মত। তারার সর্বত্র অবাধ গতি—নবাব শিবিরে এবং কোম্পানীর শিবিরে। সবাইকে সে উপদেশ দেয়। সে যুগের উত্তেজিত আবহাওয়ায় তারার গান ও বক্তৃতায় আসর জমলেও ঐতিহাসিক নাটকে এই ধরণের চরিত্র সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত।

: ট্র্যাজেডী হিসেবে মীরকাসিম :

মীরকাসিম নাটকটিকে সার্থক ট্র্যাজেডী করে তোলা সহজ ছিল। কারণ সিরাজদ্দৌলার যে ভাবে দোষক্ষালন করে নিতে হয়েছে, মীরকাসিমের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন ছিল না। মীরকাসিম চরিত্রে কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও [যেমন সিরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, সিরাজের ধনরত্ন লুণ্ঠন, ভ্যান্সিটার্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র] বিদেশী ঐতিহাসিকেরাও বলেছেন :

"Mir Qasim was a genuine patriot and an able ruler, who quickly retrenched expenditure and supressed disorders." [*Rise and fulfilment of British Rule in India* by Edward Thompson and G. T. Garratt, Allahabad (1962) p. 100.]

ওয়ারেন হেষ্টিংস পর্যন্ত মীরকাসিম সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করেছিলেন : ..."esteemed a man of understanding, of an uncommon talent

for business, and great application and perseverance, joined to a thriftness, which how little soever it might ennoble his own character was a quality most essentially necessary in a man who had to restore an impoverished state and clear of debts which had been accumulating for three years before. [প্রাগুক্ত : পৃঃ ১০০]।

এমন একজন নবাবের সঙ্গে ইংরেজের বিবাদ বাধলো আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য অর্থাৎ নবাবের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের প্রশ্ন নিয়ে। এই দ্বন্দ্ব ক্রমশ: তীব্র হয়েছে, মীরকাসিমের উগ্র প্রতিশোধ স্পৃহা [তিনি দুইশত ইংরেজ বন্দী এবং রামনারায়ণ, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি রাজ্যের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করেন] এই দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করেছে। তবে তার পতনের মূল কারণ সেদিনের ভারতীয় সৈন্যদের অপদার্থতা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা। নতুবা ইউরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত ১৫ হাজার নবাব সৈন্য মাত্র ১,১০০ ইউরোপীয় ও ৪ হাজার সিপাহীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলো না কেন?

মীরকাসিমের পতনে সহানুভূতির উদ্রেক হয় ঠিকই, কিন্তু ট্র্যাজেডির নায়কের মত দৃঢ় মনোবল ও অমিত শক্তি নিয়ে মীরকাসিম প্রথম থেকেই দাঁড়াতে পারেননি। নাটকের সুরুতেই দেখি ইংরেজকে তিনি অপরাজেয় ভেবেই নিয়েছেন : "ইংরেজ শাসন! এ দুর্দমনীয় জাতিকে পৃথিবীতে কে আছে শাসন করবে? সকলের ধারণা ছিল যে ফরাসীরা বলবান। কিন্তু বার বার ইংরেজের হস্তে সে বল চূর্ণ হয়েছে। ওলন্দাজরা সাহস দিয়েছিল—ইংরাজ সংঘর্ষে ওলন্দাজ বাঙলা হতে বিতাড়িত প্রায়। ইংরেজ দমন!—এ বাতুলতা তোমার মস্তিষ্কে কি নিমিত্ত এলো!" [১।১]।

ইংরেজ সম্পর্কে এই মনোভাব নিয়ে এবং তাদের উৎকোচ দিয়ে যিনি ক্ষমতা লাভ করছেন তিনি যে দৃঢ়-চিত্ত নিয়ে সার্থকভাবে ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষে দাঁড়াতে পারবেন না, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। তা ছাড়া কোনও ঐতিহাসিক ঘটনাকেই পাশ কাটাতে বা বাদ দিতে চান নি নাট্যকার। দেশীয় মুৎসুদ্দিদের চক্রান্ত মীরকাসিমের সময় ছিল না তা নয়, কিন্তু চক্রান্ত দফায় দফায় বর্ণনা, মীরজাফরকে শেষ পর্যন্ত আবার নবাবী পদে বসানো কোনও ঘটনাই বাদ নেই। এরই মধ্যে বা কখনো মীরকাসিমকে ফকীর সাজিয়ে

তাঁর বেগমকে সেকস্‌পীয়রের কায়দায় বালক সাজিয়ে একেবারে জগাখিচুড়ী তৈরী করা হয়েছে—ট্র্যাজেডী বিসর্পিল গতিতে অগ্রসর হতে পারেনি।

: নাটকে দেশাত্মবোধ :

সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিম দু'টি নাটকেই নায়ক জাতীয় বীর। তাঁরা দু'জনেই স্বাদেশিকতার মূর্ত বিগ্রহ। তবে প্রথমোক্ত নাটকে শুধু স্বদেশী বক্তৃতার সাহায্যে দেশাত্মবোধের প্রচার হলেও গানগুলিকে সে কাজে ব্যবহার করা হয়নি। এই নাটকে নাগরিকেরা চারণের ভূমিকা গ্রহণ করেনি। যে মুর্শিদাবাদের নাগরিকেরা সিরাজের কলিকাতা বিজয় উপলক্ষ্যে আনন্দের গান গেয়েছে তারা কিন্তু সিরাজের হত্যাকাণ্ডের পর দেশাত্মবোধক কোনও গান গাইল না। তারা গাইল কোম্পানীর শাসনের গুণগান :

উড়েছে কোম্পানীর নিশান
বাহাদুর কলির ঠাকুর, ভুবন কাঁপায় যার কামান,
ভারি দবদবা এবার, জুলুম চলবে না আর কার,
বর্গি মগ হলো পগার পার···
সামনে এদের খাড়া হবে, দুনিয়াতে কার এমন জান্।
থাকবে না ডাকাতি, কুকি, আঁধার রেতে চোরের উঁকি,
থাকবে না আর কুলনারীর মানের দায়ে লুকোলুকি
এরা রাজার রাজা পালবে প্রজা, ছোট বড় এক সমান।

এই একটি গানই সিরজেদ্দৌলা নাটকের দেশাত্মবোধক আবেদনকে নষ্ট করে দিয়েছে।

মীরকাসিম নাটকে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম। এই নাটকে কল্পিত অবাস্তব চরিত্র তারার দেশাত্মবোধক বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে আছে দেশাত্মবোধক গান। তার আবির্ভাবই গান গাইতে গাইতে :

পরাধীনা জননী আমার
লাঞ্ছিত সন্তানগণ পীড়নে কঙ্কালসার॥
হৃদয়ে শোনিত নীর, কটিতটে জীর্ণ চীর,
নির্জীব আনত শির দেহ মাত্র তার,
রোগে জীর্ণ হীনবল, শোকে শুষ্ক হৃদিস্থল
দাবানল ক্ষুধানল, নেহারে আঁধার॥

নিরাশ বিকট হাস, নৃত্য করে মহাত্রাস,
বহে উষ্ম দীর্ঘশ্বাস আবাস কান্তার।

গানে লাঞ্ছিতা ভারত-জননীর কথা বর্ণনা করে তারা মীরকাসিমের সেনা-নায়ক তকী খাঁকে সম্বোধন করে বলছে : "বাবা শুনছো···চতুর্দিকে হাহাকার শব্দ শুনছো? অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, রোগ-শোক দৌরাত্ম্যে বঙ্গভূমি জর্জরী-ভূতা। বাবা উপায় কর। গেল...সকলি ছারখার হলো। দুঃখিনী মাতৃ-ভূমির দুর্দশা আর কতদিন দেখবে?"

শুধু মাতৃভূমির দুঃখ-দুর্দশা বর্ণনা নয়, তারা গানের মধ্য দিয়ে দেশের জন্য তকী খাঁকে প্রাণদানের সোজাসুজি আহ্বান করেছে :

দুঃখিনী সন্তান কি আছে তোমার
দান—প্রাণ দান—রুধির ধার
তাপিতা মাতা তাপ নিবার॥ [১।৪]

মীরকাসিমের বেগমের দু'টি গানও বীরত্ব-ব্যঞ্জক। তবে নর্তকীদের গানে ইংরেজের প্রতাপের দিকটাই ফুটে উঠেছে। এই সব গান ছাড়া তকী খাঁ, মীরকাসিম, সেনানায়ক লালসিং প্রভৃতির সংলাপের বহু স্থানে দেশাত্মবোধের নজির রয়েছে। যেমন :

মীরকাসিম॥ না, আমি বিলাসী নই, আমি স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমির নিমিত্ত কাতর। পারি, বাঙ্গলার উদ্ধার সাধন করবো, মুমূর্ষু মোগল-গৌরব পুনর্জীবিত করবো, বিদেশী দাম্ভিক মাতৃশোণিত শোষক ইংরাজকে বিতাড়িত করবো। [২।১]

তকী॥ [তারাকে] "মায়ি আজ তোর কাছে শিখলেম। ধর্ম শিখলেম, কর্ম শিখলেম, খোদার কার্য শিখলেম, জন্মভূমির জন্য বুকের রক্ত দিতে শিখলেম।" [১।৪]

লালসিং॥ [মীর কাসিমকে] "···পাটনার দুর্গ রক্ষার সময় হীনবুদ্ধি ইংরেজ বেতনভোগী স্বদেশীর প্রাণ বধ করেছি, কিন্তু তরবারি ইংরেজ শোনিতে রঞ্জিত হয় নাই। জীবনের উচ্চ কল্পনা সেই বিদেশী শত্রু রঞ্জিত তরবারি নবাব চরণে অর্পণ করবো, নচেৎ বক্ষের শোনিতে রণভূমি আরক্ত হবে।"

একদিকে এই সব দেশাত্মবোধক কথা যেমন নাটকে আছে তেমনি অন্য কথিত

'ছোট ইংরেজ' আর 'বড় ইংরেজ'-এর পার্থক্য দেখিয়ে বড় ইংরেজের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও নাটকের শেষ অঙ্কে রয়েছে। যেমন ইংরেজ সেনাপতি মেজর মনরো খোজা পিদ্রুকে বলছে : "মিষ্টার পিদ্রু, তুমি ইংরেজের সহিত বেড়াইতেছ, কিন্তু এখনো ইংরেজকে চিনো না। দু' একটা লোভী ইংরেজ দেখিয়াছ, তাই ইংরেজকে বুঝ না।...আমাদের অনেক কাজ করিতে হইবে। যদি কেউ এখানে অত্যাচার করে Parliament-এ তাহার impeachment হইবে। দু' একজন ইংরেজ অত্যাচারী হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জাতি ন্যায়বান, Europe-এ আমাদের ন্যায়বান বলিয়া প্রশংসা। ভারতে আমাদের শান্তি রাখিতে হইবে।" মনরোকে দিয়ে তো এমন কথা বলানো যেতেই পারে, বিশেষ করে গিরিশচন্দ্র যে তারাকে মূর্তিমতী দেশপ্রেমিক নারীরূপে গোটা নাটকে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়েছেন সেই তারার উক্তিই যখন এইরূপ : "আজ ভারত তোমাদের পদানত, আজ ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, শান্তিহীন প্রজাদল তোমাদের আশ্রিত। হিংসা, দ্বেষ, আত্মীয়-হত্যায় ভারত জর্জরীভূত! তোমাদের রাজ্যশাসনে তা দূর হবে। ভারতের শিক্ষাভার, রক্ষাভার ঈশ্বর তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন, তাই তোমরা পদে পদে জয়যুক্ত। ভারতে এসে তোমাদের জাতীয় গৌরব বিস্মৃত হয়ো না। তোমরা দীনরক্ষক নামে জগদ্বিখ্যাত। স্বাধীনতা তোমাদের জীবন, তোমাদের আশ্রয়ে অধীনতা শৃঙ্খল স্খলিত হয়।" [মেজর মন্‌রো, খোজা পিদ্রু, সাহ্ আলম ও ইংরেজ সৈন্যগণের সম্মুখে তারার বক্তৃতা (৫।৯[১])]।

॥ ছত্রপতি শিবাজী ॥ নিকটবর্তী কালের সিরাজদ্দৌলা এবং মীরকাসিমকে নিয়ে নাটক রচনার পর গিরিশচন্দ্র দূর কালের ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি রচনা করেন 'ছত্রপতি শিবাজী' [১৯০৭] নামক নাটক। শিবাজীর প্রতি গিরিশচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভঙ্গোত্তর স্বদেশী যুগে তিনি কুমুদবন্ধু সেনের কাছে শিবাজী সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেন তা এই : "সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগী ও অভিমান শূন্য না হলে কেউ দেশের প্রকৃত সেবা করতে পারে না।...এই দেখ চিতোরের মহারাণা প্রতাপসিংহ—তাঁর মত ত্যাগী, তাঁর মত বীর, তাঁর মত স্বাধীনতাপ্রিয়, তাঁর মত স্বদেশপ্রেমিক শুধু ভারতে কেন, জগতে দুর্লভ। কিন্তু আভিজাত্যের অভিমানে তিনি অম্বরের মানসিংহের সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন—তার শোচনীয় পরিণাম কালের সাক্ষী

ইতিহাস। এই স্থানে শিবাজী প্রতাপের অপেক্ষাও বড়।...শিবাজী নিঃস্বার্থ দেশসেবক।" ['গিরিশচন্দ্র ও নাট্য-সাহিত্য' : কুমুদবন্ধু সেন]

এই 'নিঃস্বার্থ দেশ সেবক'-এর বীর পূজার আয়োজন হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের নাটকে। নাটকের প্রথম অভিনয়ের দিন [মিনার্ভা থিয়েটার, ১৭ আগষ্ট, ১৯০৭] থিয়েটারের সত্বাধিকারী এম. এম. পাণ্ডে এবং ম্যানেজার এ. এন. দত্ত-এর স্বাক্ষরিত যে বিজ্ঞাপনটি প্রচার করা হয় তাতে বলা হয় : "Shivaji is a name to conjure with his spirit still lives amongst us and is sure to guide us to our salvation in our days of woe and distress. We venture to hope that his life and character will now be truly appreciated by our countrymen and the Maharatta and the Bengal will henceforth join hands in worshipping this Greatest Hero of Hindusthan."

অবশ্য বাঙালীরা এই নাটকটির জন্যে অপেক্ষা করেনি। কারণ, ১৯০২ খৃষ্টাব্দেই কলকাতায় শিবাজী উৎসবের সূচনা হয়েছিল। ঐ বছরেই অমরেন্দ্র দত্ত মনোমোহন গোস্বামীর লেখা 'রোসিনারা' নাটকটা অদল বদল করে 'শিবাজী' নাম দিয়ে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন [২২ মার্চ, ১৯০২]।

॥ শিবাজী প্রসঙ্গ ॥ মোগলের বিরুদ্ধে রাজপুতদের সংগ্রামের কাহিনী যেমন আমাদের দেশাত্মবোধের প্রেরণা জুগিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রেরণা জুগিয়েছে মোগলের বিরুদ্ধে শিবাজীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কাহিনী। বাল গঙ্গাধর তিলক মারাঠীদের সব চেয়ে প্রিয় দেবতা গণপতি [গণেশ]-কে নিয়ে 'গণপতি উৎসব'-এর প্রচলন করেন ১৮৯৩-এ। রায়গড়ে শিবাজী উৎসবের উদ্‌বোধন হয় ১৮৯৬-এর ১৫ এপ্রিল তারিখে। এর পরের বছর তিন দিন ব্যাপী [১৩-১৫ জুন] 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠিত হয় পুণায়। তিলক মারাঠী যুবকদের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় বীর শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসবের প্রচলন করেন। 'বিদেশী' মোগলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শিবাজী মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই শিবাজী উৎসবে শিবাজীর মত বীরত্বের সঙ্গে বিদেশী ইংরেজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্ম মারাঠী যুবকদের উদ্বুদ্ধ করা হতো।

মহারাষ্ট্রের অনুসরণে ১৯০২-এ কলিকাতায় শিবাজী উৎসবের সূচনা হয়

এবং এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। ১৯০৪-এ সখারাম 'শিবাজীর দীক্ষা' নামে যে পুস্তিকা রচনা করেন তার ভূমিকা স্বরূপ 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি রচনা করে দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সখারামের 'দেশের কথা' পুস্তকটি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে।

শুধু সখারামের 'শিবাজীর দীক্ষা' নয়, ইতিপূর্বে শিবাজী সম্পর্কে বাংলা ভাষায় একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর 'ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবন-চরিত' [১৮৯৫], সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-চরিত' [১৮৯৫, ২য় সং ১৯০৬]। এ ছাড়া জেমস্ গ্র্যানট ডাফ রচিত *'A History of the Mahrattas'* [1826] প্রমুখ কিছু ইংরেজী বই তো ছিলই। এই সব বই থেকে তথ্য আহরণ করে সমসাময়িক ভাবাবেগের ওপর গিরিশচন্দ্র 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকটি দাঁড় করান।

শিবাজীকে অবলম্বন করে জাতীয় ভাবাবেগ তখন তুঙ্গে উঠেছে। চার বছর ধরে শিবাজী উৎসব চলেছিল এই কলকাতা শহরে। চরমপন্থী স্বাদেশিকেরা বিশেষ করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে যে শিবাজী উৎসব সম্পন্ন হলো তার অঙ্গস্বরূপ ছিল 'ভবানী পূজা'। শিবাজী ছিলেন ভবানী দেবীর ভক্ত। তাই শিবাজী উৎসবে ভবানীর মূর্তি নির্মাণ করে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবালুতাকে উত্তেজিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন জাতীয় নেতারা।

সে যুগের জাতীয়তাবাদ বহুলাংশেই হিন্দু জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত হয়েছিল। তাই শিবাজীকে জাতীয় বীর রূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা করা গেল।

মডারেট নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত শিবাজী সম্পর্কে তাঁর *Bengalee* পত্রিকায় [25 April, 1996] লিখলেন: **"Sivaji was an expression of the periodic efforts made by Indian at unification of her different parts......we honour him because he was the last exponent of the great and glorious idea of a unified India."**

: শিবাজীকে নিয়ে নাটক :

শিবাজীকে নিয়ে প্রথম নাটক রচনার কৃতিত্ব ফকিরচাঁদ বসুর। তিনি 'শিবাজীর অভিনয়' নামে যে নাটক রচনা করেন সেই নাটকে তিনি শিবাজী তথা মারাঠী জাতির স্বদেশানুরাগের চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। নাটকটির নিবেদন অংশে

নাট্যকার বলেছেন—"আরঙ্গজেবের রাজত্বের সময় মহারাষ্ট্রীয়দের স্বদেশানুরাগ কতদূর প্রবল হোয়েছিল, তা-ই কেবল প্রদর্শন করা আমার উদ্দেশ্য।"

এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে তিনি ইতিহাসকে যে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন তাও নয়। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে: "শিবাজীর বৃত্তান্ত বোলেই যে ইহার বর্ণিত বিষয়গুলির সমুদয়ই ঐতিহাসিক সত্য; এরূপ বিবেচনা করবেন না। ইতিহাস লিখিত শিবাজীর তাবৎ স্বরূপ লক্ষণ বর্ণনা করা আমার অভিপ্রায়ও নয়।"

শিবাজীকে নিয়ে মনোমোহন গোস্বামীও একখানা নাটক রচনা করেন। তিনি ১৯০১-এ 'রোশিনারা' নামে যে নাটক রচনা করেন সেটা দ্বিতীয় সংস্করণে নাম পরিবর্তিত হয়ে "শিবাজী" নাম ধারণ করে। এই নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "যিনি মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় জীবন প্রদান করেন,—যিনি সামান্য জায়গীরদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অসামান্য প্রতিভাবলে সুবিশাল মহারাষ্ট্র রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া নষ্টপ্রায় হিন্দু ধর্মের পুনরুদ্ধার সাধন করেন, সেই মহাপুরুষ শূরশেখর শিবাজীর জীবনের কয়েকটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া আমার রোশিনারা নাটকখানি লিখিত হয়।"

গিরিশচন্দ্র শিবাজীর ওপর যে দৈব মহিমা আরোপ করেছিলেন সেটা যে নতুন কিছু নয় তা মনোমোহন গোস্বামীর নাটক পড়লেই বুঝতে পারা যায়। মনোমোহন তাঁর নাটকে শিবাজী চরিত্র উপস্থাপনের সময়ই রামদাস স্বামীকে দিয়ে ঘোষণা করিয়েছেন:

> "ভবানীর বরপুত্র তুমি।
> দেব-আঁখি ফেরে তব পাছে,
> ইষ্ট মন্ত্র দিয়েছি তোমায়
> জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।" [১।৩]

তবে মনোমোহন শুধু অপরের মুখ দিয়ে দৈব মহিমা ঘোষণা করেই নিরস্ত থাকেন নি, তিনি দেবী ভবানীকে সশরীরে উপস্থিত করিয়েছেন। এই দেবীগান এবং বক্তৃতার মাধ্যমে শিবাজীকে পরিচালিত করেছেন [১।৩], দিল্লীতে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক সপুত্র বন্দী শিবাজীকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়েছেন [৪।২]।

মনোমোহনের নাটকে নারীজাতির প্রতি শিবাজীর স-সম্ভ্রম আচরণ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কিল্লাদারের বন্দিনী পত্নী রোশিনারাকে শিবাজীর কাছে উপস্থিত করা হলে শিবাজী বলেছেন: "পরস্ত্রী হিন্দুর জননী, আজ

হতে তুমি আমার মা, আমি তোমার সন্তান।" [১।৫] অনুরূপ দৃশ্য গিরিশ-চন্দ্রের নাটকেও আছে ['ছত্রপতি শিবাজী', ১।৬]। শুধু তাই নয়, মনোমোহনের সদাশিব চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের হাতে 'গঙ্গাজী'তে পরিণত হয়েছে।

শিবাজীকে অবলম্বন করে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন নিয়ে গিরিশচন্দ্র শিবাজীর যে ছবি এঁকেছেন সেটাও তাঁর 'ছত্রপতি শিবাজীর' পূর্বে লেখা মনোমোহনের রোশিনারা-র [শিবাজীর] অনুসরণ। রোশিনারা নাটকের যে ভূমিকা থেকে আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে সেই ভূমিকাতেই আছে "মুসলমান অত্যাচারের চিত্র স্থাপন করাও পুস্তকখানির উদ্দেশ্য।" এই জন্যেই তাঁর নাটকে শিবাজীর মাতা জীজাবাঈকে বলতে শুনি :

অত্যাচার অত্যাচার যে দিকে নেহারি
ধর্মের এ অপমান সহিতে না পারি।
হিন্দুর মন্দিরে হেরি' গো-অস্থির রাশি,
ধৈরয ধরিতে নারি ;
হিন্দু কুলবালা যবে যবন পরশে
অমূল্য সতীত্ব-রত্নে দেয় জলাঞ্জলি। [১।৩]

শিবাজীও বলেন :

জন্মভূমি পর পদানত
বর্ণাশ্রম ধর্ম হের লুপ্ত প্রায় আজ
গো ব্রাহ্মণ সহে নিপীড়ণ,
শুনি ওই দেবতার করুণ ক্রন্দন
করিব কি জীবন ধারণ।" [২।১]

অবশ্য মনোমোহনের বঙ্গ-ভঙ্গোত্তর নাটক 'পৃথ্বিরাজ'-এও এই ধরণের যবন বিরোধী জেহাদ লক্ষণীয় :

"বীরের প্রধান ধর্ম স্বদেশ রক্ষণ
হিন্দুর প্রধান কার্য যবন নিধন।" [৩।২]

মনোমোহনের নাটকে দেশাত্মবোধের কথা আছে, তবে সেটা হিন্দু জাতীয়তা-বাদের কথা।

: গিরিশচন্দ্রের শিবাজী :

শিবাজী উৎসবকে অবলম্বন করে জাতীয় ভাবাবেগ যখন তুঙ্গে উঠেছে সেই সময় রচিত হয় গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক। এইরূপ আবহাওয়ায়

শিবাজীকে নিয়ে লেখা নাটক যে, প্রকৃতই একখানি মঞ্চ সফল নাটক হবে এটা গিরিশচন্দ্র জানতেন। তা ছাড়া শিবাজী চরিত্রের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র তাঁর ধর্মভাবাশ্রিত জাতীয়তার আদর্শের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। শিবাজীর সঙ্গে দেবী ভবানীর সম্পর্ক থাকায় গিরিশচন্দ্রের পক্ষে আরও সুবিধা হয়েছিল।

নাটকের ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন: "প্রবল প্রতাপ মোগল ও সমৃদ্ধশালী বিজাপুর—এই উভয় বল দমিত করে কিরূপে মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা সংস্থাপিত হইয়াছিল সে চিত্র প্রদর্শন এই নাটকের উদ্দেশ্য।" আবার কুমুদবন্ধু সেনকে বলেছিলেন: "শিবাজীতে এই আদর্শ দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, ধর্মের উপর ভিত্তি করে সনাতন ধর্ম রক্ষাব জন্য, অত্যাচারিত, দুর্বল, পীড়িতকে রক্ষার জন্য ত্যাগের উপর সেই মহাবীর মহারাষ্ট্র গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।" [গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য, পৃঃ ১২]।

নাটকের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত শিবাজী একজন অবতার বিশেষ। শিবাজীর মা জীজাবাঈ শিবাজী [শিব্বা] সম্পর্কে বলেছেন: "শিব্বা ভবানীর পুত্র, ভবানীর আদেশ পালন করবার জন্য আমাব গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে।" [১।১]। আরও স্পষ্ট করে জীজাবাঈ শিবাজীকে বলেছেন: "তুমি ভবানীর কার্যে অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছ, পুণ্যভূমি উদ্ধারেব জন্য তোমার জন্ম, সনাতন ধর্ম সংস্থাপন তোমার একমাত্র কর্ম। মহারাষ্ট্র স্বাধীনতার ধ্বজা ধারণ করবার জন্য তোমার বীরবাহু।" [১।২]। শেষ দৃশ্যে রামদাস স্বামীও শিবাজীকে বলেছেন: "বৎস, দেবকার্যে তুমি আবির্ভূত, দেবকাষ সুসম্পন্ন করেছ, উনবিংশ বর্ষব্যাপী ঘোর যুদ্ধে মুসলমান বল চূর্ণ করে বিরাট হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করেছ। তোমার নাম বিধর্মীর ভয়োৎপাদনকারী, স্বধর্মীর আনন্দবর্ধক, প্রতি হিন্দু-জিহ্বায় ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় উচ্চারিত।"

বঙ্গভঙ্গ যুগে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ভাল ভাবেই উপ্ত হয়েছিল। মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে সামান্য কিছু লোক বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন এবং 'বয়কট' আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। আর সবাই ছিল এর বিরোধী। সাম্প্রদায়িক মনোভাব যখন তীব্র সেই সময়ে মুসলিম লীগের পত্তন হয় [১৯০৬-এর শেষ দিকে]। লীগ প্রতিষ্ঠার দেড় মাস পরেই জামালপুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধে গেল। বাসন্তী প্রতিমা ভেঙে এবং হিন্দু নারীদের ওপর অত্যাচার করে মুসলমানেরা জানিয়ে দিল বয়কট আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের সংস্রব নেই।

ঢাকার নবাব সলিমুল্লা সাহেব কুমিল্লায় গেলে সেখানেও দাঙ্গা বেধে গেল। ভারতের প্রধান সহরগুলিতে মুসলিম লীগের শাখা অফিস স্থাপিত হলো। মুসলমান নেতারা হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের পার্থক্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে থাকলেন—নমাজ পড়া, রোজা রাখা, জাকাত দেওয়া, বকর ঈদে গরু কোরবানির দিকে জোর দেওয়া হলো। মুসলমানেরা 'ফেজ' মাথায় দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করলেন। ধর্মের নামে গো-হত্যা নিবারণের জন্য হিন্দুরা যে আন্দোলন করেছিলেন সেটাকে মুসলমান ধর্মের ওপরে হস্তক্ষেপ বলে প্রচারিত হলো। ফলে এক পক্ষ গো-রক্ষা এবং অপর পক্ষ গো-হত্যার প্রশ্ন নিয়ে পরস্পরকে তীব্র আক্রমণ করলো।

এই পটভূমিকায় 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক লেখা হয়। তার ফলে এই নাটকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা থাকলেও[৩৪] শিবাজীকে হিন্দুর জাতীয় নেতা হিসেবে দাঁড় করিয়ে তার মুখ দিয়ে নাট্যকারের সমসাময়িক কালের হিন্দুর ভাবাবেগকে উদ্বোধিত করাবই চেষ্টা হয়েছে এবং শিবাজী হয়েছেন অবতার। শিবাজী বলেছেন: "একবার নয়ন উন্মীলন ক'রে জন্মভূমির অবস্থা দেখুন, দেবভূমি আর্যভূমি বিধর্মী পীড়িত। যে গো-দুগ্ধে অসহায় বাল্যাবস্থায় শরীর পুষ্ট হয়, আপনার মাতৃভূমে সেই গো হত্যা নিত্য, উদাসভাবে আর কতদিন সহ্য করবেন? কতদিন আর স্বজাতির দুর্গতি দেখবেন? কতদিন দেবনিন্দা শুনবেন—কতদিন ধর্মের গ্লানি প্রতিমা ভঙ্গ উপেক্ষা করবেন?" [১।৩] অথবা: "আশ্চর্য এই, ইষ্ট পূজা করেন, প্রতিমা ভঙ্গ দেখেন, দুগ্ধ পান করেন, গোহত্যায় ক্ষুব্ধ নন, পিতৃমাতৃ তর্পণ করেন, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধা নাই।" [১।৩]

এরূপ যুগাতিক্রমের দোষ থাকলেও এবং নাটকের মধ্যে অবতারবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গি থাকলেও গিরিশচন্দ্র নাটকটিকে ঐতিহাসিক নাটক হিসেবেই রচনা করেছেন। ইতিহাসের মূল ঘটনা বর্ণনায় তিনি ইতিহাসের অমর্যাদা করেননি, নাটকে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ বা ক্ষুদ্র চরিত্র বর্ণনায়ও ইতিহাসের অনুসরণ করেছেন। শিবাজী চরিত্রের সৎ গুণগুলি এবং তাঁর কর্মচারীদের চারিত্রিক বিশেষত্বও তিনি যথাযথভাবেই বর্ণনা করেছেন।

যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁর '*Shivaji and his Times*' [1919] পুস্তকে এবং '*House of Shivaji*', [Calcutta (1955), p. 113-114] শিবাজী

চরিত্রের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে : "He was devoted to his mother, loving to his children, true to his wives a scrupulously pure in his relations with other women. Even the most beautiful female captive of war was addressed by him as his mother......In that age of religious bigotry, he followed a policy of the most liberal toleration for all creeds . There were many Muhammadan captains in Shivaji's army and his chief Admiral was an Abyssinian named Siddi Misri." যদুনাথের বইগুলি গিরিশচন্দ্রের নাটক লেখার সময় প্রকাশিত না হলেও শিবাজীর এই চরিত্র তিনি অন্য গ্রন্থেও পেয়েছেন। তার প্রমাণ এই নাটকেই পাওয়া যাবে। 'মুসলমান কুলনারীকে মাতৃ সম্বোধন', 'সমচক্ষে হিন্দু-মুসলমানকে দর্শন' করা 'মুসলমান সৈন্য দলভুক্ত' করা—সবই নাটকে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যুগের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কুলষিত আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে শিবাজীকে তিনি "শুভ হিন্দু স্বাধীনতার ভিত্তি রচয়িতা" হিসেবে দেখেছেন। এইখানেই এসেছে অসঙ্গতি। তা ছাড়া দীর্ঘ বক্তৃতা দানের প্রবণতা এবং সব ঘটনার সমাবেশের প্রচেষ্টা থাকায় নাটক দীর্ঘ হয়ে গেছে।

: ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য :

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে যাঁরাই নাটক লিখছিলেন তাঁরাই কিছু না কিছু ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। এই সময়ের ঐতিহাসিক নাটকের রচয়িতা হিসেবে গিরিশচন্দ্রের পরেই নাম করতে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের।

দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে কবি ও নাট্যকার। কাব্যধর্মিতা তাঁর নাটকে অনেকখানি প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তিনি পৌরাণিক নাট্যকাব্যও রচনা করেন এবং ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাট্যকাব্য নিয়েই।

ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল 'পাষাণী' [১৯০০] নামে যে পৌরাণিক নাট্যকাব্য রচনা করেন এবং ঐতিহাসিক নাটক শুরু করার পরেও 'সীতা' [১৯০৮], 'ভীষ্ম' [১৯১৪] প্রভৃতি যে সব পৌরাণিক নাটক লেখেন, দেখা যাবে যে সেগুলির প্রভাব ঐতিহাসিক নাটকেও রয়েছে।

॥ তারাবাই ॥ 'তারাবাই' [১৯০৩] দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রথম ইতিহাসাশ্রিত নাটক। অতি নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত এই নাটকটিকে নাট্যকাব্যই বলা উচিত। টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে এর নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে [Annals of Mewar, Chapter VIII : *Annals and Antiquities of Rajasthan*, Vol I]। নাট্যকার নাটকটির ভূমিকায় লিখেছেন : "এই নাটকের উপাদান টড্ প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত হইল। পৃথ্বীরাজ ও তারার কাহিনী এখনও রাজস্থানের চারণ কবি দ্বারা রাজপুতদের মনোরঞ্জনার্থে গীত হইয়া থাকে। 'When they assemble at the feast after a day's sport, or in a sultry evening spread the carpet in the terrace to inhale the leaf or take a cup of Kusumla, the tale of Prithwi recited by the bards in the highest treat they can enjoy.'

"আশ্চর্যের কথা এই যে, এই মহিমাময়ী কাহিনী অদ্যাবধি কোন বঙ্গীয় নাটকের বিষয়ভূত হয় নাই। আমি যদিও নাটকের মূল বৃত্তান্ত 'রাজস্থান' হইতে লইয়াছি, তথাপি অপ্রধান ঘটনা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইতিহাসের সহিত এই নাটকের অনৈক্য লক্ষিত হইবে"

নাট্যকার 'রাজস্থান' এ বর্ণিত মূল ঘটনাগুলিকে বিকৃত করেন নি, বরং অবিকল সেগুলি অনুসরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, নাটকের স্থানে স্থানে যে সংলাপ রচনা ক'রেছেন তা 'রাজস্থান' এ বিধৃত সংলাপের আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র।[৩৫]

মেবারের সিংহাসনকে কেন্দ্র ক'রে 'তারাবাই'-এর কাহিনী আবর্তিত। বৃদ্ধ রাণা রায়মলের মৃত্যু ঘটলে তাঁর তিন পুত্র সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ এবং জয়মল— এদের মধ্যে কে রাণা হবে তাই নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হ'লো। মুমূর্ষু রাণার শয্যাপার্শ্বে একদিন সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজ বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ায় রাণা ক্রুদ্ধ হ'য়ে পৃথ্বীরাজকে নির্বাসিত করেন এবং সঙ্গকেও রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। সঙ্গ নিরুদ্দিষ্ট হন। রাণা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জয়মলকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ব'লে ঘোষণা করেন। এদিকে তোড়ার অধিপতি সুরতান রাজ্যচ্যুত হ'য়ে সপরিবারে নির্বাসনে দিন যাপন করছিলেন। তাঁর কন্যা তারাবাই পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। জয়মল তাঁর প্রণয়াসক্ত হ'য়ে অশিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করায়, তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

রায়মলের ভাই সূর্যমল ছিলেন মেবারের সেনাপতি। তিনি তাঁর পত্নী তামসীর প্ররোচনায় মেবারের সিংহাসন অধিকারের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পৃথ্বীরাজ তারাবাইকে বিবাহ করেন এবং তাঁর সহায়তায় মেবারের বিদ্রোহ দমন করেন, সূর্যমলকে বন্দী করেন। রায়মল এবার পৃথ্বীরাজকেই সিংহাসন দানের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু রাণার ইচ্ছা পূর্ণ হলো না। রাণার কন্যা যমুনার বিবাহ হয়েছিল সিরোহীর অপদার্থ রাজা প্রভুরাওর সংগে। মেবারের সিংহাসনের ওপর প্রভুরাওর লোভ ছিল। তাই পৃথ্বীরাজ যেদিন তাঁর গৃহে অতিথি হ'লেন, সেদিন খাদ্যের সংগে বিষ মিশিয়ে তিনি পৃথ্বীরাজকে হত্যা করলেন। তারাবাইও আত্মহত্যা করলেন।

নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটকের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে রাজস্থান-এ বর্ণিত ঘটনাগুলিকে হুবহু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে একটি নাটকীয় কাহিনীতে সংহত করতে পারেন নি।

নাট্যকার নাটকের নামকরণ করেছেন 'তারাবাই'। অথচ তাঁকে কেন্দ্র ক'রে নাটকের কাহিনীও আবর্তিত হয় নি। তারাবাই চরিত্রটিকে নাট্যকার আদর্শায়িত ক'রে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই বীরাঙ্গনার মধ্যে পাণ্ডিত্য, যুদ্ধবিদ্যা এবং দেশপ্রেমের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর উক্তি :

"শিখিয়াছি বটে
শাস্ত্র-কথা, অস্ত্রচর্চা, গণিত, বিজ্ঞান।
ভালবাসা শিখি নাই। ভালোবাসা বুঝি
ধনীর সম্ভোগ। * * *
* * * বাঁধিয়াছি
প্রাণের সমস্ত বাঞ্ছা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়—
যতদিন নাহি উদ্ধারিব মাতৃভূমি,
অপর চিন্তারে স্থান দিব না অন্তরে। [২।৫]

যে মাতৃভূমি উদ্ধার ক'রবে তারই গলায় মাল্যদান করতে তারাবাই প্রস্তুত ছিলেন। জয়মলকেও তিনি তাঁর এই সংকল্পের কথা জানিয়েছিলেন। মেবার উদ্ধার যুদ্ধে তিনি পৃথ্বীরাজের সহযাত্রিণী। অবশেষে আত্মহত্যা ক'রে তিনি সহমরণের সতীত্বে সমুত্তীর্ণ হয়েছেন। এ সত্বেও কিন্তু তারাবাই কেন্দ্রীয় চরিত্র নয় এবং এই চরিত্র তেমন প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। তবুও যে তারাবাই-এর নামে নাটকের নামকরণ করা হয়েছে, তার একটি মাত্র কারণ, এই

আদর্শান্বিত চরিত্রটিকে নাট্যকার তুলে ধরতে চেয়েছেন, যদিও নাটকের ঘটনাবলীতে তার বিশেষ ব্যবস্থা রাখেন নি।

ইতিহাসের তারাবাই-এর চরিত্রে দেশাত্মবোধ আরোপ করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তারাবাই এর মাতার কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টিও দেশাত্মবোধের প্রেরণা থেকে। তিনি বার বার স্বামী সুরতানকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বতরাজ্য ফিরে পাবার জন্যে :

> পিঞ্জর স্বর্ণের যদি হয়, প্রিয়তম।
> তথাপি পিঞ্জর তাহা। স্বেচ্ছায় মানুষ
> হয় বনবাসী। কিন্তু প'রের অন্নে
> প্রাসাদে নিবাস হয় সুকারজনক ?[১।৩।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকে যে দেশাত্মবোধ রীতিমত প্রকট, এই প্রথম নাট্য-প্রচেষ্টাতেই তার উন্মেষ।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র পৃথ্বীরাজ। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের ভূমিকায় টড-এর রাজস্থান থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা থেকেই বুঝতে পারা যায় যে এই চরিত্রটিই তাঁকে বেশী আকর্ষণ করেছিল। এই পৃথ্বীরাজের শৌর্যবীর্য, দৃঢ় চরিত্র—সবই প্রদর্শিত হয়েছে, কিন্তু নায়কোচিত মহৎ গুণের কোনও পরিচয় তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে সে 'চিরদিন উগ্র অসংযত।' [৫।৭]। শুধু উগ্রতা ও অসংযত ভাব নিয়ে নায়ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একমাত্র শেষ দৃশ্যে তার বিষক্রিয়ায় মৃত্যু-ঘটনা দর্শক-চিত্তকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল ক'রে তোলে।

এই নাটকে সমালোচকরা শেকস্‌পীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রভাব চোখে প'ড়বার মত। কারণ লেডী ম্যাকবেথ যেমন তাঁর স্বামীর মনের উচ্চাশাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলেন, 'তারা-বাই'তেও সূর্যমলের স্ত্রী তমসা সূর্যমলের 'উচ্চাশার রুদ্ধদ্বারে' সবেগে আঘাত করেছেন।' [১।১]। 'ম্যাকবেথ'-এ ডাইনীদের ভবিষ্যদ্বাণীর মত চারণীর ভবিষ্যদ্বাণী সূর্যমলের উচ্চাশাকে বাড়িয়ে তুলেছে। সূর্যমলের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব তাঁকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কিন্তু শেক্সপীয়রের প্রভাবটা আদৌ গভীর নয়; কারণ, এই চরিত্র দু'টি ম্যাক্‌বেথ, লেডী ম্যাকবেথের মত সমুন্নতি লাভ করতে পারেনি। তমসা চরিত্র তো অতিনাটকীয়তার মধ্যে পরিণতি লাভ করেছে।

তারাবাই-এ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও শেকস্‌পীয়রের অনুকরণ করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন—"প্রথমে Shakespeare-এর অনুকরণে Blank verse-এ নাটক লিখতে আরম্ভ করি। 'তারাবাই' প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর—মাইকেলের ছন্দ মাধুরী ইহাতে নাই—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সংগে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল যে, অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না।"[৩৬]

দ্বিজেন্দ্রলালের অপর ঐতিহাসিক নাট্যকাব্যের নাম 'সোরাব-রুস্তম' [১৯০৮]। ফেরদৌসির 'শাহনামা' গ্রন্থের একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী অবলম্বনে এই নাট্যকাব্যটি রচিত হয়েছে। এরূপ জানা যায় যে মিনার্ভা থিয়েটারে অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত 'হিন্দা-হাফেজ' নামক বিয়োগান্তক গীতিনাট্য দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষুব্ধ হন এবং উক্ত থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে 'সুরুচি সঙ্গত' অপেরা রচনা করতে গিয়ে 'সোরাব-রুস্তম' রচনা করেন।[৩৭] এই নাটকের ভূমিকাতেও এর আভাষ আছে। কিন্তু নাট্যকার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, "ইহা অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে।" কথাটা ঠিক। নাটকের প্রথম অংশে রাজকন্যা তমিনা এবং তাঁর সখীদের গীতিপ্রধান রঙ্গরসিকতা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই লঘু তরল ভাবোচ্ছ্বাসের ভূমি থেকে কাহিনী ধীরে ধীরে অন্তর্দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে ভাবগাম্ভীর্যকে বরণ করেছে। কিন্তু এ সত্বেও এটি সার্থক ট্র্যাজেডী হতে পারেনি। এর কারণ সোরাব-রুস্তমের বিষয়বস্তু অপেরার উপযোগী নয়, এটা বীররসাত্মক বিষাদান্ত কাহিনী। এ কথা নাট্যকার নিজেও বুঝতে পেরে-ছিলেন। তাই অপেরায় আরম্ভ করে "ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ" করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি, নাটকটি তার ঐতিহাসিক মর্যাদাও অনেকাংশে হারিয়েছে।

প্রথমত নাটকটি আকারে ক্ষুদ্র। নাটকে চরিত্রগুলি প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ কম। আবার ক্ষুদ্রাকার নাটকেও বাহুল্য-দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে। নাটকে শেষ দু'টি দৃশ্যের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। আবার নাটকটি দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকেই সুরু হতে পারতো।

রুস্তম ট্র্যাজেডীর নায়ক। কিন্তু তার চরিত্রে নায়কোচিত গাম্ভীর্য অনুপস্থিত। রুস্তমের পুত্র সোরাবের চরিত্রও তেমন প্রস্ফুটিত হয়নি। এই নাটকের বিষাদান্ত পরিণতির জন্য দায়ী রুস্তমের স্ত্রী তুরাণ রাজকন্যা তমিনা। বিবাহের পর রুস্তম যাবার সময় বলেছিল যে, পুত্র হলে সে এসে তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তমিনার ভাষায়: "আমিই পাঠিয়েছিলাম তাঁরে মিথ্যা সমাচার যে, আমার কন্যা হইয়াছে; অবজ্ঞায় তাই বুঝি আসেননি তিনি।" [২।২]। এইখানেই ট্র্যাজেডীর বীজ নিহিত।

বিংশতি বৎসর নিরুদ্দেশের পর পুত্র সোরাবের সঙ্গে রুস্তমের দেখা হলো রণক্ষেত্রে। পিতৃদত্ত অভিজ্ঞান রুস্তমের নামাঙ্কিত কাঞ্চন-কবচ সোরাবের হাতে বাঁধা। যুদ্ধরত হয়েও রুস্তম নিজ পরিচয় গোপন করলেন এবং শেষে অন্যায় যুদ্ধে সোরাবকে ভূপাতিত করবার পর সোরাবের মৃত্যু-মুহূর্তে জানতে পারলেন যে তিনি পুত্রঘাতী। সব ব্যাপারটাই যেন খেয়াল ও ইচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সংঘটিত হয়ে গেল; ট্রাজেডীর রস তেমন জমে উঠলো না। বিদূষকের ভাঁড়ামি এবং অনেক হাল্কা গান দিয়ে নাটকটির ট্র্যাজিক রস অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। সর্বোপরি এই নাটকে গুস্তাহামের সেনাপতি হুজীরের কন্যা আফ্রিদ-এর যে চরিত্র আঁকা হয়েছে সেটা একেবারেই অসম্ভব। শেকস্‌পীয়রের অনুকরণে এই নারীকে পুরুষ বেশ সাজিয়ে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে বটে, কিন্তু চরিত্রটার ওপর এমন রঙ চড়ানো হয়েছে যে, তাকে রক্তমাংসের নারী মনে করাই যায় না। সে সোরাবকে ভালবাসে; কিন্তু সোরাব তার পিতৃহন্তা বলে তাকে বিবাহ করতে রাজী তো নয়ই, উপরন্তু তাকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায়। শেষ পর্যন্ত রুস্তম যখন সোরাবকে হত্যা করলো তখন সোরাবের রক্তে নিজের হাত রক্তরঞ্জিত করে নিজেই নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে দিল।

কোনও কোনও সমালোচক এই রোমান্টিক চরিত্রটির কল্পনার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক দেশপ্রেমের অনুভূতি লক্ষ্য করেছেন। যদিও দেশের শত্রু ও পিতৃহন্তার প্রতি প্রেমের দ্বন্দ্ব সামান্যই ফুটে উঠেছে [৩।৭] তবুও ঐরূপ অনুভূতি লক্ষ্য করা একান্তই কষ্ট কল্পনা। সখীবৃন্দের গানেও দেশাত্মবোধের কথা আছে [২।৭] তবে এ নাটকে সেটা মূল সুর নয়।

: রোমান্টিক ধর্মী তিনটি নাটক :

'রাণা প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' এবং 'মেবার পতন' এই তিনটি নাটক দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেন [১৯০৫-০৮] স্বদেশী আন্দোলনের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই নাটকের একটিতেও তিনি বাংলা দেশের পটভূমি গ্রহণ করেননি ; এমন কি পরবর্তীকালের একমাত্র সিংহল বিজয় ছাড়া আর কোনও ঐতিহাসিক নাটকেই বাংলার পটভূমি নেই। এগুলি দেশাত্মবোধক নাটক নিশ্চয়ই, তবুও তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

উদ্ধৃতি সহযোগে দেখান যেতে পারে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে অতীতের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল এবং সেটা শুধু রাজপুতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অতীতের গ্রীসীয়, রোমীয় সভ্যতা এমন কি ইতালীর জাতীয় অভ্যুত্থানকেও তিনি স্মরণ করেছেন।[৩৮] এমন কি মেবার পতন নাটকের অরুণ সিংহ যা বলেছে সেটাও তাঁরই কথা : "আমার কাছে বর্তমানের চেয়ে অতীত বড় মধুর বোধ হয়। বর্তমান বড় তীব্র, বড় স্পষ্ট। কিন্তু অতীতের চারিদিকে একটা কুজ্ঝটিকা ঘিরে আছে। অতীত যেন ঐ নীলিমার মত, উপন্যাসের মত, স্বপ্নের মত।" [২।৭]। এই অতীতচারিতা রোমান্টিকতার একটি লক্ষণ।

তবুও অতীতে পৌছতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, নন্দকুমার, প্রতাপাদিত্য এদের বেছে নিলেন না কেন ? একটা হতে পারে এই যে, এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে আগেই নাটক রচনা হয়েছিল। অবশ্য ইচ্ছা করলে দেশাত্মবোধক বহু বিষয়ই এই বাংলার মাটিতে খুঁজে পাওয়া যেতো। ১৭৬৩-৭৮-এর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে সুরু করে নীলচাষী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ওয়াহাবী বিদ্রোহ, ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ, ফকীর বিদ্রোহ—এমন প্রায় ৪০টি বিদ্রোহ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই বাংলায় সংগঠিত হয়েছে এবং এগুলির মধ্যে অনেকগুলিকে নিয়ে বর্তমান যুগে নাটক এবং যাত্রাপালাও রচিত হয়েছে। তিতুমীরের মত সংগ্রামী পুরুষের চরিত্রেরও অভাব ছিল না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি সেদিকে যায়নি। তাঁর মধ্যে দেশাত্মবোধ ছিল না—এ জন্যে নয়। প্রথমতঃ তিনি ছিলেন পরাধীন ভারতের সরকারী চাকুরিয়া। কর্মজীবন তার সুখের হয়নি, কারণ বহুক্ষেত্রে ওপরওয়ালাদের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেননি ; তাঁকে বদলির পর বদলি করে অতিষ্ঠ করে তোলা

হয়েছে। এ অবস্থায় বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এদেশীয় জনসাধারণের সংঘর্ষের কোনও কাহিনী নিয়ে নাটক লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

খুব অল্প বয়সেই তার মধ্যে দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত হয়েছিল—এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁর আর্যগাথার [প্রথম ভাগ] কবিতাগুলির একাংশ দেশাত্মবোধক কবিতা [স্বদেশ-স্তোত্র, ভারতমাতা, কেন রে ভারতবাসি, বিষণ্ণ ভারতী, জ্বালাও ভারত প্রভৃতি কবিতা স্মরণীয়]। পরবর্তী কালে তাঁর দেশাত্মবোধক ভাব আরও পরিস্ফুট হয়। ১৯০৫-এ [অর্থাৎ বঙ্গব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের সময়] একটি ঘটনা, যা দেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে [পৃঃ ৩৯৯] উল্লেখ করেছেন তাতে বলা হয়েছে: "সেদিন ১৬ই অক্টোবর, ৩০এ আশ্বিন—বাঙালীর সেই চিরস্মরণীয় 'অরন্ধন' ও 'রাখী বন্ধনে'র পুণ্যাহ। সেদিন সকাল বেলায় ৯।০ কি দশটা বাজিয়াছে এমন সময়ে 'কুন্তলীনের' 'হেমমোহন বসু' [এইচ. বোস] মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে আসিয়া 'ব্যস্ত সমস্তভাবে' তাঁহাকে বলিলেন—'আজ বিকালে গোল দিঘীতেও একটা প্রকাণ্ড সভা হবে। সেখানকার জন্য একটি গান লিখে দিন। এখনই চাই—ছাপতে হবে। বসু মহাশয়কে বিদায় দিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল তদ্দণ্ডেই আমার সম্মুখে বসিয়া অনধিক দশ-পোনের মিনিটের মধ্যে একটি আশ্চর্য-রকমের গান—ঠিক যেন খেলার ছলে, রচনা করিয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ইহা কুন্তলীন' প্রেসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অপরাহ্ণ কালে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং একটি দলের নায়ক হইয়া, বাগবাজারে পশুপতিবাবুর সুবিশাল গৃহ-প্রাঙ্গণে গমন করিলেন; এবং সেই সম্মিলিত প্রমত্ত জন-সমুদ্রের মধ্যে স্বরচিত সঙ্গীত সুধার সঞ্জীবনী স্রোতধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন।"

তবে লক্ষ্য করবার বিষয় তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলিতে জাতির অতীত গৌরবের কথাই বেশী এবং দেশের লুপ্তগরিমার কথা বলেই জাতিকে উদ্বোধিত করার প্রচেষ্টা। এই দিক থেকে তিনি রাজপুতনায় গিয়েও পৌচেছেন:

> …ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি—
> করো না করো না তার অপমান
> নাই কি চিতোর, নাই কি মেওয়ার
> পুণ্য হলদিঘাট আজও বর্তমান?…[আর্যগাথা, ১ম ভাগ]

এক দিকে সরকারী চাকুরী, অন্যদিকে দেশাত্মবোধ—এই দুই-এর দ্বন্দ্বে তাঁর দেশাত্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে অতীত রাজপুতনার প্রান্তরে মোগল-রাজপুতের সংঘর্ষের মধ্যে। তবে লক্ষণীয় গিরিশচন্দ্রের মত পুরাণাশ্রয়ী ভক্তি-ভাব তাঁর মধ্যে ছিল না এবং জাতীয়তাবোধের মধ্যে ধর্মভাবও ছিল না—তাই সেদিক থেকে তাঁর নাটক মুক্ত। কিন্তু সুদূর অতীতের একটি বিশেষ ধরণের সংঘর্ষকে অবলম্বন করে বিশ শতকের দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে গিয়ে তিনি নাটককে রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন।

বিশ শতকের দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রেও তাঁর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। সে সময়ের জাতীয় ভাবালুতার দ্বারা তিনি পরিপূর্ণ আচ্ছন্ন হন নি। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের আবহাওয়ার মধ্যে দেশাত্মবোধক নাটক লিখেছেন বটে, কিন্তু সেগুলির মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে তার নিজস্ব বিশ্বাসই প্রতিফলিত করিয়েছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন: "দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর তথাকথিত দেশাত্মবোধক নাট্য রচনাগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার বিশিষ্ট সমাজ-চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে—কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ আচার-দুষ্ট সমাজ যে কোনদিনই জাতীয় কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে না, তিনি এই কথাই বিশেষ করিয়া নাটকগুলির মধ্যে বলিতে চাহিয়াছেন।" [বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস: ২য় খণ্ড, ১৯৭১, পৃঃ ৩৯৪-৯৫]।

যে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে দেশের এক বৃহৎ অংশ আন্দোলনে সামিল দ্বিজেন্দ্রলাল সেই বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সমর্থন করেছেন [দেবকুমার রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৩২৮, পৃঃ ৩৯৯]। তিনি এর একটা 'bright side'ও লক্ষ্য করেছেন [ঐ, পৃষ্ঠা ৩৯৫]। এই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে 'দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না' এবং এ কথাও সত্য যে, 'স্বদেশী সভায় বক্তৃতা দিয়া লোক মাতাইতে দ্বিজেন্দ্রলাল কোনও দিন আসরে নামেন নাই।' [ঐ, পৃঃ ৩৯০]। নতুন যে জাতীয়বাদের জাগরণ তখন দেখা গেল সে সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিশ্বাস ছিল যে, 'যতদিন আমাদের সামাজিক অনেক প্রথা উঠিয়া না যায় অর্থাৎ সময়ানুরূপ সংস্কৃত না হয়, ততদিন আমাদের politically এক হওয়া অসম্ভব' [ঐ পৃঃ ৪৩৮]। তাঁর দেশাত্মবোধক নাটকগুলিতে তিনি শুধু ঐ কথাই বলতে চেয়েছেন: "গিয়েছে দেশ দুঃখ নেই, আবার তোরা মানুষ হ।"

একথা সত্যি যে, তিন বছর বিলাতবাসের জন্যে তাঁকে সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল। তার প্রতিক্রিয়ায় তিনি তৎকালীন 'সমাজ সংরক্ষকদের' প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন তাঁর প্রহসনগুলিতে। কিন্তু দেশাত্ম-বোধক নাটকগুলিতে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের পরিবর্তে দেশবাসীকে আত্মোন্নতিতে প্রবুদ্ধ করতে চাইলেন। দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লেখা পত্রগুলিতেই দেখা যাবে দ্বিজেন্দ্রলাল বলছেন: "বয়কটের দ্বারা পরিণামে সর্বনাশ হবে।" "এ দেশে যদি আজ পর প্রসঙ্গ ও বিলাতির বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রকৃত আত্মোন্নতি—নিজেদের কল্যাণ সাধনে তৎপর হয় তবে এমন কোনও শক্তি নাই যে তাহার সে বলদৃপ্ত গতি রোধ করিতে পারে।" তিনি কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন 'শুধু বক্তৃতা'র নিন্দা করেছেন, 'আত্মসর্বস্ব, নাম কা ওয়াস্তে নেতাদের' সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং সোজাসুজি বলেছেন: "কেবল ভাব প্রবণতা, উত্তেজনা বা feeling কবির কাজ হইতে পারে, patriot কর্মীর কাজ নহে।" [দেবকুমার রায়চৌধুরী: 'দ্বিজেন্দ্রলাল': ১৩২৮]। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক নাটকেও এই ধরণের বক্তৃতার পর বক্তৃতা। অর্থাৎ নাট্যকার তাঁর নাটকগুলিতে যেন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছেন।

সে যুগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর অনেকের মধ্যেই রাজভক্তি প্রবল ছিল—ইংরেজ শাসনের সুফলই তাঁদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। ইংরেজের কাছে অনেক শেখবার ছিল, তাদের সঙ্গে বিবাদ করে সেই শিক্ষা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি একথা তো তিনি বলেছেনই, উপরন্তু একথাও তিনি বলেছেন: "আজ যদি ধর—এই ইংরেজ রাজ এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় তা হইলে আমাদের যে কি ভয়াবহ ও শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ায় আমি তা কল্পনা কর্তেও শিউরে উঠি।" [দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত পত্র]। এই মনোভাব যে নাট্যকারের তিনি যে, সমসাময়িক উত্তেজনাকে উত্তপ্ত করার জন্যে নাটক লিখবেন না—এটা বুঝতে কষ্ট হয় না, অথচ সেই উত্তেজনাকে অস্বীকার করার উপায় তাঁর ছিল না বলেই কয়েকখানি তথাকথিত দেশাত্ম-বোধক নাটক লিখেছিলেন।

॥ রাণা প্রতাপসিংহ ॥ তারাবাই নাটকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন যে, "নাটক ইতিহাস নহে।" কিন্তু কার্যতঃ ঐ নাটকে ঐতিহাসিক তথ্যকেই তিনি বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের মুখে

দাঁড়িয়ে তিনি প্রথম যে ঐতিহাসিক নাটক লিখলেন, তাতে দেশাত্মবোধের আদর্শ প্রাধান্য পেলো এবং সেই অনুসারে ঐতিহাসিক তথ্যের সংগে কল্পনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলো। এই নাটকটির নাম রাণা প্রতাপসিংহ [১৯০৫]।

এই নাটকের কাহিনীও টডের 'রাজস্থান' থেকে গৃহীত।[৩৯] ইতিপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও রাণা প্রতাপের কাহিনী নিয়ে 'অশ্রুমতী' নাটক রচনা করেন এবং তাঁরও অবলম্বন ছিল 'রাজস্থান'। তবে উভয়ের কাল্পনিক অংশ স্বতন্ত্র,—যদিও উভয়েরই প্রেরণা দেশাত্মবোধ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের সুরু প্রতাপসিংহ কর্তৃক মানসিংহ-এর অপমানের ঘটনা দিয়ে; দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সুরুই দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে! কমলমীরের কাননাভ্যন্তরে মেবারের রাজ্যভ্রষ্ট রাণা প্রতাপসিংহ সর্দারগণসহ কালী মূর্তির সম্মুখে রাজধানী চিতোর উদ্ধারের জন্যে কঠিন শপথ গ্রহণ করলেন। রাজপুতনার সর্বত্র মোগলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, প্রতাপ-সিংহ পরিবার-পরিজন সহ অরণ্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, মেবারের অধিবাসীরা মেবার ত্যাগ করেছে, মেবারের স্বর্ণপ্রসূ ভূমি অকর্ষিত, চিতোর জয় ক'রেও মোগলেরা মেবারের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। মোগল সম্রাট আকবর প্রতাপকে বশীভূত করার জন্য বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। তাঁর প্রধান সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপ কর্তৃক অপমানিত হয়েছিলেন। এই মানসিংহের উপরই সেনাবাহিনী পরিচালনার ভার অর্পিত হলো। হলদিঘাটের রণক্ষেত্রে প্রতাপের সৈন্য অসীম বীরত্বের সংগে লড়াই ক'রে পরাজিত হলো; প্রতাপের অশ্ব চৈতক তাঁকে নিয়ে পলায়ন করলো। মোগল সৈন্য তাঁকে বন্দী করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ত সর্দারেরা তাঁকে রক্ষা করলেন। তিনি পরিবারবর্গ সহ গভীরতর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শত দুঃখ কষ্টেও তিনি মাথা নত করলেন না। নিজ অনুচরদের সাহায্যে জীবনের শেষ ভাগে মেবারের কিছু অংশ তিনি উদ্ধার করলেন, কিন্তু চিতোর উদ্ধার করা আর সম্ভব হলো না।

এই ঐতিহাসিক কাহিনীর সংগে প্রতাপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্তসিংহ ও সম্রাট আকবরের ভাগিনেয়ী দৌলতউন্নিসার প্রেম ও বিবাহের কল্পিত কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই নাটকেও ইরা নামে প্রতাপসিংহের এক কন্যাকে

দেখানো হয়েছে, তবে যে উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অশ্রুমতীকে ব্যবহার করেছিলেন সে উদ্দেশ্যে ইরাকে ব্যবহার করা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ইরার তেমন কোন গুরুত্বও নেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' নাটকে সংযোজিত রোমান্টিক কাহিনী যেমন প্রাধান্য বিস্তার ক'রেছে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তা করেনি। সেই দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের মর্যাদা বেশী রক্ষা করেছেন।

অবশ্য এই নাটকের ঐতিহাসিক চরিত্রের সব ক'টিকেই পরিচিত ঐতিহাসিক তথ্য অনুসরণে বিন্যাস করা হয় নি। প্রতাপসিংহ জাতীয় বীর হিসেবেই প্রতিভাত। এই চরিত্রের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যকে হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে। তাঁর অসীম বীরত্ব, উজ্জল স্বদেশ প্রেম এবং অপূর্ব ত্যাগের চিত্র নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। ঐতিহাসিক নাটক লিখতে হ'লে শুধু ইতিহাসের ঘটনার ছাঁচে ঐতিহাসিক পুরুষকে সন্নিবেশিত ক'রলেই হবে না, তাঁর অন্তরালবর্তী ব্যক্তি পুরুষকে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত ক'রে তুলতে হবে। প্রতাপসিংহের চরিত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে তার দেশপ্রেম এবং আদর্শবাদ বেশী প্রকটিত। শুধু তাই নয়, তাঁর কুলমর্যাদাবোধ এত বেশী মাত্রায় জাগ্রত যে, তার কাছে শাশ্বত মানব-ধর্মও স্থান পায় না। বংশ গৌরব রক্ষার জন্যে ভাই, স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ করতেও তিনি প্রস্তুত [পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য দ্রষ্টব্য]।

শক্তসিংহ ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে তার নব রূপায়ণ ঘটেছে। তিনি চরিত্রটিকে জটিল ক'রে তুলেছেন। সম্রাট আকবর শক্ত-সিংহের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: "যুবকটি বিদ্বান, নির্ভীক, ব্যঙ্গ প্রিয়। সে এ বিশ্বজগতে স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পায় নি। তবে ধাতু খাঁটি···।" তিনি আরও বলেছেন যে, শক্তসিংহ চান "প্রতিহিংসা নয়, প্রতিশোধ। প্রেম কি হিংসা লোকটার মনে প্রবেশ করে নি। যার যতটুকু পাওনা, শেষ ক্রান্তি পর্যন্ত তা মিটিয়ে দিতে চায়, তার যতটুকু দেনা, শেষ ক্রান্তি পর্যন্ত আদায় কর্তে চায়। লোকটা ধর্ম মানে না, কিন্তু বংশ-পরিচয় মানে।" [১।৬]। সম্রাট আকবরের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার নিজেই এইভাবে শক্তসিংহের চরিত্রের সূত্র দান করেছেন। প্রথম অঙ্কেই এই চরিত্র-সূত্র দান করার কারণ শক্তসিংহকে যেভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন তার হুবহু প্রতিচ্ছবি ইতিহাসে এমনকি 'রাজস্থান'-এও পাওয়া যায় না।

শৈশব থেকেই জন্মভূমির সংগে শক্তসিংহের সম্পর্ক এক রকম ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। জন্মভূমির প্রতি তাঁর মধ্যে তাই স্বাভাবিক আবেগ নেই; বরং সংশয়বাদী দার্শনিকের মন নিয়ে, যুক্তির কষ্টিপাথরে তিনি জন্মভূমির প্রতি তাঁর আকর্ষণ, কর্তব্যকে বিচার করতে চান—"জন্মভূমি? আমি তার কে? সে আমার কে? আমি এখানে জন্মেছি বলেই তার প্রতি আমার কর্তব্য নাই। আমি এখানে না জন্মে সমুদ্র বক্ষে বা ব্যোমপথে জন্মাতে পারতাম।" [১।১]। এই মনোভাব যাঁর, তিনি ভ্রাতার ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে অনায়াসেই মোগল পক্ষে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু বংশ গরিমা তাঁর মধ্যে তখনও পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। তাই তিনি আকবরের সামনে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন: "রাজপুত বন্ধুত্বেও রাজপুত, প্রতিহিংসায়ও রাজপুত। আমি ধর্মে অবিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী সমাজদ্রোহী বটে। কিন্তু আমি রাজপুত।" [১।৬]। এই রাজপুত আদর্শ সদা জাগরূক থাকাতেই তিনি যাঁর ওপরে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে মোগল পক্ষে যোগ দিয়েছেন সেই ভ্রাতা প্রতাপসিংহকে মোগল সৈনিকদের হাত থেকে রক্ষা করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। "বীরের আদর্শ, স্বদেশের রক্ষক, রাজপুত কুলের গৌরব প্রতাপকে" তিনি ঘাতকের হাতে মরতে দিতে পারেন নি।

নারী সম্পর্কে শক্তের মনোভাব একেবারে নারীবিদ্বেষী জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের মত। যে নারী দৌলৎউন্নিসা তাঁকে গভীর ভাবে ভালবেসেছে, এবং যে নারীর কৃপায় সে মুক্তিলাভ করেছে সেই নারী সম্পর্কে তাঁর উক্তি: "এই ত নারী। নেহাৎ অসার। নেহাৎ কদাকার। আমার লালসায়মাত্র তাকে সুন্দর দেখি।" [৪।১]। শুধু নারীই বা কেন শক্ত মনুষ্যবিদ্বেষী বললেই হয়।

শেষ পর্যন্ত প্রতাপসিংহের বীরত্ব ও দেশপ্রেম তাঁকে মুগ্ধ ক'রেছে, দৌলতউন্নিসার অবিচলিত প্রেম ও বীরত্বে তিনি অভিভূত হয়েছেন এবং প্রকৃত পক্ষে এই দু'জনের আদর্শ শক্তসিংহের জীবনে নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছে। তাই তিনি বলেছেন: "আমি পুরুষকে স্বার্থপরই ভেবেছিলাম। তুমি দেখিয়ে দিলে পৃথিবীতে ত্যাগের মহামন্ত্র। আমি নারীকে তুচ্ছ, অসার, কদাকার জীব ব'লে মনে করেছিলাম, সে [অর্থাৎ দৌলতউন্নিসা] দেখিয়ে দিলে নারীর সৌন্দর্য।" [৫।৩]।

'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকের মানসিংহ অনেক বেশী ইতিহাস অনুসারী। মানসিংহ প্রতাপ কর্তৃক অপমানিত হয়েছেন কিন্তু 'অশ্রুমতী' নাটকের মানসিংহের মত তিনি প্রতাপ দুহিতাকে অপহরণ করার চক্রান্ত করেন নি, তিনি প্রকৃত বীরের মতই প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রতাপের গুণাবলীর প্রতি তিনি সশ্রদ্ধ। এই মানসিংহকে অবশ্য নাট্যকার তাঁর নিজস্ব বক্তব্য প্রচারের কাজে ব্যবহার করেছেন। হিন্দু সমাজের অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা জাতীয় জীবনকে পঙ্গু ক'রেছে, তার সঙ্গে "আলস্য, ঔদাসীন্য নিশ্চেষ্টতা', এ সবের ফলে জাতীয় জীবনে পচন ধ'রেছে [৫।৬]—মানসিংহের মুখ দিয়ে জাতির অধঃপতনের এই সব কারণ নির্দেশ করা হয়েছে।

নাট্যকার বার্নাড শ'-এর মতই দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্ট অনেক চরিত্রই 'pupets', চরিত্রগুলি তাঁর মতাদর্শ প্রচারের বাহন। 'রাণা প্রতাপসিংহ'-এ ইরা, মেহেরউন্নিসা ও দৌলতউন্নিসা— এই কাল্পনিক চরিত্রগুলি এই উদ্দেশ্যেই রচিত। প্রতাপসিংহের কন্যা ইরা স্বদেশপ্রেমিক, সে যুদ্ধের বিরোধী। তার কাছে দেশপ্রেমের চেয়ে বিশ্বপ্রেম বড়, পরোপকার বৃত্তি ও মনুষ্যত্ব বড়। প্রতাপসিংহের প্রতি তার উক্তি: "স্বর্গ কোথায়!—স্বর্গ আকাশে? না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন সে স্বর্গ হবে। যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি বিরাজ কর্বে যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে—সেই স্বর্গ।" [৩।৭]। ইরা কখনও কখনও দার্শনিকের মত বক্তৃতা দিয়েছে।

দৌলতউন্নিসার মধ্যে রয়েছে প্রেমের বিশ্ববিজয়ী মহিমা। প্রেম যেখানে গভীর সেখানে আনুষ্ঠানিক বিবাহ বা শাস্ত্রসম্মত বিবাহ না-ই বা হ'লো—এই হচ্ছে তার অভিমত। তাই সে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছে—"বিবাহের শাস্ত্র এক। সে শাস্ত্র ভালবাসা। যে বন্ধনকে ভালবাসা দৃঢ় করে, শাস্ত্রের সাধ্য নাই যে সে বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল করে।" [৩।৩]। যাঁকে পতি ব'লে সে গ্রহণ করেছে, তাঁর পথই তার পথ। এই পথের পথিকরূপে সে 'মহিমান্বিত, বিশ্ববিজয়ীরূপে মণ্ডিত।'

মেহেরউন্নিসাকে প্রথম দৃষ্টিতে একটু প্রগলভ মনে হ'তে পারে, কিন্তু শক্তসিংহকে ভালবেসেও সে দৌলতকে সুখী করার জন্যে স'রে দাঁড়িয়েছে। তাঁকে দিয়ে নাট্যকার নারীধর্মের উপরে বক্তৃতা করিয়েছেন। সে আকবরকে বলছে

: "পিতা এতদিনে বুঝেছি, যে নারীর কর্তব্য তর্ক করা নহে, সহ্য করা, নারীর কার্য বাহিরে নয়, অন্তঃপুরে, নারীর ধর্ম স্বেচ্ছাচার নয়।" [৫।৫]। শক্তসিংহ ও দৌলতউন্নিসার বিবাহ সমর্থন করতে গিয়ে আকবরের সম্মুখে সে ধর্ম সম্পর্কে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেছে—"ধর্ম এক! ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থ-পরতায়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে তাকে বিকৃত করেছে। ধর্ম! আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে চেয়ে দেখুন পিতা, সুপ্রসন্না শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন মহারাজ! সেই এক নাম লেখা, সে নাম ঈশ্বর। মানুষ তাকে পরমব্রহ্ম, আল্লা, জিহোভা, এই সব ভিন্ন নাম দিয়ে পরস্পরকে অবজ্ঞা কচ্ছে, হিংসা কচ্ছে, বিবাদ কচ্ছে! মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে ব'লে তারা ভিন্ন নয়।"......[৩।৫]। ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক ধর্ম পৃথক হলেও সবারই উপাস্য এক এবং ধর্ম-পার্থক্যের জন্যে মানুষের সামাজিক মিলনে বাধা থাকতে পারে না—এটাই বলতে চেয়েছে মেহের-উন্নিসা।

প্রতাপসিংহের স্ত্রী লক্ষ্মী, পৃথ্বীরাজের স্ত্রী যোশী,[৪০] এরাও স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। লক্ষ্মী প্রতাপের যোগ্য স্ত্রী—সন্তানদের চেয়েও তাঁর কাছে দেশ বড়। আর যোশী তার বিলাসপ্রিয় আকবরের অনুগৃহীত স্বামীকে তার তেজস্বিতা, দৃঢ়তা ও স্বজাতিত্ববোধের দ্বারা উদ্বোধিত করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্রাট আকবরের চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করেছেন তাতে তাঁর নিজের মনেই প্রশ্ন ছিল। তাই নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "অনেকে ভাবিবেন এ গ্রন্থে আমি সম্রাট আকবরের চরিত্র মূল হইতে অন্যান্যরূপে বিকৃত করিয়াছি। তাহা করি নাই, আকবরের চরিত্র আমি ঐরূপই বুঝিয়াছি। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুও ঐরূপই বুঝিয়াছিলেন।"

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে আকবর চরিত্রের নতুনভাবে মূল্যায়ণ করেছেন। তাঁর আকবর চরিত্রে কিছুটা উদারতা ও গুণগ্রাহিতা আছে সন্দেহ নেই, তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাও ইতিহাস সম্মত। তাঁর 'দীন ইলাহী' ধর্ম সম্পর্কেও ইঙ্গিত আছে মানসিংহের উক্তিতে: "তিনি পণ্ডিত-মোল্লার সাহায্যে এক ধর্ম স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন যা উভয় জাতি বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করতে পারে।" [৫।৬]

আকবর চরিত্রের নতুন মূল্যায়ণের চেষ্টা হয়েছে দু'টি দিক থেকে।

শক্তসিংহ সেলিমের কাছে আকবর চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন: "তিনি এক কূট বিবেকহীন, কপট রাজনৈতিক" [৩।১]। তিনি রাজপুতের বিরুদ্ধে কৌশলে রাজপুতকে ব্যবহার করেছেন, তিনি যে রাজপুত রমণী বিবাহ করেছেন তা যে রাজনৈতিক প্রয়োজনে এ কথাও তিনি গোপন রাখেননি [তৃতীয় অঙ্ক-পঞ্চম দৃশ্যে মেহেরের নিকট তাঁর উক্তি স্মরণীয়]। স্ত্রীকে তিনি সম্মান দানে রাজী নন। তাঁর বক্তব্য: "স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী, স্ত্রী প্রয়োজনীয় পদার্থ। সম্মানের বস্তু নহে।" [৩।৫]। দ্বিজেন্দ্রলাল আকবরকে রীতিমত কামান্ধ প্রতিপন্ন করেছেন। পৃথ্বীরাজের স্ত্রী যোশী তাঁর সতীত্বের অবমাননায় আত্মঘাতী হয়েছেন; এই পরিণতির জন্যে আকবরই দায়ী। এমন কি তিনি নিজেই নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন: "এমন কামের বশ হয়ে রাজপুত রাজগণের সম্প্রীতি হারিয়েছি"। [৫।৫]। একথা ঠিক যে 'রাজস্থান'-এ এই আকবরের ইন্দ্রিয়-লালসার কাহিনী আছে এবং দ্বিজেন্দ্রলাল তার দ্বারাই প্রভাবিত হন।

'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটক রোমান্টিকতা মুক্ত নয়। ঘটনা সৃষ্টি করতে গিয়ে নাট্যকার সংগতি-অসংগতির বিচার করেননি। তাই দেখতে পাওয়া যায় হলদিঘাটের যুদ্ধে যখন সঙ্কটময় মুহূর্ত সমাগত তখন শক্তসিংহের শিবিরে প্রবেশ করে অবিবাহিতা মোগল দুহিতা অনায়াসে শক্তসিংহের সংগে প্রেম চর্চা করেছে। এটাও যেমন অবাস্তব, তেমনি অবাস্তব শেষ রাত্রে কারাগার থেকে শক্তসিংহকে মেহেরউন্নিসার মুক্তিদানের ঘটনা। এই হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে সন্ন্যাসিনী বেশে ইরার শক্ত-শিবিরে প্রবেশ; উদিপুর কাননস্থ পর্বতগুহায় রাণা প্রতাপের কাছে বালকবেশী মেহের উন্নিসার আগমন সবই চমকপ্রদ ও নাটকীয় হলেও অবাস্তব। শুধু তাই নয়, কি মেহের কি ইরা পিতার সংগে কথা বলার সময় কাউকেই পুত্রী ব'লে মনে হয় না—তারা যেন বিশেষ বিশেষ আদর্শ প্রচার করতে দাঁড়িয়েছে। ইরা, দৌলতউন্নিসা, মেহের উন্নিসা এই সব চরিত্র ইতিহাসের গতিপথে আসেনি—তাই তাদের ঘটনা দর্শকদের উপভোগ্য হলেও কাহিনীর সংগে সংগতিহীন।

নাম ভূমিকায় রয়েছেন যে প্রতাপসিংহ তাঁকে প্রকৃত নায়কের মর্যাদা দিয়ে নাট্যকার প্রকৃত ট্র্যাজেডী রচনা করতে পারেননি। এতে রয়েছে তাঁর দেশাত্ম-বোধের বিবরণ এবং সেই সংগে আবার ধর্ম, সামাজিক সমস্যা, নিষ্কাম প্রেমের

আদর্শ প্রভৃতি একসঙ্গে উপস্থাপিত করায় নাটক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। নাটকের মধ্যে দীর্ঘ সংলাপ নাটকের গতিকে শ্লথ ক'রে দিয়েছে।

এই নাটকে নাট্যকার ছন্দোবদ্ধ সংলাপ পরিহার করেছেন। 'তারাবাই'-প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেনের উপদেশ তিনি মনে রেখেছেন। তা ছাড়া তিনি নিজেও নাটকীয় সংলাপ সম্পর্কে চিন্তা ক'রে একটি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য: "অভিনয়ে ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেইজন্ত উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় [ভাষার মর্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য] ততই শ্রেয়ঃ। লোকে কথাবার্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই। সেইজন্ত আমি আমার 'তারাবাই'-এর পরবর্তী নাটকগুলিকে যথাক্রমে গদ্যেই রচনা করি।"[৪১] অবশ্য সংলাপ গদ্যে রচিত হ'লেও তার কাব্যগুণ অস্বীকার করার উপায় নেই।

॥ দুর্গাদাস ॥ 'রাণা প্রতাপসিংহ'-এর মত 'দুর্গাদাস' [১৯০৬] নাটকেও উপজীব্য রাজপুতদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। তবে প্রথমোক্ত নাটকে রাজপুতদের অসীম বীরত্ব প্রদর্শিত হ'লেও তাদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়নি; অবশ্য জয়যুক্ত করালে তা ইতিহাসের অপলাপ হতো। 'দুর্গাদাস'-এ ইতিহাসের সংগে খানিকটা সংগতি রেখেই বিজয়ী রাজপুতদের কাহিনী প্রদর্শিত হয়েছে। তবে এই সংগে এটাও মনে রাখতে হবে যে, 'রাণা প্রতাপসিংহ'-এর মত এই নাটকের মর্যাদা নেই, কারণ এতে রোমান্টিকতার প্রাবল্য।

নাটকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন: "আজ পর্যন্ত হিন্দু পাঠক নাটক নভেলে কেবল বিজাতীয়ের কাছে স্বজাতীয়ের পরাজয়-বার্তাই পড়িয়া আসিতেছেন। এতদিন এই একঘেয়ে পরাজয়ের পর দুর্গাদাসের বিজয় দুন্দুভি তাঁহাদের কর্ণে সংগীত বর্ষণ করিবে না কি?"

এই উক্তি স্বভাবতই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৮৮২-এ বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' রচনা করেন। তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতি সংস্করণের পরে ১৮৯৩-এ "পুনঃপ্রণীত" চতুর্থ সংস্করণে এই গ্রন্থের আকার ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। এই সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লেখেন: "ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ-স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল 'রাজস্থান' থেকেই তাঁর 'দুর্গাদাস' নাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছেন।[৪২] তবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' তাঁর সম্মুখেই ছিল। তাই এর প্রভাব 'দুর্গাদাস'-এর ওপরে পড়াই স্বাভাবিক। নাট্যকার নিজেও নাটকের ভূমিকায় হিন্দুদের বিজয়-বৈজয়ন্তীর পূর্ববর্তী গ্রন্থ হিসেবে 'রাজসিংহ'-এর নাম উল্লেখ করেছেন। 'রাজসিংহ'-এর সংগে 'দুর্গাদাস'-এর উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রথমোক্ত গ্রন্থে দুর্গাদাস সম্পর্কে মাত্র একবার উল্লেখ আছে[৪৩] আর শেষোক্ত গ্রন্থে দুর্গাদাসই মুখ্য চরিত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের আগাগোড়াই দুর্গাদাস। ঔরংজীবের চক্রান্তে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু ঘটে। এর পরে তিনি যশোবন্তের বিধবা পত্নী মহামায়া এবং শিশুপুত্র অজিত সিংহকে বন্দী করার ফিকির খোঁজেন। মাড়বার সেনাপতি দুর্গাদাস সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তাঁর অসীম সাহসিকতায় মহামায়া ও অজিত মুক্ত হন। তাঁরা মেবারের রাণা জয়সিংহের আশ্রয় লাভ করেন। ফলে ঔরঙ্গজীব মেবার আক্রমণ করেন। দুর্গাদাসের অধিনায়কত্বে রাজপুত সৈন্য মোগল সৈন্যকে পরাজিত করে। পরাজিত মোগলেরা আরও সৈন্য সংগ্রহ করে মাড়বার আক্রমণ করে। এবারেও তারা পরাজিত হয়; ঔরংজীবের পুত্র আকবর সপরিবারে বন্দী হন। এবারে ঔরংজীব রাজপুতদের সংগে সন্ধি ক'রে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে দমনের জন্য অভিযান করেন। মাড়বার রাজ্য নিষ্কণ্টক করে মহামায়া পুত্র অজিত সিংহকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে পতির উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেন। এদিকে সম্রাটপুত্র আকবরকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে রাজপুত নেতৃবৃন্দ দুর্গাদাসকে পরিত্যাগ করেন। তখন দুর্গাদাস আকবরকে নিয়ে শম্ভুজীর আশ্রয়ে যান। শম্ভুজীর মুসলমান অনুচর কাবলেস খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দুর্গাদাস ঔরংজীবের হাতে বন্দী হন। এই বন্দী অবস্থায় থাকাকালে সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে প্রেম নিবেদন করেন। কিন্তু দুর্গাদাস তা প্রত্যাখ্যান করেন। ঔরংজীবের সেনাপতি দিলীর খাঁ দুর্গাদাসের চরিত্রবলে মুগ্ধ হয়ে তাকে মুক্তি দান করেন। দুর্গাদাস রাজপুত নেতৃবৃন্দের আহ্বানে রাজপুতনায় ফিরে আসেন। আকবর বৈরাগ্য অবলম্বন ক'রে মক্কায় চলে যান। আকবরের কন্যা রাজিয়াকে দুর্গাদাস ঔরঙ্গজীবের হস্তে অর্পণ করেন। এই অপরাধে অজিত সিংহ দুর্গাদাসকে নির্বাসিত করেন। দুর্গাদাস শেষ পর্যন্ত

বৈরাগ্য অবলম্বন করলেন ; শম্ভুজী ঔরঙ্গজীবের হাতে বন্দী হয়ে নিহত হলেন ; ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু ঘটলো।

'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে কেন্দ্রগত ঐক্য যতটুকু ছিল, 'দুর্গাদাস' নাটকে তাও নেই। মাড়বারের রাজা জয়সিংহের পুত্র অজিত সিংহের জন্মকাল [১৭৬৯] থেকে ঔরংজীবের মৃত্যু [১৭০৭] প্রায় ত্রিশ বৎসরের ঘটনাবলী এই নাটকের কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। 'রাণা প্রতাপসিংহ'-এ মোগল ও মেবারের মধ্যে সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু 'দুর্গাদাস'-এ মোগল, মেবার, মারাঠা মারবাড়—এই চারিটি কেন্দ্রে কাহিনী বিক্ষিপ্ত। এর ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসের একটি উদ্বেলিত রাজনৈতিক চিত্র ফুটে উঠেছে সত্যি, কিন্তু সংহত নাটকীয় কাহিনী গড়ে উঠতে পারেনি। এই নাটকে স্থান বা কালের ঐক্য মোটেই রক্ষিত হয়নি। ঔরংজীবের পুত্র আকবরকে অবলম্বন ক'রে নাটকের ঘটনা-ভূমি রাজপুতনা থেকে দাক্ষিণাত্যে প্রসারিত করার সুযোগ ঘটেছে। এই সুযোগে রাজপুত ও মারাঠা জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের পারস্পরিক তুলনা করারও প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকার। [৪.৬]। কিন্তু ঘটনাস্থল প্রসারিত না ক'রেও এটা করা যেতো। এমনিতেই নাটকের কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনায় ভারাক্রান্ত। তার ওপরে জয়সিংহ-কমলা-সরস্বতীর আখ্যান। ইতিহাসের সংগে সম্পৃক্ত হলেও নাটকের পক্ষে এটার কোনও প্রয়োজন ছিল না। 'সুরা, নারী আর গান' কিছুতেই ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন—এমন শাহাজাদা আকবরকে অবলম্বন ক'রে কয়েকটি প্রমোদ দৃশ্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে ; আর আকবরের কাহিনী থেকেই প্রসারিত হয়েছে রাজিয়ার কাহিনী, আকবরের ভূমিকার সঙ্গে ইতিহাসের মিল আছে ; এমন কি ঔরঙ্গজীব যে কূটনৈতিক পত্র পাঠিয়ে আকবরের সংগে রাজপুতদের বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন সেটিও ইতিহাস সম্মত। এই আকবর প্রসংগ সংক্ষিপ্ত করা যেতো। কিন্তু নাট্যকার ইতিহাসের কোনও ঘটনাকেই যেন বাদ দিতে রাজী নন।

নাট্যকারের সর্বদা লক্ষ্য ছিল রাজপুত বীরত্বের আদর্শকে জয়যুক্ত করা, তাদের মহত্বকে তুলে ধরা। প্রায় অন্ধভাবে এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবতা পর্যন্ত উপেক্ষিত হয়েছে।

এই নাটকের নায়ক এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে যাকে রাখা হয়েছে, সেই

দুর্গাদাস ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্র। তিনি ছিলেন যশোবন্ত সিংহের মন্ত্রী অস্করণ-এর পুত্র। ভয়াবহ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দেশের জন্য নিস্বার্থভাবে সংগ্রাম ক'রে তিনি রাজপুত ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ইতিহাস বলে: "Mughul gold could not seduce, Mugul arms could not daunt that constant heart. Almost alone among the Rathors he displayed the rare combination of the dash and reckless valour of a Rajput soldier with tact and diplomacy and organising power of a Mughul minister of state."[৪৪] টড তাঁর 'রাজস্থান'-এ দুর্গাদাসের যে পরিচয় দিয়েছেন তা হচ্ছে এই: "As a skilful general and gallant soldier, in the defence of his country, he is above all praise. As a chivalrous Rajpoot, his braving all consequences when called upon to save the honour of a noble female of his race, he is without parallel. As an accomplised prince and benevolent man, his dignified letter of remonstrance to Arungzab on the promulgation of the capitation edict, places him high in the scale of moral as well as intellectual excellence."[৪৫]

দ্বিজেন্দ্রলাল সে যুগের দেশাত্মবোধের আদর্শকে এই দুর্গাদাসের দেশপ্রেম, বীরত্ব, ত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে রূপদানের চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, আভিজাত্যবোধ, প্রভুভক্তি, আশ্রিত বাৎসল্য—দুর্গাদাসের মধ্যে এ সব গুণেরই সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। ফলে দুর্গাদাস এমন এক সর্বগুণান্বিত মহামানবে পরিণত হয়েছেন যাঁর মত মানুষ মর্ত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। "দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস' নাটক পাঠ করিয়া তাঁহার বন্ধু মনীষী লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই-সি-এস মহাশয় বলেন যে, দুর্গাদাস চরিত্র 'Bundle of qualities' হইয়াছে, যদি গুণের সংগে weakness-এর উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে চরিত্র আরও ফুটিত।"[৪৬] নাটকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল এটিকে ট্র্যাজেডি বলেছেন—"ইহার 'ট্র্যাজেডিত্ব' চিরজীবনের উপাসনার নিষ্ফলতায়, আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টার পরাজয়ে। ইহার 'ট্র্যাজেডি'ত্ব ঐ এক কথায়: 'ব্যর্থ হয়েছে—পার্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে'।'

দুর্গাদাসের মত সর্ব গুণান্বিত চরিত্র ট্র্যাজেডীর নায়ক হবার যোগ্য নয়। Aristotle তাঁর 'Poetics'-এ বলেছেন যে, যাঁর সবটাই গুণ, সামান্যতম ত্রুটিও নেই তিনি যেমন ট্র্যাজেডীর নায়ক হতে পারেন না, তেমনি যার কোন গুণ নেই তিনিও ট্র্যাজেডীর নায়ক হতে পারেন না। এই দুই অতিকোটিকের মাঝখানে এমন ব্যক্তির চরিত্র যিনি অতি সৎস্বভাব এবং ন্যায়নিষ্ঠ নন. তথাপি তাঁর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে—পাপের বা নীচতার জন্যে নয়, ভ্রান্তি বা দুর্বলতার জন্যে। প্রথম শ্রেণীর অতি সৎ স্বভাবের লোক ট্র্যাজেডীর নায়ক হতে পারবেন না। কারণ, এই শ্রেণীর লোকের পতন না জাগায় করুণা, না জাগায় ভয়, শুধু আঘাতই দেয়।[৪৭] Aristotle-এর মত অনুসারে ট্র্যাজেডীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: "It should ···imitate actions which excite pity and fear, this being the distinctive mark of tragic imitation."[৪৮] ট্র্যাজেডীতে যেমন বহির্দ্বন্দ্ব থাকবে তেমনি থাকবে চরিত্রে, বিশেষভাবে নায়ক চরিত্রে—তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু দুর্গাদাস চরিত্রের পরিণতিতে তেমন কোনও অন্তর্দ্বন্দ্বের-ভূমিকা নেই। তা ছাড়া "চিরজীবনের উপাসনার নিষ্ফলতা", "আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতা" অথবা "প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরাজয়"—এসব বিষয় নাট্যকারের মনে থাকলেও নায়ক চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা বিকশিত হয়ে ওঠেনি। সর্বোপরি শেষ দৃশ্যে দুর্গাদাস ও দিলীর খাঁর আলিঙ্গনের সংগে যে সংলাপ ধ্বনিত হয়েছে তার আবেদন মোটেই ট্র্যাজেডীর রস সৃষ্টির সহায়ক নয়।

দুর্গাদাস চরিত্রের যে বিন্যাস নাট্যকার করেছেন তা যে ঐতিহাসিক জগতের সীমা পেরিয়ে পুরাণের জগতে চলে যাচ্ছে তা তিনি সম্ভবত নিজেই বুঝতে পারছিলেন। তাই দেখি দিলীর খাঁর উক্তিতে: "যে প্রভুর জন্য প্রাণপণ ক'রে, দেশের পায়ে সর্বস্ব অর্পণ করে, আশ্রিতকে রক্ষা করে, প্রপীড়িত অবলার প্রাণরক্ষার্থে নিজের বুক আগিয়ে দেয়, শেষে আশ্রিতা কুমারীর ধর্ম রক্ষার জন্য নির্বাসিত হয়, সেরূপ চরিত্র তোমাদের পুরাণেই কয়টি আছে।" [৫।৮]

এই নাটকের অন্যতম কুশীলব ঔরংজীব, তাঁর চরিত্রের বিন্যাসও নাট্যকারের নিজস্ব। ইতিহাসে ঔরংজীব বহু বিতর্কিত চরিত্র। যে টড-এর রাজস্থান অবলম্বনে 'দুর্গাদাস' নাটক রচিত, সেই টড ঔরংজীব সম্পর্কে বলেছেন:

"In subtley and the most specious hypocrisy, in that concentration of resolve which confides its deep purpose to none...... Aurangzebe had no superior amongst the many distinguished of his race ; but that sin by which 'angels fell' had steeped him in an ocean of guilt, and not only neutralized his natural capacities, but converted the means for unlimited power into an engine of self-destruction."[৪৯]

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন : "ঔরংজীবকে আমি পিশাচরূপে কল্পনা করি নাই—যেরূপ টড ও অর্ম করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সরল ধার্মিক মুসলমানরূপে কল্পনা করিয়াছি। তাঁহার অত্যাচার অত্যধিক গোঁড়ামির ফল। ইসলাম ধর্ম প্রচারের দৃঢ়-সঙ্কল্প প্রসূত।"

ঔরংজীব চরিত্রের এই মূল্যায়ণ দুর্গাদাস নাটকে বার বার প্রতিফলিত হয়েছে। সমর দাস ঔরংজীবকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : "মহাশয়ের পূর্বপুরুষ আকবরের চেয়ে মহাশয়কে এক বিষয়ে অধিক শ্রদ্ধা করি। কারণ, মহাশয় আকবরের মত ভণ্ড নহেন। মহাশয় খাঁটি মুসলমান, সরল গোঁয়ার ধার্মিক মুসলমান।" [১।১]। ঔরংজীব নিজেও বলেছেন : "এই ইস্লাম ধর্ম প্রচারের জন্যই এই রাজ্যভার নিইছি। এইজন্য পিতাকে কারাগারে রুদ্ধ করেছি, ভ্রাতাকে হত্যা করেছি।—খোদা জানেন।" [৫।৪]

আজ পর্যন্ত যে সব ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা অনুসরণ করলে কিন্তু ঔরংজীব সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের মূল্যায়ণ সম্পর্কে একমত হওয়া যায় না। ঔরংজীব যতটা খাঁটি মুসলমান ছিলেন তার চেয়েও তিনি ছিলেন অনেক বেশী খাঁটি রাজনীতিক। তাঁর রাজনৈতিক চালে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মীয় শ্লোগানকে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করেছেন। আজকের দিনেও এই ধরণের রাজনীতিকের অভাব ঘটেনি। ভাইদের হত্যা করে পিতাকে বন্দী করে রাজ্যলাভ করা ইসলাম সম্মত কাজ নয়। তাছাড়া ঔরংজীবের প্রধান মন্ত্রী আশাদ খাঁ ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁর প্রায় সমগ্র সেক্রেটারীয়েট হিন্দুদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। হিন্দুরাজপুতদের মধ্যে অনেকে তাঁর বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন। যে কাহিনী নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটক আরম্ভ করেছেন সেই যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহ সম্পর্কে তাঁর নীতিও

রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়। মোগল সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল গুজরাট। এই গুজরাটের পথে যোধপুর। সুতরাং সেই যোধপুরের সিংহাসনে একটি শিশু রাজা হয়ে বসুক, এটা ঔরংজীব চাননি, কারণ সে ক্ষেত্রে সরকার পরিচালনার ভার অপ্রার্থিত ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়তে পারে—এই আশঙ্কা তাঁর মনে ছিল। ঔরংজীব তাঁর কাজ ও কুকাজের সমর্থনে যদি ধর্মীয় জিগীর তুলে থাকেন, 'আমি ইসলাম ধর্মের ফকিরী কচ্ছি' এইরূপ মন্তব্য ক'রে থাকেন তবে সেটা সম্পূর্ণ কপটতা। এই জন্যেই আমার মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রাজসিংহ' গ্রন্থে ঔরংজীব সম্পর্কে যে "ধূর্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক" প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন সেইগুলিই যথার্থ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রদত্ত 'খাঁটি মুসলমান' বিশেষণ ঠিক নয়।

নাট্যকার সম্রাজ্ঞী গুল্‌নেয়ারের চরিত্র আঁকতে গিয়েও কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন। গুল্‌নেয়ারের নামই ইতিহাসে অনুপস্থিত। সম্ভবত কামবক্সের মাতা উদিপুরী-মহল এর তিনি নতুন নামকরণ করেছেন গুলনেয়ার। এই উদিপুরী মহল-এর চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যদুনাথ সরকার। তিনি তাঁকে ব'লেছেন : "A low animal type of partner'. যদুনাথের মন্তব্য থেকেই জানা যায় : "She retained her charms and influence over the Emperor till his death, and the darling of his old age.".[৫১]

গুলনেয়ারের সম্রাটের ওপর অসীম প্রভাব। আলোচ্য নাটকে যশোবন্ত সিংহের পত্নীর অবরোধ থেকে আরম্ভ করে রাজপুতদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলেছে সবই গুলনেয়ারের আজ্ঞায়। এই প্রতিহিংসা পরায়ণা নারী প্রতিশোধ গ্রহণে অসমর্থা হলেন, অপমানিতা হলেন এবং এই অবস্থাতেও রাজপুত শিবিরে দুর্গাদাসকে দেখা মাত্রই তাঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হ'য়ে পড়লেন। ঘটনাটি অনৈতিহাসিক তো বটেই, মনোবিজ্ঞান সম্মতও নয়। উপরন্তু এই প্রেম নিবেদনে যতই সাহস থাক, গুলনেয়ারের আচরণ রীতিমত বিসদৃশ। মোগলের শিবির কারাগারে দুর্গাদাস বন্দী। গভীর রাত্রিতে গুলনেয়ার সেখানে এসেছেন প্রেম নিবেদন করতে, সংগে নিজপুত্র কামবক্স; আবার পৌত্রী রাজিয়ার সংগে পরস্পরের প্রেমের প্রসংগ নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। এ সব ব্যাপারই রীতিমত বিসদৃশ। এই রাজিয়া চরিত্রটির নাটকে কোনও প্রয়োজনই ছিল না; কিন্তু নাট্যকার একটি কাহিনীকে নিজ কল্পনায় পল্লবিত করতে গিয়ে অপর

অবান্তর বিষয় আমদানী করেছেন। এর ফলে নাটকীয় পরিবেশের যে গুরুত্ব তা নষ্ট হয়ে গেছে এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাট্যকারের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়েছেন। অন্যদিকে ঔরংজীবের মৃত্যু, শম্ভুজীর হত্যা, গুলনেয়ারের আত্ম-হত্যা, দুর্গাদাসের বৈরাগ্য, রিজিয়ার উন্মাদ অবস্থা, অজিত সিংহের নৈরাশ্য—এক সংগে নাটকের পরিণতিতে জড় করার ফলে নাটকের একটা স্থির লক্ষ্যও নির্ণীত হয়নি।

এই নাটক সমসাময়িক জাতীয়তাবোধের দ্বারা রীতিমত প্রভাবিত। দুর্গাদাসকে তো এক আদর্শ দেশপ্রেমিকরূপে চিত্রিত করা হয়েছেই, আরও একাধিক চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে দেশাত্মবোধের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। ইতিহাসের সম্পূর্ণ অনুসারী রাজসিংহ চরিত্রে দেশাত্মবোধের স্ফুরণ স্বাভাবিক। কিন্তু তা সংযত ও সুন্দর। যশোবন্ত সিংহের পত্নীকে দিয়ে দেশাত্মবোধের বক্তৃতা করানো হয়েছে। তিনি রাজনৈতিক নেতার মত মাড়বারের গ্রামে ঘুরে গ্রামবাসীদের স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেই বক্তৃতার ভাষা একেবারে উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদীদের ভাষা: "যদি কারও মাতৃভূমির প্রতি টান থাকে, যদি কারো স্বধর্মের প্রতি সম্মানের জ্ঞান থাকে, যদি কেউ স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকো—সে এসো।..." [৩৩]।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের আবহাওয়ায় লিখিত এই নাটকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের প্রেরণাও সঞ্চারিত হয়েছে। মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁর সংলাপে হিন্দু-মুসলমান মিলনের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। তিনি ঔরঙ্গজীবকে হিন্দু বিদ্বেষ পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করে বলেছেন: "হিন্দু-মুসলমান এক হোক, মন্দিরে মসজিদে স্বাধীনভাবে আল্লার ও ব্রহ্মের নাম নিনাদিত হোক; এক সংগে দামামা শঙ্খধ্বনি উঠুক। হিন্দু-মুসলমান একবার জাতিদ্বেষ ভুলে পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক দেখি সম্রাট।" 'জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে হিন্দু-মুসলমান নতজানু হ'য়ে করজোড়ে ভক্তি-বাষ্প গদ্‌গদ স্বরে ভারতভূমিকে মা বলে ডাকবার' যে আহ্বানধ্বনি দিলীর খাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে তা বিশেষ ভাবে বঙ্গ-ভঙ্গ যুগেরই কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপসংহারে লিখেছেন: "হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যেই তুল্যরূপেই

আছে। ...... অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে·· হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্কিমচন্দ্রের এই নীতিই অনুসরণ করেছেন। এর জন্যে তিনি ইতিহাসের সীমাকে মাঝে মাঝে লঙ্ঘন করেছেন। তিনি ঔরঙ্গজীব চরিত্র এঁকেছেন, তেমনি মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁ এবং প্রভুভক্ত কাশিমের চরিত্রও এঁকেছেন। দুর্গাদাস কাশিমের সাহায্যেই শিশু অজিত সিংহের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এই কাশিম কোনও সময়েই মোগল পক্ষে যায় নি ; এমন কি শেষ পর্যন্ত কাশিম দুর্গাদাসের অন্ন সংস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছে। রাজসিংহ তার সম্পর্কে বলেছেন—"মুসলমান জাতের মধ্যে কাশিমও ত জন্মায়।" [১।৮]। পঞ্চম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যটাই রচিত হয়েছে এই প্রতিপাদ্য বিষয় উত্থাপনের জন্যে : 'হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না·········।"

দুর্গাদাস নাটক শেষ হয়েছে দুর্গাদাস ও কাশিমের আলিঙ্গনের মধ্যে এবং মোগল সেনাপতি দিলীর খাঁ স্বয়ং এই আলিঙ্গন দৃশ্য দেখে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলেছেন—"দাঁড়াও তোমরা দুজনেই আজ আমার সম্মুখে দাঁড়াও ; একবার নয়ন ভরে দেখি—ঈশ্বর! তোমার স্বর্গে যাঁরা দেবতা আছেন শুনি, তাঁরা কি এঁদের চেয়েও বড় ?" রংগমঞ্চে হিন্দু-মুসলমানের মিলন দৃশ্য সে যুগের দর্শকদের কাছে ঐক্যের আবেদন সৃষ্টি করার দিক থেকে সার্থকভাবে পরিকল্পিত।

॥ মেবার পতন ॥ 'রাণা প্রতাপসিংহ' 'দুর্গাদাস' এবং 'মেবার পতন' [১৯০৮] এই তিনটি নাটকে নাট্যকারের অবলম্বন রাজপুত জাতির গৌরবোজ্জল ইতিহাস। এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশ প্রেম, সমাজনীতি এবং বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ তুলে ধরেছেন। নাটক তিনটিই রোমান্টিক ধর্মী।

কাহিনীর দিক থেকে দেখলে 'মেবার পতনকে' 'রাণা প্রতাপসিংহে'র পরিশিষ্ট বলা যেতে পারে। প্রতাপসিংহ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে মেবারের যে অংশ মোগলের কবল থেকে উদ্ধার ক'রেছিলেন, তাঁর পুত্র অমর সিংহের সময় কিরূপে তা আবার মোগলের হাতে চলে গেল তাই নিয়ে 'মেবার পতন' রচিত। অমর সিংহের রাজত্বকালে মেবারের রাজধানী ছিল উদয়পুর, চিতোর মোগলের দখলে। হেদায়েৎ আলি খাঁর অধিনায়কত্বে মোগল সৈন্য মেবার

আক্রমণ করে, কিন্তু যুদ্ধে মোগল সৈন্যকে পরাজয় বরণ করতে হয়। পরে শাহ্‌জাদা পরভেজের অধিনায়কত্বে নতুন ক'রে আক্রমণ হয়। এবারে রাণা প্রতাপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহবৎ খাঁর পিতা মোগলের আশ্রিত সগর সিংহ মোগলের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু এবারেও রাজপুত সৈন্যই জয়লাভ করে। কিন্তু মেবার শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারলো না। মহাবৎ খাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী মেবার আক্রমণ করলো। মেবার সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলো না—মেবারের পতন ঘটলো, উদয়পুর মোগলের পদানত হ'লো। এই 'মেবার পতন'-এর কাহিনীও দ্বিজেন্দ্রলাল টডের 'রাজস্থান' [৫২] থেকেই গ্রহণ করেছেন।

এই নাটকে ইতিহাসের কাঠামোটাকে যথাযথ রাখা হয়েছে। রাণা প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ ১৫৯৭-এ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে মোগলেরা চার বার মেবার আক্রমণ করে। আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫-এ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন জাহাঙ্গীর। ঐ আক্রমণ তাঁর নির্দেশেই পরিচালিত হয়। ১৬০৮-এ মেবার রণক্ষেত্রের যুদ্ধে মোগল পক্ষে সেনাপতি ছিলেন মহাবৎ খাঁ; ১৬০৯-এ রণপুর গিরিপথের যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন আবদুল্লা খাঁ। তারপর ১৬১১-এ ক্ষেমনর গিরিপথের যুদ্ধে মোগলবাহিনীর অধিনায়ক হয়ে আসেন শাহ্‌জাদা পারভেজ। এই তিনটি যুদ্ধেই রাজপুতেরা জয়লাভ করেন। কিন্তু ১৬১৩-এ মোগল বাহিনী যে অভিযান করে, সে অভিযান জয়যুক্ত হয়। এই অভিযানে মোগল বাহিনীকে পরিচালনা করছিলেন শাহজাদা খুরম [পরে সম্রাট সাজাহান]। তাঁর সহকারী ছিলেন মহাবৎ খাঁ। এই অভিযানে উদয়পুর ও চিতোর দুর্গের পতন ঘটে। এ সবই ঐতিহাসিক ঘটনা। তা ছাড়া নাটকে সন্নিবেশিত আরো কিছু তথ্যও ইতিহাস সম্মত। যেমন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সামন্ত সর্দারদের স্বদেশপ্রীতি এবং আত্মত্যাগ রাণা অমরসিংহকে যুদ্ধে বাধ্য করেছিল; মোগলেরা রাজপুত জাতির ঐক্যে ফাটল ধরাতে পেরেছিলেন। মাড়বার অধিপতি গজসিংহ, সগরসিংহ এবং তার পুত্র মহীপৎসিংহ, ওরফে মহাবৎ খাঁ মোগল পক্ষে ছিলেন; সগরসিংহকে মোগলেরা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেও রাজপুতরা তাঁকে রাণা হিসেবে মেনে নেয়নি এবং সগর সিংহকে আত্মহত্যা করতে হয়; স্বাধীনতা রক্ষার শেষ যুদ্ধে আবালবৃদ্ধবনিতা রাজপুত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

ইতিহাসের মূল কাঠামো এবং কিছু ইতিহাস সম্মত উপকরণ ব্যবহার করলেও দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের সর্বত্র ইতিহাসকে অনুসরণ করেন নি। প্রথমত মোগলপক্ষে সৈন্যপত্যের ভার গ্রহণ করে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তাদের তালিকার সঙ্গে উল্লিখিত তালিকার কিছু পার্থক্য আছে। নাটকের হেদায়েৎ ইতিহাসে নেই। আবার আরও দু'একজন সেনাপতি যাদের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়, নাটকে তাঁরা আসেন নি। টডের অনুকরণে মহাবৎ খাঁকে সগর সিংহের পুত্র এবং সেই সঙ্গে গোবিন্দ সিংহের ধর্মত্যাগী জামাতা করা হয়েছে। এই গোবিন্দসিংহ মেবারের পতনের পূর্ব মুহূর্তে মোগল শিবিরে গিয়ে ধর্মত্যাগী মহাবৎ খাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং রাজপুত কুলাঙ্গার গজসিংহের গুলিতে নিহত হন। অমর সিংহ-মহাবৎ খাঁর সাক্ষাতের সময় অমর সিংহের আক্ষেপোক্তি ও মহাবৎ খাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বানের সমর্থন ইতিহাসে নেই।

উদ্দেশ্যমূলক নাটক লিখতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল পাত্রানৌচিত্য এবং কালানৌচিত্য দোষে নাটকটিকে দুষ্ট করেছেন। এই নাটকে তিন সিংহের তিন কন্যা কল্যাণী, মানসী আর সত্যবতী নাট্যকারের নিজের মানস কন্যা। এরা নাট্যকারের মুখপাত্র। এদের ভাবাবেগ প্রবণতা, আবেগ, উচ্ছ্বাসের বন্যায় নাটকের ঐতিহাসিকতা ভেসে গেছে। এই তিনজন তিনটি নীতির প্রতীক: সত্যবতী দেশাত্মবোধের বা দেশপ্রেমের বাণীবাহিকা; কল্যাণী দাম্পত্যপ্রেমের প্রতীক, আর মানসী বিশ্বপ্রেম প্রচারিণী। দাম্পত্যপ্রেম, দেশ প্রেম সবই শেষ পর্যন্ত বিশ্বপ্রেমে এসে মিশেছে। আর এই দেশপ্রেম প্রচারে স্থান কাল পাত্র বিচার করা হয়নি। নাটকের শেষ অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে যে ঘটনা ঘটেছে তা ইতিহাসবিরোধী তো বটেই, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব। দৃশ্যটি আরম্ভ হয়েছে চারণীদের গান দিয়ে:

> "ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার
> এ মহাশ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কি গান,গাহিব আর ?
> মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায়।
> ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ, হাসিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।
> মেবার পাহাড় শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর।
> এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার।........

নাটকের বিষাদময় পরিণতিকে মর্মস্পর্শী করে তুলবার দিক থেকে গানটি

প্রয়োজনীয়তা হয়তো আছে। ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই বালক অরুণের সঙ্গে মোগল সৈন্য ও হেদায়েৎ আলীর যুদ্ধ, মহাবৎ খাঁর হস্তক্ষেপ সবই নাটকীয়। কিন্তু তার পরেই মহাবৎ খাঁর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষণ: "একবার এক মুহূর্তের জন্ত ভুলে যাও; যে তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, তুমি প্রপীড়িত আমি অত্যাচারী। শুদ্ধ মনে কর, তুমি মানুষ আমি মানুষ, তুমি ভগ্নী—আমি ভাই।"

স্বভাবতই মহাবৎ খাঁর মুখ দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আবেদন জানানই ছিল নাট্যকারের লক্ষ্য। কিন্তু নাট্যকার এখানেই থামেন নি, তিনি সাজাহানকে[৫৩] দিয়ে চারণীদের 'মেবার পাহাড় ·····" গানের তারিফ করাই শুধু নয় নিজেও সে গানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন এবং হেদায়েৎ ও সৈনিক-গণকেও সেই গান গাইতে নির্দেশ দিয়েছেন: "আমিও সে গানে যোগ দিব। গাও হেদায়েৎ আলি। গাও সৈনিকগণ! গাও সৈনিকগণ!" [৫।৬]।

নাট্যকার এখানে নাটককে রোমান্টিকতার দিক থেকে একোরে চরমে নিয়ে গেছেন। এ ব্যাপার ঘটেছে নাটকটিকে প্রচারধর্মী করার চেষ্টা থেকে। 'মেবার পতন' নাটকের ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে সাফল্যের পথে অন্যতম বাধা হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট জীবন-দর্শন সঞ্জাত এই প্রচারধর্মী অভিব্যক্তি। নাট্যকার নিজেই নাটকের ভূমিকায় স্পষ্টভাবে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন: "মদ্রচিত অন্যান্য নাটক হইতে এই নাটকের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমার অন্যান্য নাটকে চরিত্রাঙ্কন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।···কিন্তু এই নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া বসিয়াছি; সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরিয়সী। আমি হইতে যতদূর প্রেমকে ব্যক্ত করা যায় ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ঐশ প্রেম এখানে দেখানো হয় নাই—নাটকান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। অতএব এই আমার প্রথম উদ্দেশ্যমূলক নাটক।"

দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্যমূলক নাটক রচনার প্রচেষ্টা অবশ্য এই প্রথম নয়। 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটক থেকেই এই প্রচেষ্টার সুরু। সমসাময়িক দেশ প্রেমের উচ্ছ্বাস, সমাজধর্ম এবং প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,—এ সব তো আছেই। উপরন্তু রাণা প্রতাপসিংহ নাটকে সমাজ—ধর্ম—প্রেম—মনুষ্যত্ব

এবং বিশ্বমৈত্রী সম্পর্কিত জীবন ভাবনাও স্থান লাভ করেছে। কিন্তু ঐ নাটকে 'মেবার পতনের' মত প্রচারধর্মিতা তত উগ্র নয়—'রাণা প্রতাপসিংহ'-এ আদর্শবাদ নাট্য-শিল্পের সংগে অনেকখানি মিশে গেছে। কিন্তু 'মেবার পতনে' তা ঘটেনি। তার ফলে কি ঐতিহাসিক নাটক, কি ট্র্যাজেডী কোনও দিক থেকেই 'মেবার পতন' সার্থকতা লাভ করতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ঐতিহাসিক রস'—তা এই নাটকে অনুপস্থিত অর্থাৎ ইতিহাসের সংশ্রবে নাটকে যে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে তা এখানে সৃষ্টি হয়নি; যদিও নাটকে ইতিহাসের ঘটনাও আছে। কিন্তু সে যুগের ঐতিহাসিক যুগ-জীবনের ছবি এখানে স্পষ্ট ফুটে ওঠেনি। আসলে এই নাটকের মাধ্যমে ইতিহাসের ঘটনার পটভূমিকায় [মোগল-রাজপুত সংঘর্ষ] নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন যে জাতীয় ঐক্যের ওপরই রাষ্ট্রীয় ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। মেবারের পতনের মূলে তাই মুখ্য বিষয় করা হয়েছে মহাবৎ খাঁর স্বজাতি বিদ্বেষকে। রাজপুত জাতির ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা যে তাদের পতনের আর একটি কারণ সে দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ রয়েছে। যে কথা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'একঘরে' ও 'প্রায়শ্চিত্তের' মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছেন এবং প্রতাপসিংহ নাটকেও বলেছেন 'মেবার পতন' নাটকেও তা-ই বিস্তৃতভাবে বলেছেন। তবে এক্ষেত্রে বিদ্রূপের সাহায্যে নয় সোজাসুজি প্রত্যয়সিদ্ধ শ্লোগানের মাধ্যমেই বলেছেন—"আবার তোরা মানুষ হ।"

এই নাটকটিতে ঐতিহাসিক রস পরিবেশনের সুযোগ যথেষ্ট ছিল। নাটকটি সার্থক ট্র্যাজেডী হিসেবেও গড়ে উঠতে পারতো। নাট্যকার যদি নাটককে বিশ্বমৈত্রী প্রচারের বাহন করে তুলতে না চাইতেন তবে অনায়াসে এটি অমরসিংহের ট্র্যাজিডীতে পরিণত হতে পারতো।[৫৪] কিন্তু অ্যারিষ্টটলের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই নাটক আদি, মধ্য, অন্ত্যযুক্ত গুরুগম্ভীর ঘটনার সমাবেশে সংহত হয়ে ওঠেনি। আদর্শবাদের প্রভাবে কাহিনীটি বিচ্ছিন্ন ও খাপছাড়া কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত। নাটকটিতে Climax বা চূড়ান্ত মুহূর্ত বলে কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন। মোগল-রাজপুত সংঘর্ষকে অবলম্বন করে নাটক শুরু হলেও তারপরই নানা আদর্শ নাটক গ্রথিত হতে আরম্ভ করায় নাটকের ঘটনা বৃন্তচ্যুত হয়ে গেছে। মেবারের পতন নাটকের মূল ঘটনা—কিন্তু সেই পতন এমন ইতিহাস-বিরোধী ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে যে এটি রাজপুতের জাতীয়

জীবনের ট্র্যাজেডী হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ বিজয়ী যেখানে বিজিতদের করুণ অভিব্যক্তিমণ্ডিত দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে কণ্ঠ মেলায় এবং নাটকের শেষে নতুন আশাবাদের সুর ধ্বনিত হয়,[৫৫] চারণীর গানে যুদ্ধরত মেবারের রাণা ও মোগল সেনাপতির রক্তমুখ তরবারি কোষবদ্ধ হয়, সেখানে ট্র্যাজিক আবেদন সৃষ্টি হবে কেমন করে ?

এ সত্ত্বেও কোনও কোনও সমালোচক 'মেবার পতন' নাটকটিকে "তাঁহার এই যুগের সর্বগুণীভূত শ্রেষ্ঠ প্রয়াস বলে উল্লেখ করেছেন [শশাঙ্কমোহন সেন, বঙ্গবাণী. পৃঃ ১৭১] কারণ, এর মধ্যে তাঁরা "হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং ঐ উচ্ছ্বাসের পাকে পাকে" অপরূপ আলোক, মধুর তরঙ্গভঙ্গ এবং সমগ্র শিল্প-সমাধানের একটি সুমার্জিত দীপ্তি"..."ভারতীয় জাতীয় ব্যাধি এবং উহার প্রতিকারে"র [ঐ] উপায়কে লক্ষ্য করেছেন; অর্থাৎ এঁরাও নাটক হিসেবে নাটকটি ইতিহাসের কতটা অনুগত হয়েছে তা বিচার না করে নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল এই ধারণাও পরবর্তী কালে আর অনুসরণ করেন নি।

যে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে তিনি নাটক রচনা করেছিলেন তার সম্পর্কে তাঁর মনোভাব আগেই ব্যক্ত করেছি। তা ছাড়া 'মেবার-পতন' নাটকটির ইংরেজী Fall of Mawar-এর ভূমিকায় তর্জমাকারী ও নাট্যকারের পুত্র দিলীপ রায়ও লিখেছেন : "He was my father.…I began to revere his patriotism, too, the first fire of which had made him famous in the Swadeshi days, when he wrote Patriotic dramas one after another....It was then the hay dry of our Bengali Prtriotism and he caught the contagion, a contagion we should abhor to-day.…We know better now......But in the first flush of our prtriotic adolescence we had all devoutly believed in the gospel of nationalism [which came, ever since, to suck mankind down into real hell with the pledge of a phantom heaven] and had burned with hatred of everything foreign. How easy, alas, to glare at others as the repository of iniquity forgetting our blackest sins !

It was at this point Dwijendralal grew suddenly and utterly sick of patriotism. It was at this turning point of his life that he wrote Fall of Mewar."

দ্বিজেন্দ্রলালের এই রূপ মানসিক পরিবর্তনের ফলে তিনি অবশ্য ঐতিহাসিক নাটক রচনা বন্ধ রাখেন নি। তবে এর পরে যে নাটক লিখেছেন সেগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন অন্তর্দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। রাজপুত-মোগল সংঘর্ষ নয়, তাঁর নাটকে এসেছে মোগল রাজ-অন্তঃপুরের কাহিনী এবং শেষে চলে গেছেন সেই চতুর্থ খৃঃ পূঃ শতকের ঐতিহাসিক পটভূমিকায়।

: নাট্যরীতির দিক্ পরিবর্তন :

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাট্যরীতির দিক্ পরিবর্তন ঘটে 'নূরজাহান' নাটক [১৯০৮] থেকে। এই নাটকের ভূমিকায় তিনি লেখেন: 'মৎপ্রণীত অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক হইতে নূরজাহান নাটকের অনেক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইবে। প্রথম প্রভেদ এই যে, আমি এই নাটকে দেবচরিত্র সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি নাই। আমি এই নাটকে দোষগুণ সমন্বিত মনুষ্য চরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, এই নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতেই আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি। তৃতীয় প্রভেদ এই যে, আমি এই নাটকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারও স্বগতোক্তি একেবারে বর্জন করিয়াছি।'

ঐতিহাসিক নাট্যরীতির এই দিক্ পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের চরিতকার শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে বলেছেন যে, গয়া প্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল 'দুর্গাদাস' নাটকটি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত বন্ধুবর লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে দেখালে তিনি ওই ধরণের নির্দোষ চরিত্রের নাট্য-অনুপযোগিতার কথা বলেন। পরিবর্তে ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব সম্পন্ন ব্যক্তি চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব সমীক্ষাই যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত একথাও বলেন।

এই পরামর্শই সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরীতির দিক্ পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। অর্থাৎ এবার থেকে নিষ্কলুষ জাতীয় বীর দুর্গাদাসের মত চরিত্রের পরিবর্তে 'দোষগুণ সমন্বিত মনুষ্য চরিত্র' অঙ্কনের দিকে তিনি ঝুঁকেছিলেন। তিনি

বুঝেছিলেন যে, বাইরের দ্বন্দ্বের সঙ্গে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিকশিত হলেই নাট্যরস, বিশেষভাবে ট্র্যাজেডী জমে ওঠে।

নূরজাহান নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'নূরজাহান' দোষেগুণে সমন্বিত মানুষ 'বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ' তাঁর চরিত্রকে তীব্র ও জটিলতর করে তুলেছে।

নূরজাহানের জীবন-কাহিনীকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়—প্রথম, তাঁর কুমারী জীবন; দ্বিতীয়, শের আফগানের স্ত্রী রূপে তাঁর দাম্পত্যজীবন এবং তৃতীয়, জাহাঙ্গীরের স্ত্রী অর্থাৎ ভারত সম্রাজ্ঞী হিসাবে তাঁর কার্যকলাপ। 'নূরজাহান' নাটকে তাঁর জীবনের শেষোক্ত স্তর দুটিই তুলে ধরা হয়েছে এবং কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রথম জীবনের স্মৃতি উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। [প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে জনৈক মহিলা বন্ধুর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন]। এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে যে, কুমারী অবস্থায় সম্রাট আকবরের পরিবারের নৈশ ভোজের পর মহিলাদের নৃত্যগীতের সময় যুবরাজ সেলিম তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। সে আকর্ষণ ছিল 'উন্মত্তবৎ'। দুদিন পরে সেলিম তাঁর পিতার অবর্তমানে তাঁদের বাড়ী এসে প্রেম নিবেদন করেন। শের আফগানের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তার বিবাহ হয়। সেলিম তাঁকে ভুলতে পারেন নি। ফলে তাঁকে লাভ করার জন্য শের আফগানকে তিনি হত্যা করান।

এই কাহিনীর প্রথমাংশ সত্যি হলে পরের অংশ অর্থাৎ শের আফগানকে হত্যা করানোর কারণটাও মেনে নিতে হয়। অথচ নূরজাহানের জীবনের এই স্তরের কাহিনী ঐতিহাসিক বলে মেনে নেওয়া কঠিন। নূরজাহানের [প্রথম নাম—মেহেরউন্নিসা] জন্ম এবং তাঁর কুমারী জীবন সম্পর্কে অনেক রোমান্টিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু আধুনিক কালের গবেষণায় তার অধিকাংশই পরিত্যক্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা মুতামিদ খান-এর 'ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী'কেই প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন। এই বই-এর বিবরণ অনুসারে মেহেরউন্নিসার পিতা মীরজা গিয়াস বেগ আকবরের সময় সপরিবারে পারস্য থেকে ভারতে আসেন। পথিমধ্যে কান্দাহারে মেহেরউন্নিসার জন্ম হয়। গিয়াস আকবরের অধীনে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হন। সতের বছর বয়সে মেহের-উন্নিসার সঙ্গে একজন ভাগ্যান্বেষী পারস্যবাসীর বিবাহ হয়। এর নাম

আলি কুলি বেগ ইস্তাঝি। ইনি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথমদিকে বাংলার অন্তর্গত বর্ধমানে জায়গীর লাভ করেন এবং শের আফগান বলে পরিচিত হন। জাহাঙ্গীর যখন জানতে পারলেন যে শের আফগান অবাধ্য হয়ে উঠেছেন এবং বিদ্রোহের চেষ্টা করছেন তখন [১৬০৭ খৃঃ] তিনি বাংলার তদানীন্তন সুবেদার কুতুবউদ্দীনকে পাঠান শের আফগানকে শায়েস্তা করার জন্যে। এতে দু-জনের যে সংঘর্ষ হয় তাতে কুতুবউদ্দীন নিহত হন ; কুতুবউদ্দীনের অনুচরদের হাতে শের আফগানও নিহত হন। তখন মেহেরউন্নিসা এবং তাঁর কন্যাকে আগ্রায় নিয়ে আসা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসার রূপে মুগ্ধ হন এবং চার বছর পরে তাঁকে বিবাহ করেন এবং প্রধানা মহিষীর মর্যাদা দান করেন। সম্রাট নিজেকে নূরউদ্দীন বলে পরিচয় দিতেন ; তিনি মেহেরউন্নিসার নাম দেন নুর মহল [প্রাসাদের আলো] পরে ঐ নাম পরিবর্তিত হয়ে নাম হয় নুরজাহান [জগতের আলো]।

মুতামিদ খানের এই বিবরণীতে সেলিমের সঙ্গে মেহেরউন্নিসার নৈশভোজে সাক্ষাৎ হওয়ার কোনও কথা নেই। তাছাড়া নুরজাহানের জন্যেই শের আফগানকে প্রাণ দিতে হয়—এই সিদ্ধান্ত [যা নুরজাহান নাটকেও দেখানো হয়েছে] সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছে তা ইদানীংকালের। কারণ সমসাময়িক ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এবং কিছু ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এ সম্পর্কে নীরব। পরবর্তীকালের লেখকেরা এই ধারণা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁরা এটা পরিষ্কার করে দেখাতে পারেন নি যে, মেহেরউন্নিসার পিতা ঐ সময়ও উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও কেন মেহেরকে তাঁর পিতার কাছে না নিয়ে গিয়ে সম্রাটের হারেমে রাখা হলো।

নুরজাহানের প্রথম জীবনের কাহিনী তাই ইতিহাস সম্মত নয়, কিন্তু নাটকীয় কাহিনীর পক্ষে খুবই উপযুক্ত হয়েছে। আর শুধু এই কাহিনী দিয়েই নয়, নুরজাহানের জীবনের ইতিহাস-অনুক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে নাট্যকার সুন্দর কৌতূহলোদ্দীপক নাটক সৃষ্টি করেছেন। নুরজাহানের চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার প্রধানত সেক্সপীয়রের নাট্যরীতি গ্রহণ করেছেন। সেক্সপীয়রের চরিত্র' নির্ভর, অন্তসংঘাত সমাকুল ট্র্যাজেডির আদর্শে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা ভাষায় প্রথম একটি সার্থক নারী-ট্র্যাজেডী [She-Tragedy] রচনা করলেন। এদিক থেকে তিনি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী থেকে অনেকদূর এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু চরিত্রকে দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যে পথ অবলম্বন করেছেন ইতিহাসের বিচারে তা পদে পদে ভ্রান্ত বলে বিবেচিত হবে। তিনি নাটকে নুরজাহানকে প্রতিহিংসাময়ী করে সৃষ্টি করেছেন।

ইতিহাসে যে নুরজাহানকে পাওয়া যায় তাতে, তিনি অপূর্ব সুন্দরী, পারস্ত সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পকলার প্রতি তাঁর একান্ত আকর্ষণ, ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং গভীর সাধারণ জ্ঞান ও বিচিত্র মেজাজের তিনি অধিকারী। কিন্তু যেটা তাঁর চরিত্রে সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে তা হচ্ছে তাঁর দুরন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলেই তিনি তাঁর স্বামীকে ডিঙিয়ে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল একটি তীব্র দ্বন্দ্বসঙ্কুল নাটক রচনার প্রয়োজনে ইতিহাসের নুরজাহানকে একটি বিশিষ্ট নাটকীয় আঙ্গিকে স্থাপন করেছেন। ইতিহাসে আমরা নুরজাহানের জীবনের তিনটি পর্যায় দেখতে পাই—একথা আগেই বলা হয়েছে। এর শেষ পর্যায়টি অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের স্ত্রী হিসেবে তার কার্যকলাপ—এই অংশটিই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য থেকেই নুরজাহানের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুরু। রেবা, খেসরু জননী, নুরজাহানের ভারত সম্রাজ্ঞী হবার সম্ভাবনার কথা বলে তার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। নুরজাহানের মুখ দিয়ে নাট্যকারই যেন সেই দ্বন্দ্বের উদ্বোধন ঘোষণা করছেন: "মানুষের মধ্যে কি দুটো মানুষ আছে! তা না হলে অশ্রান্ত দ্বন্দ্ব চলছে কার সঙ্গে?"

এই দ্বন্দ্বের একদিকে নারীর কল্যাণী রূপ, যার মধ্যে রয়েছে 'সম্মানের ঋণ বোধ'—তার নিজের কাছে, তার কন্যার কাছে, নিহত স্বামীর কাছে। [২।৫] অন্যদিকে তার দয়ামায়াহীন, ক্ষমতাস্পৃহা, পৈশাচিক সত্তা; যে সত্তাকে সে নিজেই ঘোষণা করেছে জাহাঙ্গীরের প্রশ্নের উত্তরে:

জাহাঙ্গীর॥ তুমি দেবী না মানবী?

নুরজাহান॥ আমি পিশাচী। [৪।২]

এই সত্তার দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত তার দানবীয় সত্তাই জয়ী হয়েছে।

জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করার পূর্ব মুহূর্তে আমরা নুরজাহানের মধ্যে দেখি ক্ষমতালাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বিবাহের পর সেই আকাঙ্ক্ষার পেছনে দেখা গেল অভিসন্ধি এবং তা হচ্ছে জাহাঙ্গীরের পুত্রদের হত্যা করিয়ে পূর্ব অন্যায়ের

প্রতিশোধ নেওয়া; পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। এ কাজে নুরজাহানকে প্ররোচিত করেছেন কন্যা লায়লা। [২।৮]

খসরুর হত্যার পর নুরজাহানের স্বগতোক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায় যে মানবী কী প্রচণ্ড দানবীয় রূপ ধরেছে :

"বহ্নি জালিয়েছি। এখন সে জলুক। খসরু এক—শেষ হ'ল। সাজাহান দুই—আরম্ভ হয়েছে। তারপর পারভেজ তিন—এখনও আরম্ভ হয় নাই। তারপর সাম্রাজ্য নুরজাহানের ও তার কন্যা লায়লার।...আমি আপনাকে বিক্রয় করেছি যখন তখন উচিত মূল্য উসুল না করে ছাড়বো না।" [৩।৪]। নাটকের দিক থেকে নুরজাহান চরিত্রের এই দ্বন্দ্বসঙ্কুল দিকটা আকর্ষণীয় হলেও ইতিহাসে এর সমর্থন পাওয়া কঠিন। এটা ঠিক যে নুরজাহান উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং জাহাঙ্গীরের ওপরে তিনি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেন। নুরজাহান তাঁর পিতা মীরজা গিয়াস বেগ-[পরে ইতিমাদ-উদ্-দৌল্লা] কে এবং ভাই আশফ খানকে রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেছিলেন। নিজের মেয়েকে [শের আফগানের মেয়ে] জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শারিয়ারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু : "Her devotion to Jahangir was unequalled. She loved him with all the intensity of her full-blooded nature." [Iswari Prasad, '*A short History of Muslim Rule in India*', p. 353].

এই নূরজাহানকে দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারে প্রতিহিংসাপরায়ণা পিশাচী করে তুলেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা নারীর স্বাভাবিক কোমল বৃত্তি কি ভাবে নষ্ট করে দেয়—শেকস্‌পীয়রের লেডি ম্যাকবেথ-এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে কোনও কোনও সমালোচক নুরজাহান চরিত্র ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লেডি ম্যাকবেথ-এর পৈশাচিকতার মধ্যেও নারীত্ব একেবারে হারিয়ে যায়নি। তার অনুতাপ[৫৬] যে সহানুভূতি আকর্ষণ করে, নুরজাহানের নিয়তি তাড়িত স্বগতোক্তি সে সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে না। সে তার পাপের ফল লাভ করেছে। তার জন্যে সহানুভূতি জ্ঞাপনের সুযোগ কোথায়?

নুরজাহান নাটকে সাজাহানের [অর্থাৎ সাজাহানের প্রথম জীবনের] যে চরিত্র আঁকা হয়েছে, সেটাও ইতিহাস সম্মত নয়। সাজাহান, যিনি রাজবংশের যে সকল আত্মীয় স্বজনের সিংহাসনের দাবী করার সম্ভাবনা ছিল তাঁদের সকলকেই

হত্যা করে সিংহাসন নিষ্কণ্টক করেছিলেন, সেই সাজাহান নুরজাহানকে উদ্দেশ্য করে বলেছে :"তুমি অনেক পাপ করেছ। কিন্তু পাপের সেরা পাপ—এ পাপকে তোমার ক্ষমতা দিয়ে ঘিরে এতদিন রক্ষা করা। এত হত্যা! এত পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা। আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে সম্ভব!" [৫।৭]।

এখানেই শেষ নয়। বন্দররাজ, যার সঙ্গে যোগসাজসে নুরজাহান হত্যাকাণ্ড-গুলির অনুষ্ঠান করেন বলে নাটকে দেখানো হয়েছে, সেই বন্দররাজকে সাজাহান বলেছেন: "তুমি ভেবেছিলে যে আমার ভ্রাতাকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করলে[৫৭] আমি খুসী হব। পৃথিবীতে কেউ হয়? হাজারই শত্রু হোক! নিজের ভাই নিজের ভাইপো!" ভ্রাতৃরক্তে সিংহাসনে অভিষেক যার, এটা সেই সাজাহানের উক্তি বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য দর্শকদের হাততালি লাভের দিক থেকে এ উক্তি সুন্দর।

নাটকটিতে লয়লা চরিত্রটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে নুরজাহানের চরিত্র বিকাশের জন্যই। আর এই লায়লাই [যে নারী নুরজাহানের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিণী] নাটকের পরিসমাপ্তিতে অন্ধ স্বামী আর 'দুঃখিনী জননী' নুরজাহানের হাত ধরে সান্ত্বনাময় শান্তির আবেদন জানিয়েছে ঠিক বাঙালীর ঘরের বধূর মত।

বহু প্রসঙ্গ বিজড়িত নাটকটি শ্লথ গতি সম্পন্ন এবং ঘটনাবলীও তেমন সুসংহত নয়।

॥ **সাজাহান** ॥ নুরজাহানের পরবর্তী নাটক 'সাজাহান' [১৯০৯]। নুরজাহান নাটকে বিশ্লেষণমূলক নাট্যরীতি ও ইতিহাসের পটভূমিকায় মানবজীবনের রহস্যে ডুব দেবার যে প্রচেষ্টা আমরা দেখি, সাজাহানে তা অধিকতর সাফল্য লাভ করেছে। সমসাময়িক দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস, আদর্শবাদের আতিশয্য, অনিয়ন্ত্রিত কল্পনার উদ্দাম লীলা অথবা প্রাণহীন চরিত্রের শোভাযাত্রা—এ সব থেকে 'সাজাহান' মুক্তি লাভ করেছে। নাট্যকার পরিপূর্ণভাবে ইতিহাসকেই আশ্রয় করবার চেষ্টা করেছেন এবং ইতিহাসের প্রকৃত কাহিনী নিয়েই নাটক আরম্ভ হয়েছে। সম্রাট সাজাহান ১৬৫৭-এ নানারূপ শারীরিক ব্যাধিতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর পক্ষে নিয়মিত রাজদরবারে উপস্থিত থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যে গুজব প্রচারিত হয় যে, সম্রাট মৃত।

সাজাহানের পুত্রদের মধ্যে দারা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি পঞ্জাব এবং এলাহাবাদ প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই পিতার কাছে থেকে রাজকার্যে সহায়তা করতেন। দারার অন্যান্য ভ্রাতা সুজা, মোরাদ, এবং ঔরঙ্গজেব মনে করলেন যে, তাঁদের পিতার মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু দারা নির্বিবাদে সিংহাসন অধিকার করার জন্য সে সংবাদ গোপন করেছেন। এই সুজা তখন বঙ্গদেশের সুবাদার, ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার এবং মোরাদ গুজরাটের সুবাদার ছিলেন। সাজাহান অবশ্য দারাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেছিলেন।

দারা মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখেছেন এই সন্দেহে সুজা, মোরাদ ও ঔরঙ্গজেব তিনজনই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এই তিনজনের বিদ্রোহের তূর্য নিনাদের মধ্য দিয়েই নাটকের আরম্ভ। আগ্রার দুর্গপ্রাসাদে শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় কর্ণমূল করতলে ন্যস্ত করে সাজাহান মুখ খুললেন: "তাই ত! এ বড় দুঃসংবাদ দারা।"

নাটকের এই সূচনা সংলাপ থেকে ইতিহাসের ঘটনার মতই নাটকের ঘটনাও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছে। বিদ্রোহী পুত্রদের শায়েস্তা করার জন্য শাজাহান দারাকে উপযুক্ত নির্দেশ দিলেন। বাংলাদেশে সুজা নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে সসৈন্যে আগ্রার দিকে অগ্রসর হলেন। গুজরাটে মোরাদও নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। চতুর ঔরঙ্গজেব মোরাদকে স্বপক্ষে এনে তাঁর সঙ্গে এই মর্মে সন্ধি করলেন যে, দারাকে পরাজিত করে তাঁরা দুজনে সাম্রাজ্য ভাগ করে নেবেন। তাঁদের সম্মিলিত বাহিনী উজ্জয়িনীর দিকে অগ্রসর হলো। সুজার বিরুদ্ধে জয়সিংহ এবং দারার পুত্র সোলেমান শিকো প্রেরিত হলেন; মোরাদ ও ঔরঙ্গজেবের সম্মিলিত বাহিনীর গতিরোধ করার ভার পড়ল যশোবন্ত সিংহ ও কাশিম খাঁর ওপরে। কাশীর কাছে যুদ্ধে সুজা পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। এদিকে ঔরঙ্গজেব ও মোরাদের সম্মিলিত বাহিনীর হাতে উজ্জয়িনীর নিকটস্থ ধর্মাটে যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ কাশিম খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি গোপনে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধি করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি। এবার দারা ঔরঙ্গজেবের গতিরোধের জন্যে অগ্রসর হলেন; কিন্তু সামুগড়ের যুদ্ধে ভীষণ-ভাবে পরাজিত হলেন। বিজয়ী ঔরঙ্গজেব আগ্রায় প্রবেশ করে দুর্গ অধিকার

করলেন এবং বৃদ্ধ সাজাহানকে পুত্র মোহম্মদের সতর্ক প্রহরায় কারাগারে বন্দী করলেন।

এরপর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য একে একে তিন ভাইকেই তিনি হত্যা করলেন। প্রথমে কূটকৌশলে ঔরঙ্গজেব বন্দী করলেন মোরাদকে। দুই বছর কারাবাসের পর ঔরঙ্গজেবের আদেশে তিনি নিহত হলেন [১৪ ডিসেম্বর, ১৬৬১]। সুজা দারার পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে সিংহাসন লাভের জন্যে আর একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এলাহাবাদের কাছে খাজুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। তিনি আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি তাঁকে সপরিবারে হত্যা করেন। দারার পুত্র সুলেমান ধৃত হয়ে নিহত হয়েছিলেন। পরাজিত দারা প্রথমে পলায়ন করেন, পরে সৈন্য সংগ্রহ করে রাজপুতনায় আসেন। কিন্তু আজমীরের কাছে দেওয়াবাই গিরিপথে ঔরঙ্গজেব কর্তৃক পরাজিত হলেন। তিনি বোলান গিরিপথের কাছে আফগান দলপতি জীহন খাঁর গৃহে সাময়িক-ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই জীহন খাঁকে একদিন যুবরাজ দারা মৃত্যু-দণ্ডাদেশ থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই জীহন খাঁই দারাকে ঔরঙ্গজেবের হাতে তুলে দিলেন। ঔরঙ্গজেব অবশ্য দারার বিরুদ্ধে একটা বিচারের প্রহসন দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো ধর্মদ্রোহিতার এবং যথারীতি বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো। দারা ও মোরাদের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়কে অবশ্য মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তাদেরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আগ্রা দুর্গে বন্দী সাজাহানের সঙ্গে ছিলেন তাঁর কন্যা জাহানারা। শেষ পর্যন্ত এই জাহানারাই ঔরঙ্গজেব এবং সাজাহানের মধ্যে সাময়িকভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঔরঙ্গজেব পিতা সাজাহানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[৫৮]

এইখানেই নাটক শেষ হয়েছে। ১৬৫৭ থেকে ১৬৬২ পর্যন্ত মোগল ইতিহাসের এই ঘটনাবলী নিষ্ঠার সঙ্গে নাট্যকার রূপায়িত করেছেন। মাত্র দুই একটি চরিত্র [যেমন দিলদার, মহামায়া] ছাড়া সব চরিত্রই ঐতিহাসিক। আর ঐতিহাসিক চরিত্রেরও বিকৃতি ঘটানো হয়নি। সাজাহানের স্নেহ-দৌর্বল্য, ঔরঙ্গজেবের তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধি, দারার সাহিত্য-দর্শনে পাণ্ডিত্য, সুজার সঙ্গীত-প্রিয় ভাব বিলাসিতা, মোরাদের রণদক্ষতা এবং মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি,

দারার পত্নী নাদিরার স্বামী-প্রেম, যশোবন্ত সিংহের পত্নী মহামায়ার গর্বিত আচরণ, সাজাহানের বহুমূল্য সম্পদসমূহ রক্ষার আগ্রহ, জাহানারার সেবা-পরায়ণতা অথচ বুদ্ধিদীপ্তি, প্রখর ব্যক্তিত্ব এসব বিষয়ের সঙ্গেই ইতিহাসের সামঞ্জস্য আছে।

ঘটনা সংস্থান, চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে যেমন ঠিক, তেমনি ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃজনের দিক থেকে সাজাহান নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল অপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত করেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনার ঘনঘটায় নাটকের দৃশ্যগুলি কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-পুত্রীর সংলাপ ব্যবহারিক জীবনের উর্দ্ধে স্থানলাভ করে ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

॥ শেক্স্পীয়রের অনুসরণ ॥ সাজাহান নাটকে নাট্যকার শেকস্পীরীয় নাট্যরীতি আন্তরিকভাবে অনুসরণ করেছেন। একদিকে যেমন বাইরের দ্বন্দ্বের সঙ্গে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রবাহ চলেছে, অন্যদিকে তেমনি উন্মত্তপ্রায় মানুষের মর্মস্পর্শী আচরণ বহির্জগতের ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র ও বিদ্যুতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গগণভেদী হাহাকারে ফেটে পড়েছে। দুর্যোগাকীর্ণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানব হৃদয়ের ক্রন্দন ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐতিহাসিক পরিবেশে প্রাণস্পন্দনের জোয়ার এনেছে। এদিক থেকে আমরা সাজাহানের সঙ্গে শেক্সপীয়রের রাজা Lear নিবিড় সাদৃশ্য খুঁজে পাই। Lear তাঁর অন্তরের ক্ষুব্ধ দাবদাহকে প্রাকৃতিক জগতের ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র ও বিদ্যুতের সঙ্গে এক করে দিয়ে বলেছেন :

> Blow, winds, and crack your cheeks ! range ! blow !
> You cataracts and hurricanoes, spout
> Till you have drench'd our steeples, drown'd the cocks !
>
> [Act III, Sc II]

সাজাহানও বাইরের প্রলয় দেখে ও মেঘের গর্জন, বৃষ্টির শব্দ শুনে তাঁর অন্তরের যন্ত্রণাকে একই ভাবে সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে মুক্তিদান করে বলেছেন : "দে বেটারা! খুব দে, খুব দে। পৃথিবী নীরব হয়ে সব সহ্য করবে। ......দে বেটারা। কি কর্বে ও? রাশি রাশি গৈরিক জ্বালা উদ্গমন করবে? করুক সে, গৈরিক জ্বালা আকাশে উঠে দ্বিগুণ জোরে তারই বুকে এসে লাগবে। ......দে ওর বুকের ওপর দিয়ে দলে' দলে' চষে দিয়ে যা। ও কিছু করবে

পারবে না—সে বেটারা।—মা একবার গর্জে উঠতে পারো না ? প্রলয়ের ডাকে ডেকে, শত সূর্যের প্রভায় জলে উঠে, ফেটে চৌচির হয়ে—মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে একবার ছুটকে যেতে পারো মা ?—দেখি ওরা কোথায় থাকে ? [৫।৩]।

ঔরঙ্গজেবের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ শুনে সাজাহান পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত গর্জন করে উঠেছেন : "......এখনও আকাশ তুমি নীলবর্ণ কেন ! সূর্য ! তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন ? নির্লজ্জ ! নেমে এসো ! একটা মহা সংঘাতে তুমি চূর্ণ হয়ে যাও। ভূমিকম্প ! তুমি ভৈরব হুঙ্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে ফেল। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জলে উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে চলে যাও।" [২।২]। সাহাজাহানের এই উক্তিও রাজা Lear-এর উক্তিরই প্রতিধ্বনি :

And thou, all-shaking thunder,
Strike flat the thick rotundity o' the world !
Crack nature's moulds, all germens spill at once,
That make ingrateful man ! [Act III, Sc II]

রাজা লিয়রের মতই সাজাহানের সম্রাটত্বের বোধ প্রবল : 'আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে, কিন্তু আমি সাজাহান।' তুলনীয় : 'Ah, every inch a king'—king Lear. [Act IV Sc VI]।

আঘাতে আঘাতে বিদীর্ণ হৃদয় লিয়রকে দেখে জনান্তিকে Edgar বলেছেন যে, লিয়রের উক্তি নিছক উন্মাদের প্রলাপ নয় :

O matter and impertinency mix'd !
Reason in madness ! [Act. IV Sc VI.]

সাজাহানের সম্পর্কেও জাহানারা একই ধরণের উক্তি করেছেন : "এ উন্মত্ততা নয় ! এর সঙ্গে জ্ঞান জড়ানো রয়েছে। এ যেন একটা ছন্দে বিলাপ।" [৫।৬]

Lear-এর চরিত্র সম্পর্কে 'A. C. Bradly যা বলেছেন সাজাহান সম্পর্কেও তাই বলা চলে : "When the conclusion arives the old king has for a long while been passive. We have long regarded him not only as 'a man more sinned against than sinning' but almost wholly as a sufferer, hardly at all as an agent." [Shakesperean Tragedy, London, 1963, p. 231]

King Lear-এর আর একটি চরিত্রের সঙ্গে সাজাহান নাটকের একটি চরিত্রের মিল আছে এবং সেটা দিলদার চরিত্র। King Lear নাটকের Fool রাজা Lear-এর অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর। কাল্পনিক চরিত্র দিলদার মোরাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। এখানে মনে রাখা দরকার যে শেক্‌সপীয়রের কমেডির clowns আর এই ট্র্যাজেডীর Fool এক নয়। যদিও দিলদার নিজেকে বিদূষক বলে পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের চরিত্র তার নয়। তার চরিত্র শেক্‌সপীয়রের Fool-এর অনুকরণেই রচিত। তবে তার সঙ্গে 'যাত্রার' বিবেক মিশে গেছে। আর সিরাজদ্দৌলা নাটকের করিম চাচার সঙ্গেও তার একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়।

সাজাহান নাটকের জাহানারার সঙ্গেও King Lear নাটকের Cordelia চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সে Cordelia-এর মত স্নেহময়ী, আবার Lady Macbeth-এর মত প্রতিহিংসা-পরায়ণা। আবার ঔরঙ্গজেব চরিত্রটির শেক্‌সপীয়রের Richard III-এর মিল লক্ষণীয়। ঔরঙ্গজেব Richard III-এর মতই: "ambitions and sanguinary, bold and subtle, treacherous, yet brave in battle, a murderer and userper of the crown." [The Concise Oxford Dictionary of English Literature]।

সাজাহান নাটকটি পুরোপুরিভাবে শেক্‌সপীয়রীয় নাট্যরীতি অনুসরণ করে সুন্দর ট্র্যাজেডী হয়ে উঠেছে। সমগ্র নাটকীয় কাহিনীটি ঘন-সংবদ্ধ, আদি, মধ্য এবং অন্ত্যরেখার সুবলয়ে সুন্দরভাবে চিত্রিত। নাটকীয় কৌতূহলের প্রথম বীজটি প্রথম দৃশ্যেই রোপিত। ঠিক শেক্‌সপীয়রের নাটকের মতই প্রথম দৃশ্যটিকেই বলা যায় 'Keynote of the play.' সেটা এক কথায় বলা হয়েছে: "তাই ত! এ বড় দুঃসংবাদ দারা।" এই দুঃসংবাদ হচ্ছে সুজা-মোরাদ ঔরঙ্গজেবের রাজদ্রোহ। সেই বিদ্রোহের রূপ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠে পিতৃসত্তা বনাম সম্রাট সত্তার সংঘাত সৃষ্টি করেছে এবং সাজাহানের সম্রাটোচিত প্রতিরোধের ফলে নাটকীয় সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছে। নাটকটি শেষ হয়েছে ঔরঙ্গজেবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এবং পিতৃবাৎসল্যই শেষ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে, সাজাহান ঔরঙ্গজেবকে ক্ষমা করেছেন।

নাট্যরীতির ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্‌সপীয়রকে অনুসরণ করলেও চরিত্র

সৃষ্টির দিক থেকে বাঙালীয়ানা সুস্পষ্ট। বিশেষভাবে সাজাহান নাটকে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক সাজাহান একজন দুর্ধর্ষ মোগল হলেও নাটকের সাজাহান একজন পরিপূর্ণ বাঙালী। পুত্র-কন্যাদের জন্যে তাঁর অঢেল স্নেহ। বাঙলাদেশের বিধবা কন্যা যেমন তার বাবার সেবায় জীবন কাটায়, তেমনি এখানেও দেখা যায় রাজকুমারী জাহানারা বাবার পার্শ্বচরিত্র, যেন সে বাপের সেবাতেই জীবন কাটাচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রথম দৃশ্যে সাজাহানের পার্শ্বচরিত্র দারা আর জাহানারা। পরে সাজাহানকে আমরা আবার দেখি প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে। সেখানে সাজাহানের পাশে আছেন জাহানারা আর মহম্মদ। সাজাহানকে সেই দৃশ্যে বন্দী করা হয়।

তারপর সাজাহানের আক্ষেপ, দুঃখ, আস্ফালন সব কিছুই ওই জাহানারাকে নিয়ে। শুধুমাত্র শেষ দৃশ্যে সামান্য কয়েকটা সংলাপ বলতে আসেন ঔরঙ্গজেব। জহরৎকে আনা হয় সাজাহানের উম্মাদ হবার দৃশ্যে, দৃশ্যটি আরও করুণ করে তুলবার জন্য। তখনকার জাহানারার সংলাপ তার বাবার প্রতি গভীর ভালবাসা, সাজাহানের অসহায়তা এবং দুঃখটাই ফুটিয়ে তুলতে। পিতা এবং কন্যার এই চরিত্র বাঙালী দর্শকের একেবারে চেনা। সাজাহান নাটকে সম্রাটের জীবনের ট্র্যাজেডিই দেখানো হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের জীবনের যে অংশ নাটকে বিধৃত তা ট্র্যাজিক নয়। কারণ উত্তরাধিকারের যুদ্ধে তাঁর জয়লাভের মধ্য দিয়েই নাটক শেষ হয়েছে।

: ট্র্যাজেডী বিচার :

ঐতিহাসিকদের ভাষায়: "The reign of Shah Jahan, which had began with high prospects, came to the close in a series of dark tragedies. [An Advanced History of India—Majumdar, Roychoudhuri and Dutta, New York, 1965, p. 487]. এই ট্র্যাজিক ঘটনার সুরু হয়েছে সাজাহান অসুস্থ হয়ে পড়ার পরেই এবং অসুস্থ পিতাকে মৃত ধরে নিয়ে ঔরঙ্গজেব, সুজা, মোরাদ তিনজনই রাজ ক্ষমতা অধিকারে মত্ত হয়েছেন। সাজাহান এই উত্তরাধিকারের যুদ্ধ চোখের সামনে দেখলেন, দেখলেন কেমন করে ঔরঙ্গজেব একে একে সুজা, মোরাদ ও দারা তিন ভাইকেই হত্যা করলো; সাজাহান নিজে হলেন বন্দী।

শুধু দারার কাহিনী নিয়েই সুন্দর ইতিহাস সম্মত ট্র্যাজেডী হতে পারতো। নাট্যকার দারার হত্যা পর্যন্ত দেখিয়েছেন ; কিন্তু যে দারার দুঃখে আবালবৃদ্ধ নরনারী অশ্রুপাত করেছিল, যে দারার মৃতদেহ ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে রাজপথে ঘোরানো হয়েছিল সেই দারার জীবনটাই ছিল ট্র্যাজেডীর উপাদান।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তা করেন নি। বেঁচে থেকেই সম্রাট সাজাহানকে কেমন অসহায়ের মতো নির্মম ঘটনাগুলো দেখতে হলো—সেটাই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। ট্র্যাজেডীর নায়কের মত তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বে হৃদয় বিদীর্ণ, 'রাত্রির ঝড় বৃষ্টির অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে ছুটে' বেরিয়ে যেতে চাইছেন তিনি। কিন্তু সে শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি সম্রাট, ক্ষমতার মূর্তিমান বিগ্রহ—অথচ সে ক্ষমতা কার্যকর করার শক্তি তাঁর নেই—এই তো মর্মান্তিক ট্র্যাজেডী। হ্যাঁ তিনি ঔরঙ্গজেবকে ক্ষমা করেছেন—সে ক্ষমা প্রকৃত শক্তিমানের উদারতা নয়—শক্তিহীনের আত্মসমর্পণ। এই জন্যই তো জাহানারা ঔরঙ্গজেবকে বলেছে—"ঔরঙ্গজেব! এখানে তোমার জয় সম্পূর্ণ হলো।"

বলা যেতে পারে জহরৎ-এর শেষ উক্তিতে ঔরঙ্গজেবের জীবনের ট্র্যাজেডীর ইঙ্গিত আছে। তার অভিশাপের মধ্য দিয়েই ঔরঙ্গজেবের ভবিষ্যৎ জীবনের ট্র্যাজেডী ফুটে উঠছে। কিন্তু সেটা অন্য নাটকের ব্যাপার—এ নাটকের নয়। এ নাটকে কূট-কৌশলী ঔরঙ্গজেব সম্পূর্ণ বিজয়ী।

দিলদারের শেষ উক্তিতেও ঔরঙ্গজেবের ভবিষ্যৎ জীবনের ট্র্যাজেডী নির্ধারিত হয়েছে : 'মনে ভাবছো যে এই জীবন সংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? না, এ তোমার জয় নয় ঔরঙ্গজীব! এ তোমার পরাজয়, বড় পাপের শাস্তি।—অধঃপতন। তুমি যত ভাবছো উঠছো, সত্য সত্য তুমি ততই পড়ছো। তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, যখন সাদা চোখে দেখবে, যে নিজের আর স্বর্গের মধ্যে কি ব্যবধান খনন করেছো। তখন তার পানে চেয়ে তুমি শিউরে উঠবে।" [৫।৫]। এটাও ভবিষ্যদ্বাণী। এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ঔরঙ্গজেব যে ভাবেই ক্ষমতায় আসুন অর্দ্ধ শতাব্দীকাল তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সুতরাং 'সাজাহান' নাটক-এ ট্র্যাজেডী সাজাহানকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রথম অঙ্কেই ট্র্যাজেডীর নায়কের মধ্যে যে দুর্বলতার ছিদ্রপথ থাকে তার

মধ্য দিয়েই 'শনি' প্রবেশ করেছে এবং সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত অপত্যস্নেহ। সাজাহান নিজেই বলেছেন : "আমার হৃদয় এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা পুত্রকন্যারা আমার। তাদের শাসন করবো। কোন্ প্রাণে জাহানারা।" এই অতিরিক্ত অপত্যস্নেহই সাজাহানের অন্তিম জীবনের হাহাকার সৃষ্টি করেছে। মদমত্ত, ক্ষমতালিপ্সু, শঠ ও হিংস্র ঔরঙ্গজেবের অনুতাপ-দগ্ধ জীবন চিত্র রচনা করে তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডী নাট্যকার রচনা করেছেন বলে যারা মনে করেন তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, ঔরঙ্গজেবের মার্জনা ভিক্ষাও কপটতা, ওটা আত্মগ্লানি থেকে উদ্ভূত নয়। এটা জাহানারা ভালই জানতো তাই ক্ষমাপ্রার্থী ঔরঙ্গজেবকে সে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে : 'রাজদস্যু! ঘাতক! শঠ!' এবং জহরৎ তাঁকে দিয়েছে অভিশাপ।

দুর্গাদাস নাটকে ঔরঙ্গজেবের কাহিনী অবশ্যই ট্র্যাজিক। সেখানে নাট্যকার ঔরঙ্গজেবের জীবনের করুণ চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু সেই দৃষ্টান্ত সাজাহানে আরোপ করে সাজাহান নাটককে ঔরঙ্গজেবের ট্র্যাজেডী বলা চলে না। দুটি নাটক পৃথকভাবে বিচার করতে হবে। ইতিহাসে ঔরঙ্গজেব অবশ্যই ট্র্যাজিক চরিত্র, কিন্তু সেই ট্র্যাজেডী সাজাহানের জীবৎকালে সুরু হয়নি। ইতিহাসই বলে : "Aurangzib's conduct during the War of succession was marked by rapidity of movement, wise distribution and exact co-ordination of forces, and quick-eyed generalship in the field as well as his royal gift of judging the character of man at sight and choosing worthy and faithful agents, we can easily understand his unbroken success in his war against three rivals of equal rank and resources, none of whom was a coward or imbecile." [The Cambridge History of India, Vol IV]

এই ঔরঙ্গজেবকে কি করে ট্র্যাজিক চরিত্র বলা যায় এবং কেমন করেই বা তার বড় রকমের বিজয়কে আমরা ট্র্যাজেডী বলতে পারি?

॥ **চন্দ্রগুপ্ত** ॥ মোগল সম্রাট আকবর থেকে আরম্ভ করে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মোগল সম্রাটদের কাহিনী নিয়ে নাটক রচনার পরে দ্বিজেন্দ্রলাল দূর ইতিহাসের দিকে চলে গেছেন, যে 'ইতিহাস-ছড়িয়ে আছে খ্রষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। তিনি রচনা করেছেন 'চন্দ্রগুপ্ত' [১৯১১]।

নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করে পাটলিপুত্রে যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন সেই চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লিখেছেন। এই নাটকের ঐতিহাসিক উপাদান বিচার করে ড. সুকুমার সেন রায় দিয়েছেন: ‘কি ঘটনা বিন্যাসে, কি নামকরণে, কি সংলাপে, কি চরিত্র চিত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের বিন্দুমাত্র মর্যাদা রক্ষা করেন নাই।......কাহিনীতে [চন্দ্রগুপ্তের] ইতিহাসের মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত।” [‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, কলিকাতা, ১৩৬২, ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৩৪-৫]।

ইতিহাসের যে অধ্যায় নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লিখেছেন সে সম্পর্কে আজও পরিপূর্ণ তথ্য আহৃত হয় নি বা চন্দ্রগুপ্তের বংশ, রাজ্যপ্রাপ্তির তারিখ প্রভৃতি বিষয়ে নানারকম ব্যাখ্যা রয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকটির ভূমিকায় নিজেই স্বীকার করেছেন: “ইতিহাস হইতে কোন সাহায্য পাই নাই। অনন্যোপায় হইয়া কল্পনার উপরেই সমধিক নির্ভর করিয়াছি।” এই কথা ধরলে চন্দ্রগুপ্ত নাটকটিকে ঐতিহাসিক নাটকের তালিকা থেকে এক কথায় ছেঁটে ফেলা যায়। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের চন্দ্রগুপ্তকে নিয়েই তিনি নাটক লিখছেন এবং নাটকের পাত্র-পাত্রী প্রায় সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গেও নাটকের ঘটনার মিল আছে তখন এই নাটককে সোজাসুজি খারিজ করা যায় কি করে? তা ছাড়া ইতিহাসের ধার কাছ দিয়েও দ্বিজেন্দ্রলাল যান নি একথাও তো ঠিক নয়। কারণ, চাণক্য চরিত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: “হিন্দু নাট্যকার ও ইতিহাসকারগণ প্রধানত ব্রাহ্মণ চাণক্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য ব্যস্ত।......ইংরাজ ইতিহাস-কারগণ চাণক্যকে ‘ভারতের ম্যাকিয়াভেলি’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চাণক্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কূট ছিলেন। আমিও সেই মত গ্রহণ করিয়াছি।” [‘চন্দ্রগুপ্ত’ ভূমিকা]। সুতরাং ইতিহাস তিনি ঘেঁটেছেন এবং পুরাণের সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যকে তিনি ব্যবহারও করেছেন। তবে কিভাবে এবং কতটা ব্যবহার করেছেন সেটাই লক্ষণীয়।

গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার [সেকেন্দার] ৩২৭ খৃঃ পূর্বাব্দের মে মাসে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন।[৬০] ৩২৬ খৃঃ পূর্বাব্দের জুলাই মাসের শেষ দিকে নিজের সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় আরও পূর্ব দিকে তাঁর বিজয় যাত্রার গতিমুখকে ঘুরিয়ে নিতে তিনি বাধ্য হন।[৬১] এর

মাঝখানে পুরুর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। তিনি ৩২৩ খৃঃ পূর্বে ব্যাবিলনে মৃত্যু-বরণ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রথম দৃশ্য আরম্ভ হয়েছে যে বিষয় নিয়ে তাতে রয়েছে পুরুর সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের সংঘর্ষের কথা এবং চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর নাটকীয় সাক্ষাৎকার। পুরুর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ এবং কথোপকথন ঐতিহাসিকরা মোটা-মুটি সমর্থন করেছেন। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যে আলেকজাণ্ডারের দেখা হয়েছিল একথা গ্রীক ঐতিহাসিকরা এবং V. A. Smithও বলেছেন।[৬২]

কিন্তু প্রথম দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ঐতি-হাসিকরা একমত নন। চন্দ্রগুপ্ত আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন: 'আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার করে আমায় নির্বাসিত করেছে।' ভারতীয় পুরাণ, কিম্বদন্তী, ঐতিহাসিক Jastin প্রমুখ কিছু ঐতিহাসিক চন্দ্রগুপ্তকে নীচ বংশোদ্ভূত [a man of humble origin] বলেছেন। V. A. Smith তাঁকে 'অবৈধ সন্তান' বলেছেন। Dr. R. C. Majumder তাঁর Ancient India [1960] গ্রন্থে বলেছেন: "the early career of this hero is all but unknown," [p. 104]. দ্বিজেন্দ্রলাল এ ব্যাপারে ইতিহাস থেকে কিছু নিশ্চিতরূপে জানতে না পেরেই সম্ভবত পুরাণের ওপর নির্ভর করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"চন্দ্রগুপ্তের জীবন বৃত্তান্ত ইতিহাসে কিছুই পাওয়া যায় না। পুরাণ মতে তিনি মহাপদ্মের শূদ্রাণী পত্নী গর্ভজাত পুত্র ও নন্দের বৈমাত্রেয় ভাই। তিনি বাহুবলে নন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মগধের রাজা হন এবং মন্ত্রী চাণক্যের সাহায্যে ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন। সেলুকসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ এবং সেলুকসের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ—এ দুই ব্যাপারের উল্লেখ মাত্র পুরাণে নাই। গ্রীক ইতিহাস পাঠে আমরা এই বৃত্তান্ত অবগত হই।"

চন্দ্রগুপ্ত নাটকের চাণক্য প্রসঙ্গ অনৈতিহাসিক নয়। ৩২৬ খৃঃ পূর্ব ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। আলেক-জাণ্ডার তখনও পঞ্জাবে ছিলেন। সিন্ধু নদের নিম্ন উপত্যকায় স্থানীয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা এক প্রচণ্ড অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। তবে অভিযানকারী গ্রীকরা এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে। কিন্তু শীঘ্রই এর প্রতিশোধ নেবার ব্যবস্থা

হয়। চাণক্য অথবা কৌটিল্য নামে তক্ষশীলার এক ব্রাহ্মণ এই সময় এমন ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন যে তিনিই হন বিদেশী অভিযানকারী অধ্যুষিত নির্যাতিত জনসাধারণের আশ্রয়স্থল।[৬৩] এই চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত মগধের অত্যাচারী রাজা ধননন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৬৪]

এই চাণক্য সম্পর্কে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন: "হিন্দু নাটককার ও ইতিহাসকারগণ প্রধানত চাণক্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য ব্যস্ত। চাণক্যের শ্লোক এখনও ছাত্রদের পাঠ্য। ইংরেজ ইতিহাসকারগণ চাণক্যকে ভারতের 'ম্যাকিয়াভেলি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চাণক্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কূট ছিলেন। আমিও সেই মত গ্রহণ করিয়াছি।" শুধু সেই মত গ্রহণ করা নয়, চন্দ্রগুপ্ত নাটক থেকে একাধিক উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যেতে পারে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল 'ম্যাকিয়াভেলি'র আদর্শ হুবহু এখানে নানা প্রসঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

: ম্যাকিয়াভেলি ও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক :

বস্তুনিষ্ঠ রাজনীতিতে কূটনীতিবর্জিত আদর্শবাদের কোন স্থান নেই। বস্তুনিষ্ঠ রাজনীতির মূল কথা হল—end justifies the means. উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে যে কোনও পথই অবলম্বন করা যেতে পারে। এই নীতির প্রবক্তা হলেন ভারতের কৌটিল্য এবং ইতালীর ম্যাকিয়াভেলি [১৪৬৯-১৫২৭]। সে যুগের অন্যতম চিন্তাবীর ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন একাধারে ঐতিহাসিক, দার্শনিক, নাট্যকার ও কূটনীতিবিদ্। তাঁর কাছে রাজনীতি ছিল কি করে রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়, তাকে রক্ষা করা যায়, তাকে শক্তিশালী করা যায় তার এক উন্নত কলাকৌশল। তাঁর ঔৎসুক্য ছিল রাষ্ট্রের জন্য, মানুষের জন্য নয়। তাঁর রাষ্ট্র দর্শনের সাক্ষ্য Prince [১৫১৩ খৃঃ রচিত এবং ১৫৩২ খৃঃ প্রকাশিত]।

নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি [Niccolo Machiavelli] রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে ধরণের রাষ্ট্রই গড়ে উঠুক না কেন, তার বনিয়াদ হ'ল নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং শস্ত্রবল। নিয়ম শৃঙ্খলা আবার নির্ভর করে শস্ত্রবলের ওপর। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার

ক্ষেত্রে দণ্ডবিধানের মৌল নীতিকে কোন আদর্শবাদের খাতিরেই অগ্রাহ্য করা চলে না। রাষ্ট্রনায়ক যখন জনসমর্থন ছাড়া কলুষিত পথে ক্ষমতা অধিকার করেন তখন নিজেকে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত রাখার জন্যে প্রধানতঃ তাকে শস্ত্রবলের ওপরেই নির্ভর করতে হয়।

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি থেকেই দেখা যাবে যে এই রাষ্ট্রাদর্শ যে ম্যাকিয়াভেলির তাঁর আদর্শকে অনেক জায়গায় হুবহু অনুকরণ করা হয়েছে। ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন: "রাষ্ট্রনায়ক কখন প্রজাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হন? —যখন তিনি প্রজাদের ধনদৌলত অপহরণ করেন, তাদের কন্যা ও পত্নীদের আত্মসাৎ করেন, তাদের মান ও সম্ভ্রমের ওপর আঘাত করেন।"

নাটকের প্রথম দিকেই আমরা শুনি নন্দ কর্তৃক চাণক্যের সম্পত্তি হরণের কথা [১।২] এবং দেখি মুরার অপমানের দৃশ্য [১।৩]। এই অপমানিতা নারী আর হৃতসর্বস্ব ব্রাহ্মণ চাণক্যের ক্রোধ নন্দের পতন ঘটিয়েছে।

ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন: "মহানুভবতা প্রদর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে রাষ্ট্রনায়ককে স্মরণ রাখতে হবে, উদারতা ও মহানুভবতা যেন ভুল পথে পরিচালিত না হয়। [চন্দ্রগুপ্ত নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্য দ্রষ্টব্য] প্রজাদের প্রীতিলাভ এবং তাদের মনে ভীতিসঞ্চার, দুই-এরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু দু'টি একসঙ্গে চলে না। তাই প্রীতিলাভের চেয়ে ভীতি সঞ্চার করে ক্ষমতা রক্ষা করাই নিরাপদ পন্থা।" ম্যাকিয়াভেলি তাঁর এই বক্তব্য সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন: "মানুষ সাধারণত অকৃতজ্ঞ, অস্থিরচিত্ত, কপট; তারা বিপদ এড়িয়ে চলে এবং সুবিধালাভের চেষ্টা করে। বিপদের যখন কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না, তখন তারা রাষ্ট্রনায়কদের জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করার সংকল্প প্রকাশ করে; কিন্তু দুর্দিন যখন ঘনিয়ে আসে তখন তারা করে বিদ্রোহ।" দ্বিজেন্দ্রলাল কাত্যায়ন ও বাচাল চরিত্র উত্থাপনের মধ্য দিয়ে কি এই উক্তির সার্থকতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেন নি? [৩।২]

ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন: "শত্রুকে ঝাড়ে বংশে নির্মূল করতে হবে। প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়কের বংশে বাতি দিতে কেউ যেন না থাকে—এটা ভাল-ভাবে দেখতে হবে।" চাণক্যও নন্দকে এই কথাই বলেছেন—"ভূতপূর্ব মহারাজ! তোমার বংশে বাতি দিতে কেউ নাই। নন্দবংশ নির্মূল করেছি।"

ম্যাকিয়াভেলির কথা : "প্রজাদের বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবে।" চন্দ্রগুপ্ত তা করেছেন। আবার নন্দকে হত্যার বাপারেও দেখা যায় ম্যাকিয়াভেলিরই নির্দেশ : "সুপরিকল্পিত নিষ্ঠুরতা হল সেই নিষ্ঠুরতা যা অত্যন্ত দ্রুত, প্রয়োজনবোধে চরম নির্মমতার সঙ্গে একবার মাত্র প্রয়োগ করা হয়।"

ম্যাকিয়াভেলি বলেছেন : "যদি রাষ্ট্রনায়ক নিজের মঙ্গল কামনা করেন তা হলে তাঁকে বিশেষভাবে অনুশীলন করতে হবে সৎ না হওয়ার কলাকৌশল [learn how not to be good]. এর সঙ্গে তুলনীয় চাণক্যের উক্তি [কাত্যায়নকে] : "তোমায় আমি পুরো বিশ্বাসঘাতক করে ছেড়ে দেবো।" [৩।৩]।

ম্যাকিয়াভেলি বিশ্বাস করতেন যে : 'রাজনীতির মধ্যে চক্রান্ত এবং প্রতি-চক্রান্ত সব সময়েই বর্তমান এবং সামরিক ব্যবস্থার মধ্যে ষড়যন্ত্র একটি প্রাথমিক ব্যাধি।' এর জন্যে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে এবং ব্যবস্থা নিতে হবে। চাণ্যক্য গুপ্তচরের সাহায্যে তার ব্যবস্থা নিখুঁত করেছিলেন। তাঁরই উক্তি : 'চমৎকার এই ব্যবসা—সংবাদের চৌর্যবৃত্তি! এ চাণক্যের সৃষ্টি।'

এই ভাবে দেখান যেতে পারে যে, ম্যাকিয়াভেলিকে সামনে রেখেই দ্বিজেন্দ্রলাল চাণক্য চরিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছেন।

: 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'মুদ্রারাক্ষস' :

নবকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' [১৩৩৬] বইতে লিখেছেন : 'কোনও কোনও সমালোচক অনুমান করিয়া লইয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলাল মুদ্রারাক্ষস হইতে নাটকের [অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত নাটকের] ভাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মুদ্রারাক্ষসে চন্দ্রগুপ্তের কথা আছে সুতরাং দ্বিজেন্দ্রকে ঐ নাটক পাঠ করিতে হয় এবং তিনি মেগাস্থিনিসের বিবরণ Greeks in India প্রভৃতি ইতিহাস হইতেও উপাদান সংগ্রহ করেন। কিন্তু ইতিহাস বা মুদ্রারাক্ষস হইতে ঐ নাটক রচনায়, বিশেষতঃ চরিত্র সৃষ্টি বিষয়ে সামান্যই সাহায্য পাইয়াছিলেন।" [পৃঃ ১৮৬]।

একথা ঠিক যে দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত নাটক যেখানে শেষ হচ্ছে সেখান থেকে বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসের আরম্ভ। এই সংস্কৃত নাটকটির অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০১-এ। এর দশ বছর পরে দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত রচিত হয়। আমি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনূদিত মুদ্রারাক্ষস নাটকের ভূমিকা ['গোড়ার কথা'] হুবহু উদ্ধৃত করে এবং সেই সঙ্গে 'চন্দ্রগুপ্তের' দৃশ্যাবলীর

উল্লেখ করে দেখাতে চাই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ 'গোড়ার কথা'কে ভিত্তি করেই তাঁর চন্দ্রগুপ্ত রূপদান করেছেন।

"চন্দ্রগুপ্তের পূর্বে মহানন্দ মগধের রাজা ছিলেন। শকটার নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিল" [চন্দ্রগুপ্ত নাটকে একে বলা হয়েছে 'শাকতাল'] ঃ

১ম ব্যক্তি। নূতন মন্ত্রী হলেন তবে কাত্যায়ন ?
২য় ব্যক্তি। কাত্যায়ন কি রকম! শাকতাল
১ম ব্যক্তি। তারই নাম কাত্যায়ন। [১।২]

"কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা মহানন্দ শকটারকে একবার কারারুদ্ধ করেন। সেই অবধি শকটার প্রতিশোধ লইবার মানসে নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় ব্রাহ্মণ একান্ত মনে কুশমূল উন্মুলিত করিয়া তক্র ঢালিয়া দিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন—কিয়দ্দিন হইল, এই পথে বিহার করিতে যাইতেছিলেন, পদতলে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়া ক্ষতাশৌচ হওয়াতে তাহায় ব্যাঘাত হইয়াছে। আমি এই নিমিত্ত এখানকার সমস্ত কুশমূল উৎপাটিত করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে কাত্যায়নের সঙ্গে চাণক্যের যখন দেখা হয় তখন তিনিও কুশাঙ্কুর উন্মুলিত করছিলেন। তবে চাণক্যের মনোভাব অন্যরকম—
'চাণক্য। এঃ আমায় নিঃসহায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পেয়ে এই নীচ কুশাঙ্কুর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। রোসো, আমি এ কুশগুচ্ছ নির্মূল করি।' [১।২]।

"ইনিই বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। ইতিমধ্যে মহানন্দের পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। শকটার চাণক্যকে নিমন্ত্রণপূর্বক রাজবাটীতে লইয়া গেলেন এবং সর্বাগ্রে তাঁহাকে পাত্রীর আসনে বসাইয়া স্বয়ং কোন কার্যাপদেশে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শাস্ত্র নিষিদ্ধ একজন কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ পাত্রীর আসনে উপবিষ্ট এবং কে আনিয়াছে সবিশেষ শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া শিখাকর্ষণ পূর্বক তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। চাণক্য বলিলেন—সভ্যগণ! তোমরা সাক্ষী থাকিলে—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন নন্দবংশ ধ্বংস করিতে না পারি, ততদিন আমার এই শিখা এইরূপই রহিল।"

চন্দ্রগুপ্ত নাটকেও দেখি কাত্যায়ন মহারাজ নন্দের মাতামহের শ্রাদ্ধে [পিতৃ

শ্রাদ্ধ নয়] পৌরোহিত্য করার জন্যে চাণক্যকে নিয়ে এসেছেন এবং মহারাজের শ্যালক বাচাল চাণক্যের শিখা ধরে টেনে বের করে দিচ্ছেন। অপমানিত চাণক্য নন্দকে বলছেন : "এই নন্দবংশ ধ্বংস না করি ত আমি চণকের সন্তান নই। তোমার রক্ত হস্তে এই শিখা বাঁধবো এই প্রতিজ্ঞা করে গেলাম।" [১।৩]

"তাহার পরেই তিনি অভিচার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া রাজাকে ও রাজপুত্রকে বিনাশ করিলেন এবং সিংহাসনাধিকারী—পরে তপোবনবাসী রাজভ্রাতা সর্বর্থসিদ্ধিকে অন্য উপায়ে হত্যা করিয়া শকটারের পরামর্শ অনুসারে ক্ষৌরকার পত্নীর গর্ভসম্ভূত রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।"

চন্দ্রগুপ্ত নাটকেও [১'৪] কাত্যায়নই চাণক্যকে চন্দ্রগুপ্তের কাছে নিয়ে এসেছে এবং চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে ভারতের অধীশ্বর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

'মুদ্রারাক্ষসের' পর্বতরাজের পুত্র মলয়কেতু চন্দ্রগুপ্ত নাটকে যে, চন্দ্রকেতু হয়েছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কারণ মুদ্রারাক্ষস নাটকের মত চন্দ্রগুপ্ত নাটকেও চন্দ্রগুপ্ত পার্বত্য শক্তির সাহায্য লাভ করেছিলেন। 'মুদ্রারাক্ষসে'র চন্দ্রকেতুর প্রতিহারী বিজয়া পরিস্ফুট হয়ে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে ছায়ায় রূপান্তরিত হয়েছে মনে হয়। এছাড়া মুদ্রারাক্ষসের তৃতীয় অঙ্কের সুগাঙ্গ-প্রাসাদ দৃশ্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের যথেষ্ট মিল আছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংলাপেও মিল।

'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে চাণক্য কৌমুদী উৎসব বন্ধের আদেশ দিয়েছিলেন এবং এর কারণ তিনি চন্দ্রগুপ্তের কাছে প্রকাশ করতে চাননি। চন্দ্রগুপ্ত নাটকেও দেখি চন্দ্রগুপ্তের আগমন উপলক্ষে নগরী আলোকিত করার আদেশ চাণক্যের নির্দেশেই পালিত হয়নি। এখানেও তিনি এর জন্যে কোনও কৈফিয়ৎ দিতে রাজী নন। 'মুদ্রারাক্ষসে' চন্দ্রগুপ্ত এতে ক্ষুব্ধ হয়ে চাণক্যকে বলেছেন: 'আপনি প্রত্যেক বিষয়েই আমার ইচ্ছায় বাধা দেন। আমি দেখছি, এ আমার রাজ্য নয়,—এ আমার কারাগার।'

তুলনীয় : 'দেখছি নিজের সাম্রাজ্যে আমি বন্দী। নিজের গৃহে আমি ভৃত্য' [৪।২]।

: ঐতিহাসিকতা ও অনৈতিহাসিকতা :

খৃঃ পূর্ব ৩২৩-এ ব্যাবিলনে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর

সেনাপতিরা তাঁর বিজিত রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেন। এর আগেই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডারের দেখা হয়। চন্দ্রগুপ্ত তখন কিশোর। তিনি আলেকজাণ্ডারের মুখের ওপর কড়া কথা বলায় তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে হত্যার আদেশ দেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কোনক্রমে দ্রুত সেখান থেকে পলায়ন করেন। এই পলায়মান অবস্থায় বিন্ধপর্বতে তাঁর সঙ্গে চাণক্যের সাক্ষাৎ ঘটে। এ সব ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায় এবং নাটকের ঘটনাবলীর সঙ্গে এগুলির মোটামুটি মিল আছে।[৬৫]

তারপর সেলুকাস প্রসঙ্গ। সেলুকাস আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের ভাগ হিসাবে ব্যাবিলনের শাসনভার লাভ করেন। সেলুকাস যখন তাঁর ক্ষমতার উচ্চশিখরে সেই সময় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন অধিকার করেন। সেলুকস ধীরে ধীরে তাঁর সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত প্রসারিত করেন। সিন্ধুর পূর্ব তীরেও তিনি সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সন্ধি করেন। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে ৫০০ হাতির বিনিময়ে কাবুল, হিরাত, কান্দাহার, বেলুচিস্থান চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে দেন। এই চুক্তির অন্যতম বিষয় ছিল বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। এ সব ঘটনার সঙ্গেও চন্দ্রগুপ্ত নাটকের ঘটনার মিল আছে।[৬৬]

অবশ্য ইতিহাসে সেলুকসের কন্যার নাম নেই; প্রধানত 'বৈবাহিক সম্পর্ক' [marriage contract] স্থাপনের কথাই আছে। তবে V. A. Smith তাঁর *Early History of India* বইতে এবং J. W. Mc' Crindle তাঁর *The Invasion of India by Alexander* বইতে এবং আরও কয়েকজন ঐতিহাসিক সেলুকসের কন্যাকেই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে বিবাহ দানের কথা বলেছেন। নাট্যকার এই বিবাহ নিয়ে সেলুকস ও তাঁর কন্যার মধ্যে খানিকটা নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন। এটা করতে গিয়ে তিনি হেলেনের মুখ দিয়ে যে উক্তি করিয়েছেন সেটা খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতকের কোনও গ্রীক মহিলার উক্তি হতে পারে না। হেলেন বলেছে: "এ বিবাহ হেলেন আর চন্দ্রগুপ্তের নয়, এ বিবাহ কর্মে ও মোক্ষে, চিন্তায় ও কল্পনায়, বিজ্ঞানে ও কবিত্বে। এই বিবাহে দুই সভ্যতার মধ্যে একটা মহা ব্যবধান ভেঙ্গে গেল।" এটা এ যুগের কথা—এ যুগের অনুভূতি।

এণ্টিগোনস্ ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু হেলেনের সঙ্গে প্রেম এবং শেষে

দু'জনের সঙ্গে ভ্রাতা-ভগ্নি সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রোমাণ্টিকতাই প্রকাশ পেয়েছে।

ছায়া চরিত্রটি সম্পূর্ণরূপেই কাল্পনিক চরিত্র। ইতিহাসের সীমার মধ্যে রচিত চন্দ্রকেতুকে আশ্রয় করে ছায়া এই নাটকে প্রবেশ করেছে। এই রোমাণ্টিক ও আবেগময় চরিত্রটি ঐতিহাসিক নাটকে বড় বেশী প্রাধান্য অর্জন করেছে।

ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এই শ্রেণীর নাটকে ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাকে অবিকৃত রেখে সাহিত্যের রস পরিবেশন করতে হবে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের বাল্যকাল থেকে তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে পুরোপুরি ইতিহাস-সম্মত ঐক্যমত বর্তমান নেই। তাই ইতিহাস, পুরাণ, কিম্বদন্তী, জৈন, বৌদ্ধ সাহিত্য সব মিলিয়ে মিশিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকটি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন: 'ইহার [অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত নাটকের [ঐতিহাসিক উপাদান নিতান্ত নগণ্য ছিল বলিয়াই নাট্য-কারকে অনন্যোপায় হইয়া যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহার ফলেই ইহার মধ্যে কতকগুলি লৌকিক উপাদান ব্যবহৃত হইয়াছে। ...যেখানে ঐতিহাসিক নির্দেশ অত্যন্ত ক্ষীণ সেইখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিচৈতন্য অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।' ['বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ১৯৬১, পৃঃ ৩২৮-২৯]।

এর ফলেই আমরা দেখি ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে নাট্যকার তাঁর রোমাণ্টিক ভাবাদর্শের রং ইচ্ছামত চাপিয়ে দিচ্ছেন। ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন: "চন্দ্রগুপ্ত ঐতিহাসিক নাটক হইলেও ইহাতে নাট্যকার ঐতিহাসিক চরিত্র-গুলিকে তাহাদের দেশ ও কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙালীর হৃদয়ের দ্বারে টানিয়া আনিয়াছেন। ...প্রকৃত পক্ষে গৃহধর্ম এই নাটকের মূল ভিত্তি। স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, বাৎসল্য প্রমুখ নিতান্ত সহজ মানবিক বৃত্তিগুলিকেই এই নাটকা-খ্যানের মূল উপজীব্য করা হইয়াছে...ইহার বহির্মুখী নাটকীয় ঘটনাসমূহ অপেক্ষা এই সকল স্বাভাবিক মানবিক বৃত্তিগুলি সাধারণ পাঠকের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয়। হেলেনের প্রতি সেলুকসের স্নেহ, হেলেনের পিতৃভক্তি, চন্দ্রগুপ্তের মাতৃভক্তি, মুরার সন্তান স্নেহ, কাত্যায়নের সন্তান শোক, চাণক্যের সন্তান বাৎসল্য, ছায়ার প্রেম, চন্দ্রগুপ্তের ভ্রাতৃ প্রীতি, আন্টিগোনসের মাতৃভক্তি ও জননীর বাৎসল্য এই সকল বিষয়ই ইহার মধ্যে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে

যে, ইহার বহির্মুখী ঘটনাবলী ইহাদের নিকট গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। একটি রোমাণ্টিক পরিবেশের মধ্যে কতকগুলি মানবিক হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্য নাট্যকার দিয়েছেন। …এই ভাব-বিলাস বাঙ্গালীর হৃদয় ধর্মের অনুগামী ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশাত্মবোধের এবং অপমানিত মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের যুগলক্ষণ।" [ঐ পৃঃ ৩৩৪-৩৫]।

নাটকটিতে তাই শেষ দিকে যেটা বড় হয়ে ওঠে সেটা হচ্ছে ছায়ার আত্মত্যাগের কাহিনী এবং চাণক্যের জাগ্রত পিতৃত্ব। ঐতিহাসিকদের ভাষায়: ইতিহাসের যেটি সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায় সেই অধ্যায় নিয়ে যে নাটক শেষ হলো, সে নাটকে ঐতিহাসিক পরিবেশের চেয়ে বেশী করে ফুটে উঠলো কতকগুলি নরনারীর উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ। যে ভাবাবেগে প্রেমিকা হলো ভগ্নি, পার্বত্য রমণী রত্নহার পরিয়ে দিল গ্রীক-সেনাধ্যক্ষের কন্যার কণ্ঠে, গ্রীক সৈনিক ভারতীয় রাজাকে আলিঙ্গন করলো ভাই বলে। অন্যদিক থেকে চাণক্যকে এমন প্রাধান্য দেওয়া হলো যে, শেষ তিনটি দৃশ্য বাদ দিলে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটিই হতো 'চাণক্য'।

: 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের মূল ভিত্তি :

দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন: "হিন্দু ইতিহাসকারগণ আপনাদের বিজয়কাহিনী পর্যন্ত গোপন করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ণভেদ লইয়াই ব্যস্ত। সেইজন্য বর্ণভেদকেই বর্তমান নাটকের ভিত্তিস্বরূপ করা হইয়াছে!"

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্য ব্রাহ্মণ, মহারাজ নন্দ ক্ষত্রিয়, চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর মাতা মুরা শূদ্র এবং ব্যাপক অর্থে চন্দ্রকেতু ও ছায়াও শূদ্র। তাই বলা যায়, যে বর্ণাশ্রম ধর্মের তিনটি বর্ণকে নাট্যকার নাটকে স্থান দিয়েছেন।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালকে বলা যায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবক্ষয়ের যুগ। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেই ভারতের চিন্তাধারায় গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রাবল্য সনাতন আর্যধর্ম ক্রিয়াবহুল প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। ওই সময়ে যে দুজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতের ধর্মজীবনে গভীর রেখাপাত করে, তাঁরা হচ্ছেন বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধধর্মের সারা ভারতে প্রসার লাভ ঘটে চন্দ্রগুপ্তের পরে; তবে তার প্রস্তুতি চলছিল চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকেই। দ্বিজেন্দ্রলাল তাই চাণক্যের মুখ দিয়ে

বলিয়েছেন : "· জানি সব যাবে। এই অবিশ্বাসী বৌদ্ধযুগ ধ'রে ফেলেছে ; —ব্রাহ্মণের শাঠ্য, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজী ধ'রে ফেলেছে, গলা টিপে ধরেছে। ঐ বন্যা আসছে! যাবে—ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব যেতে বসেছে, যাবে! রক্ষা কর্তে পার্ব না।" [১।২]। নাটকের আরম্ভে এই আশঙ্কা প্রকাশ করে নাটকের শেষে যখন ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে চাণক্য বিদায় গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তখনও ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন : 'ঐ বৌদ্ধ ধর্মের বন্যা আসছে। আমি দূর ভবিষ্যতে কি দেখছি জান? ····· এই পুনরায় বিখণ্ড সাম্রাজ্যের ওপর প্রেতের ভৈরব নৃত্য। তারপর এক মহাশক্তি এসে এই গলিত শবের উপর তার যাদুদণ্ড ছুলিয়ে সেই বিখণ্ড মাংসপিণ্ডগুলিকে এক করে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত করে ; তারপর ন্যায় শাসনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে চষে সমভূমি কর্বে।" [৫।২]।

সুতরাং ধর্মীয় দ্বন্দ্বটা ছিল এই পর্যায়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর নাটকে এই মূল ব্যাপক দ্বন্দ্বের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে তিনি তিনটি বর্ণের দ্বন্দ্বটারই এখানে প্রাধান্য দান করেছেন। অপর বর্ণ বৈশ্য এখানে অনুপস্থিত ; যদিও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বৈশ্যদের কথা আছে এবং বলা হয়েছে যে বৈশ্যরাও শূদ্রদের মতই কৃষিকাজ, গো-পালন এবং ব্যবসায় করতো।[৬৭] তখনও সমাজে পরবর্তী যুগের মত বৈশ্যদের স্বতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায় নি। তাই তিনটি বর্ণকেই দ্বিজেন্দ্রলাল উত্থাপিত করেছেন। এই নাটকে এই তিন বর্ণের প্রতিনিধিরা আপন আপন বর্ণের প্রতিষ্ঠার জন্য কিভাবে সংগ্রাম করেছেন নাট্যকার সেটাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন। চাণক্য বার বার ক্ষত্রিয়ের অহংকার এবং ঔদ্ধত্যকে, শূদ্রের আত্মসম্মানবোধ ও ক্ষমতা অধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে নির্মম ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি অভিশাপ দিয়ে, হত্যা করে এবং কূটকৌশলে ক্ষত্রিয় ও শূদ্রকে দমন করতে চেয়েছেন। আবার ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য শূদ্রকে ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী হিসেবেও গ্রহণ করেছেন [১।৪]। মূল ধর্মীয় দ্বন্দ্ব থেকে সরে গিয়েছেন বলেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ প্রজ্জ্বলিত করে শেষ বারের মত ব্রাহ্মণ্য শক্তিকে প্রতিষ্ঠার মহৎ কাজটি মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে ফিরে পাওয়া কন্যার হাত ধরে গার্হস্থ্য শান্তিতে ফিরে গেছেন। ইতিহাসের যে চাণক্য নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা দান করে ক্ষমতার উচ্চশিখরে আরোহণ করলেন, তিনিই সব ছেড়ে আবার নিরালা কুটিরে ফিরে গেলেন।

: অতুলকৃষ্ণ বসুর প্রচেষ্টা :

যে যুগটাকে নাটকের জোয়ারের যুগ বলা হয়েছে, সেযুগে ঐতিহাসিক নাটকের রচয়িতা হিসেবে ক্ষীরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির গুরুত্বই সমধিক। কিন্তু এই সময়ে অন্য যে সমস্ত নাট্যকার নাটক লিখছিলেন তাঁরাও ঐতিহাসিক এবং দেশাত্মবোধক নাটকের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে পারেন নি। এঁদের মধ্যে একজন—অতুলকৃষ্ণ বসু।

অতুলকৃষ্ণ বসুর ঝোঁক ছিল গীতিনাট্য ও পৌরাণিক নাটকের দিকে। গিরিশ ও অমৃতলালের প্রভাবিত সেই যুগে নাচ, গান হাস্যরস এবং পৌরাণিক কাহিনীর দিকেই দর্শকদের ঝোঁক ছিল। তাই মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত অতুলকৃষ্ণ সহজে জনচিত্ত অধিকার করতে চেয়েছিলেন।

তা সত্বেও তাঁর নাট্যরচনার ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। গিরিশচন্দ্রের অনুসরণে তিনি এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে নিয়ে একখানি নাটক রচনা করেন। এর নাম 'ধর্মবীর মহম্মদ।' মুসলমানদের ধর্মমতে আঘাত দেওয়া হয়েছে—এই অভিযোগে তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুল লতিফ খান বাহাদুর নাটকটির অভিনয় ও প্রচার বন্ধ ক'রে দেন। তাঁর আদেশে নাটকটি পুড়িয়ে ফেলা হয়। এই নাটকের প্রথম ভাগের কাহিনী মহম্মদের মেদিনায় পলায়ন পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়ভাগের কাহিনী হিজিরা থেকে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত।

অতুলকৃষ্ণের দেশাত্মবোধক নাটক 'নন্দকুমারের ফাঁসী'ও সম্ভবতঃ বাজেয়াপ্ত হয়। তাই নাটকটির উল্লেখ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।[৬৮] এ প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'আয়েষা' [১৯০৯]। নাটকটিতে গানের প্রাধান্য থাকায় এটিকে নাট্যকার 'গীতিনাট্য' বলেই আখ্যাত করেছেন। কিন্তু এর ঘটনা ও চরিত্রে ইতিহাসের ঘটনার কিছু ভূমিকা রয়েছে। মোগল সিংহাসনকে কেন্দ্র ক'রে আরঙ্গজেব ও সুজার সংঘর্ষই সেই ইতিহাসাংশ।

সিংহাসন লাভের পথ কণ্টকমুক্ত করার জন্য আরঙ্গজেব মোরাদকে কারারুদ্ধ করে, দারাকে পরাজিত করে পুত্র মহম্মদকে সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে বাংলায় পাঠান ; সেখানে মহম্মদ সুজার কন্যা আয়েষার প্রেমে পড়েন। সুজার সম্মতিতেই দু-জনের বিবাহ হয়। কিন্তু আরঙ্গজেব কৌশলে মহম্মদকে বন্দী করেন। মহম্মদ ও আয়েষাকে আগ্রার কারাগারে রাখা হয়। সেখানে মহম্মদের আগের স্ত্রী রিজিয়াকেও বন্দী করে রাখা হয়। এই সময়ে জানা যায়

আরাকান-রাজের ছলনায় সুজার মৃত্যু ঘটেছে। এই মৃত্যু সংবাদ শুনে তিন-জনেরই 'পতন ও মৃত্যু'। নাটকটি একেবারে মেলোড্রামাটিক ; ইতিহাসের সঙ্গে সামান্য সাদৃশ্য ছাড়া একে ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া এই গুরুগম্ভীর কাহিনীর মধ্যেও বিবাহবাতিকগ্রস্ত এক বৃদ্ধের তরুণীদের হাতে নাস্তানাবুদ হওয়ার এক দীর্ঘ কাহিনী এনে সস্তা রঙ্গরস পরিবেশনের চেষ্টা হয়েছে।

পাঞ্জাব, বাঙ্গালা, বিহার ইত্যাদি কতকগুলি ক্ষত বিক্ষত দেহ, অথচ অভিমানে স্ব-স্ব প্রধান, সেই পূর্বযুগের বিশাল একতাময় প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্নস্তম্ভের সমষ্টি।"·· "আমি প্রাণপণে ভারতে একতা-সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে চেষ্টা করে, অন্য মনে করে সে যেন মাতৃপিতৃদায়গ্রস্ত। তার ওপর সবারই কর্তৃত্বাভিমান।" ইত্যাদি [১।৩]।

অবার গোরা বলছে নসীবনকে : "মুসলমানী ! বেশ বেশ তা হলে আমি তোমার হিন্দুস্থানী ভাই, আর তুমি আমার মুসলমানী ভগিনী। সেই প্রথম মানব দম্পতি থেকে তোমারও উদ্ভব, আমারও উদ্ভব। শুধু নিজে নিজে আমাদের উপাধি ভেদ ক'রে চক্ষে নানাবর্ণের আবরণ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে আমরা যে যাকে পৃথক করে ফেলেছি।" [১।৪]।

১৩। 'প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩৩৭ সাল.

১৪। মালিক মহম্মদ জায়সী ১৫৪০-এ তাঁর 'পদ্মাবত' কাব্য রচনা করেন। পূর্ব-হিন্দী ভাষায় লিখিত এই কাব্য অবলম্বনে সৈয়দ আলাওল বাংলা ভাষায় তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন আরাকান রাজ যদো মিন্‌তারের [১৬৩৫-৫২] মহামন্ত্রী মাঠান ঠাকুরের অনুরোধে।

১৫। *Studies in Rajput History*, p. 2.

১৬। *An Advanced History of India* by Majumdar, Roy-Choudhuri and Dutta, New York [1965], p. 307।

১৭। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির মধ্যে ২০ খানা গীতিনাট্য, ২২ খানা পৌরাণিক, ৯ খানা পাঁচ মিশালী রং তামাসা, ৭ খানা জীবনচরিতমূলক নাটক, ৬ খানা রোমান্টিক নাটক, ১ খানা অনুবাদ নাটক, ৭ খানা সামাজিক নাটক এবং ঐতিহাসিক ও ছদ্ম ঐতিহাসিক নাটক ১০ খানা।

১৮।
১৯। } 'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য' কুমুদবন্ধু সেন।
২০।

২১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচনা করেন 'সিরাজদ্দৌলা' নামক গ্রন্থ।

২২। 'জন্মভূমি' [১২৯৯]-এ প্রকাশিত 'পলাশী' শীর্ষক প্রবন্ধে বিহারীলাল অন্ধকূপের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেন।

২৩। নিখিলনাথ রায় রচনা করেন 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'।

২৪। গিরিশচন্দ্র : হেমেন্দ্রপ্রসাদ দাশগুপ্ত।

২৫। 'সিরাজদৌল্লা' নাটকটি যে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নাটকটি একাদিক্রমে ২৫ রজনী অভিনীত হয়। প্রথম রাত্রির বিক্রয় ৮২১ টাঃ এবং ২৫ রাত্রির গড়পড়তা বিক্রয় প্রতি রাতে ৭০০ টাঃ [অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' কলিকাতা, ১৯১২, পৃঃ৯২]।

২৬। *Rise and Fulfilment of British Rule in India* : **Edward Thompson and G. T. Garvat, Allahabad [1962]।**

২৭। *An Advanced History of India* : **Majumdar, Ray Chaudhuri and Dutta, New York [1965] p. 659.**

২৮। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'সিরাজদ্দৌলা', কলিকাতা [১৯৫৮], পৃ : ৩৫৭-৫৮।

২৯। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে সিরাজের সংলাপ দ্রষ্টব্য।

৩০। 'সময় সংক্ষেপার্থ অভিনয়ের দ্বিতীয় রজনী হইতে নাটকের স্থানে স্থানে বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছি।"—গিরিশচন্দ্র ঘোষ [মীরকাসিম নাটকের ভূমিকা]।

৩১। অক্ষয়কুমার মীরকাশিম সম্পর্কিত রচনাগুলি 'ভারতী' ও সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৯০৫-এ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

৩২। ১৭৬০-এ মীরকাসিম নবাব হন এবং ১৭৬৫-এ বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এই সময়টার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

৩৩। "মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি
এক কণ্ঠে বলো জয়তু শিবাজী
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি
এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণ ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

৩৪। "স্বাধীনতা প্রিয় মনুষ্যমাত্রই একজাতীয়।…যে স্বাধীনচেতা তার হৃদয়ে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নাই। ভেদবুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষ হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ করে। [১।৬]।

৩৫। পৃথ্বীরাজ। ক্ষত কিরূপ ? পিতৃব্য !
সূর্যমল। বেদনা বিষম, তবু বহু উপশম
হইয়াছে, তোমারে দেখিয়া প্রাণাধিক,
এতদিন পরে। [৪।৪]

Prithwi Raj, "Well, uncle, how are your wounds ?"

Surajmal, "Quite healded, my child, since I have the pleasure of seeing you." [Rajasthan, Vol. I p. 175]

পৃথ্বীরাজ। দেখা হয় নাই
এখনো পিতার সঙ্গে। পিতৃব্য এক্ষণে
বিষম ক্ষুধার্ত আমি। খাদ্য কিছু আছে ? [৪।৪]

Prithwi Raj, "But uncle I have not yet seen the Dewanji. I first ran to see you, and I am very hungry ; have you anything to eat ? [Ibid, p. 275]

৩৬। 'আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ' : নাট্য-মন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭।

৩৭। নবকৃষ্ণ ঘোষ, 'দ্বিজেন্দ্রলাল' পৃ: ১৫০।

৩৮। দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লেখা একটি পত্র। দেবকুমার রায় চৌধুরীর লেখা 'দ্বিজেন্দ্রলাল' পুস্তকে সন্নিবেশিত।

৩৯। '*Annals and Antiquities of Rajasthan.*' vol.I, Chapter xi.

৪০। 'রাজস্থান'-এ পৃথ্বীরাজের স্ত্রীর চরিত্র আছে। 'যোশী' নামটি শুধু নাট্যকার ব্যবহার করেছেন। নতুবা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি 'রাজস্থান' অনুমোদিত।

৪১। 'দ্বিজেন্দ্রলাল' : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃ: ২৩৬-৩৮।

৪২। *Annals and Antiquities of Rajasthan.* vol. I, Chapter xiii

৪৩। 'রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাসের সংগে মিলিত হইয়া ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন।' : রাজসিংহ, ৮ম খণ্ড, ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

৪৪। '*An Advancad History of India*' by Majumdar, Ray Chaudhuri and Datta, New York [1965] p. 502.

৪৫। Tod, '*Annals and Antiquities of Rajasthan*', New Delhi, 1971 p. 309-10.

৪৬। নবকৃষ্ণ ঘোষ : 'দ্বিজেন্দ্রলাল' : কলিকাতা। পৃঃ ১৫৩-১৫৪।

৪৭।· Poetics XII 3, XIII 3.

৪৮। 'Aritostle's Theory of Poetry and Fine Art,' S.H, Butcher, U. S. A. [1951], p. 45.

৪৯। Tod, *Annals and Antiqnities of Rajasthan.* New Delhi, 1971 vol I, p. 398-99

৫০। 'রাজসিংহ', : ২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।

৫১। Jadunath Sarkar : '*A Short History of Aurangzeb*, p. 14.

৫২। Tod, *Annals and Antiqui ties af Rajasthan.*

৫৩। তখনই শাজাহান খুররম্ মোগল শাহজাদা। এর অনেক পরে তিনি মোগল সম্রাট হয়ে 'শাজাহান' নাম গ্রহণ করেন।

৫৪। অমর সিংহের মধ্যে নায়কোচিত গুণ ছিল একথা টডও বলেছেন : "He was worthy of Pertap and his race. He possessed all physical as well as mental qualities of a hero...he had a reserve bordering upon gloominess and doubtless occassioned by his reverses." : *Annals and Antiquities of Rajasthan*, p. 292.

৫৫। নাটকের শেষ গানটি : 'কিসের শোক করিস রে ভাই......আবার তোরা মানুষ হ।'

৫৬। Lady Macbeth : 'Here's the smell of the blood still; all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Oh, Oh, Oh ! [5/1].

আর নুরজাহান : "...একেবারে শৈলশিখরের কিনারায় দাঁড়িয়েছি। আবর্তের মাঝখানে পড়েছি। আর রক্ষা নাই। বিনাশের কল্লোল শুনতে পাচ্ছি। নিতান্তই কাছে এসেছি। নিয়তির অদৃশ্য তর্জনী অদূরে লক্ষ্য করে আমায় যেন ডেকে বলছে—ঐখানে তোমার সর্বনাশ, তবুও তোমায় ঐখানেই যেতে হবে। ধ্বংসের একটা ছিল কঠিন শাণিত হাসি দেখছি। সে হাসির অর্থ—এই যে! তোমার জন্য শেষ শয্যা পেতে বসে আছি।—এসো। [৫।৭]।

৫৭। খসরু হত্যা, তার দুই পুত্রের হত্যা, পরভেজের দুই পুত্রের মৃত্যু,

শরিয়ারের দুই পুত্র হত্যা এবং শরিয়ারকে অন্ধকরণ। এ সবের দায়ই নুরজাহানের কাঁধে চাপান হয়েছে।

৫৮। "Happier than the daughter of much enduring. oedipus she finally won her father's forgiveness for the son who had wronged him so cruelly." : Sir Jadunath Sarkar, '*A Short History of Auranzib*'.

৫৯। ..."The Characteristic of the Clowns is wit-boisterous in some, refined and intellctual in others and torched with the cynicism which kills pathos ; but for the most part no more than a clever, superficial quibbling with ideas and words. But the Fool's jesting has wit and something beside ; it trembles often on the verge of tears, like 'sunshine and rain at once." King Lear, Edited by A. W. Verity. London, 1959, p. xii।

৬০। Dr. R, C. Majumder, Ancient India' [1960] p. 98.

৬১। ঐ, পৃ: ১০০।

৬২। Plutarch বলেছেন "Androcottus [আন্দ্রোকোটাজ বা চন্দ্রগুপ্ত] himself who was then lad saw Alexander himself. The Invasion of India by Alexander the Great [by J. W. Mc. Crindle, p. 327] বইতেও একথা আছে। V. A. Smith বলেছেন [*Early History of India*, p 123]—"During the banisment he had the good for true to see Alexander.

৬৩। "...if tradition is to be belived, it was Taxilan Brahman a named Chanakya or Kautilya who raised to power the the great avenger to whose mighty arms "the earth long harassed by oulanders, now turned for protection aud refuge." : *An Advanced History of India*, by Majumdar, Roychaudhuri and Dutta, New York, 1965, p. 97.

৬৪। The adviser of the youthful and inexperienced Chandragupta in this revolution was Brahman Vishnugupta,

better known by his patronymic Chanakya or his surname Kautilya, by whose aid he succeded in seizing the vacant throne' : V. A. Smith : *Early History of India*. p. 123.

৬৫। "While still a lad he [i.e. Chandra Gupta] met Alexander in the Punjab, but having offended the King by his boldness of speech and order being given to kill him, he saved himself by a speedy fight. In the place of his refuse, he is said to have been joined by a personage who had left his home in Taxila. This was the famous Chanakya or Kautilya who went at first to Pataliputra but, being insulted by the reigning Nanda King, repaired to the Vindhya forest where he met Chandragupta." [*An Advanced History of India*, p. 98]

৬৬। ·· Chandragupta had acquired the throne when Seleukos was on the threshold of his career....Seleukos, the general of Alexander, who had made himself master of Babylon, gradually extended his empire from the Mediterranean Sea to the Indus and even tried to regain the provinces to the east of that river. He failed and had to conclude a treaty by which he surrendred a large territory······The treaty was cemented by a marriage contract." *An Advanced History of India*, p. 101-102.

৬৭। মেগাস্থিনিস যে সামাজিক অবস্থার বিবরণ দান করেছেন তাতে তৎকালীন ভারতবাসীদের সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে : ১ দার্শনিক [ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ] ২ কৃষক, ৩ পশু পালক ও শিকারী, ৪ শিল্পী ও ব্যবসায়ী, ৫ সৈনিক, ৬ পর্যবেক্ষক ও ৭ অমাত্য।

৬৮। ৬৮নং বিডন ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত তখনকার ষ্টার থিয়েটার গোপাললাল শীল ক্রয় করিয়া এমারেল্ড থিয়েটার স্থাপিত করেন। অতুলকৃষ্ণ সহকারী ম্যানেজার ও নাট্যকাররূপে এমারেল্ড থিয়েটারের পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া 'তুলসীলীলা' ও 'নন্দকুমারের ফাঁসী' নাটক প্রণয়ন করেন।" [শ্রীবিনয়ভূষণ মিত্র, বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত অতুল গ্রন্থাবলী, ৩য়, পরিশিষ্ট]।

৬০

ঐতিহাসিক নাটকের জোয়ার অব্যাহত

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব যুগকে ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ বলা হয়েছে। তবুও যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী যুগে এই নাট্য-ধারার জোয়ার একেবারে স্তিমিত হয়ে যায় নি এবং সে যুগের রাজনৈতিক পরিবেশও নাট্যজগতে ছায়াপাত না করে পারেনি।

বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠবার মুখে ১৯১১-এর ১২ ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গচ্ছেদ রদ ঘোষণা করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিপ্লবী প্রচেষ্টা বাংলার সীমা অতিক্রম করে গেছে এবং শুধু বঙ্গচ্ছেদ রদ নয়, বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রেও বোমা পিস্তলের রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। আপোষমুখী কংগ্রেসের মধ্যেও চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের দ্বন্দ্ব বেধেছে।

১৯১৪-এর আগষ্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লববাদীদের কর্মপ্রচেষ্টা নতুনভাবে সুরু হলো। ভারত সরকার ১৯১৫-এর ১৮ মার্চ ভারত রক্ষা আইন পাশ করলেন। এর আগেই প্রেস আইন পাশ করা হয়েছিল [১৯১০-এ]। এই আইনে সংবাদ পত্রকে দমন করার ব্যবস্থা হয়। ১৯১০ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে ৩৫০টি মুদ্রাযন্ত্র, ৩০০ সংবাদপত্র এবং ৫০০ বই বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯২১-এ এই আইন রদ হয়।

দমননীতি যত কঠোর হচ্ছিল তত বিপ্লববাদ তীব্র হয়ে উঠছিল; ফাঁসির মঞ্চে প্রাণদানের জন্যে বাঙালী যুবকেরা এগিয়ে আসছিলেন। বহু লোকের কারাবাস ও দ্বীপান্তর ঘটছিল। এদিকে রাজশক্তি স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন করে এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে উস্‌কে দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনকে স্তিমিত করার চেষ্টা করছিলেন।

চার বছর চলবার পর ১৯১৮-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধে ১৫ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য বৃটীশের পক্ষে যুদ্ধ করে; ১ লক্ষ ভারতীয় প্রাণ দেয় এবং ভারতের কোষাগার থেকে হাজার কোটির অধিক টাকা এই যুদ্ধের জন্য ব্যয়

হয়। এদিকে যুদ্ধে যোগদানের ফলে জনসাধারণের চরম দুর্গতি ঘটলো। যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে বৃটীশ সরকার ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের ধার কাছ দিয়েও গেলেন না। বরং শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে আরও কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করলেন। ভারতরক্ষা আইন উঠে গেলেও ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক সভা-সমিতির অধিকার হরণের জন্য রৌলট আইন জারী হলো। এর প্রতিক্রিয়া সারা ভারত উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯২১-এ আরম্ভ হলো আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহ।

এই পরিবেশের মধ্যেও নাট্যকারেরা তাঁদের জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন। তাঁদের নাটকে দেশপ্রেমের ভাঁটা পড়েনি। তবে লক্ষ্য করবার বিষয়, এই সময়ের ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেমের সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম মিলনের আবেদন বিশেষভাবে স্থানলাভ করেছিল। কারণ, ১৯০৬-এর নভেম্বরে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৩ থেকেই রাজনৈতিক ব্যাপারে লীগ অধিক মনোযোগী হয়। রাজনৈতিক মঞ্চেও নানাভাবে আপোসের চেষ্টা সত্ত্বেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বেড়ে চলে। এই জন্যেই ১৯১৪-২২—এই পর্বের নাটক সৃষ্ট হয় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আবেদন নিয়ে। এদিক থেকে প্রথমেই যাঁর নাটকের নাম করা যেতে পারে, তিনি নিশিকান্ত বসু রায়।

: নাটকে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি :

নিশিকান্ত বসু রায় চারখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন: 'বাপ্পারাও' 'দেবলা দেবী', 'ললিতাদিত্য' এবং 'বঙ্গে-বর্গী'।

ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণ মিশিয়ে নাটক রচনার যে ধারা ইতিপূর্বে সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে সরে আসতে পারেন নি। তা-ছাড়া জাতীয় ভাবোদ্দীপনা সমভাবেই তাঁর নাটকে সঞ্চারিত হয়েছিল। তিনি তাঁর 'বাপ্পারাও' [১৩২১ সাল] নাটকে প্রথম যুগের ঐতিহাসিক নাট্যকারদের মত 'মহাত্মা টডের রাজস্থানকেই প্রধান অবলম্বন' করেছেন এবং 'প্রবেদন' অংশে ঘোষণা করেছেন: "জাতীয় চরিত্র গঠনে নাট্যসাহিত্য বিশেষত ঐতিহাসিক নাটকের উপযোগিতা সর্বসম্মত। সেই মহদুদ্দেশ্য লইয়াই 'বাপ্পারাও'য়ের আবির্ভাব।"

॥ বাপ্পারাও ॥ ইতিহাস আর 'পুরাণ' এক নয়। অনেক ঐতিহাসিক [যেমন

টড্] তাঁদের গ্রন্থে জনশ্রুতির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই জনশ্রুতি সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই না হওয়া পর্যন্ত তা ইতিহাসের অঙ্গীভূত হতে পারে না ; আর অলৌকিক কাহিনী তো নয়ই। কিন্তু 'বাপ্পারাও' রচনা করতে গিয়ে নিশিকান্ত জনশ্রুতিকে ইতিহাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন, ফলে নাটকটি প্রথম থেকেই তার ঐতিহাসিক চরিত্র হারিয়েছে।

নাটকের প্রথমেই হারীত ও গোরক্ষনাথ এই দুই মহাপুরুষ, যাঁরা অলৌকিক দৈবশক্তি-মহিমায় মহিমান্বিত। বাপ্পার প্রথম জীবনে এই দৈব প্রসঙ্গ বিস্তৃত ক'রে দেখানো হয়েছে। গুরুর আশ্রমে থাকার সময় বাপ্পা যে গাভীর তত্ত্বাবধান করতো, একদিন তার অনুসরণ করতে গিয়ে সে বেতস বনের মধ্যে এক মায়াপুরীতে উপস্থিত হয়। সেখানে ঐ গাভীর ক্ষীরধারার স্বতঃপ্লাবনে ভগবান এক লিঙ্গ দেবের স্নান হচ্ছিল। ঐ সময় মহাপুরুষ হারীত বাপ্পাকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন ক'রে বললেন: 'বৎস, এতদিন আমি এ নশ্বর সংসার পরিত্যাগ করে অমরধামে গমন কর্তেম ; কিন্তু দেবাদিষ্ট হয়ে আমি তোমার অপেক্ষায় এতদিন অবস্থান কচ্চি।' [১।৩]।

এই একটি ঘটনা নয়। এই নাটকেই হারীতের স্বর্গীয় বিমানে গমন, হারীতের প্রতি নিক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবনের পদ্মে পরিণত হওয়া, আকাশ থেকে দৈববাণী [১।৫]; গোরক্ষনাথ কর্তৃক বাপ্পার হাতে মন্ত্রপূত তরবারি দান এবং নির্দেশ: 'দেবতার আদেশ, তুমি তোমার মাতুল চিতোর-পতি মানসিংহের নিকট গমন কর।' [১।৬]।

একটির পর একটি দৈব ঘটনা: বাপ্পার মন্ত্রপূত খড়্গের আঘাতে গান্ধার পর্বত দ্বিধা বিভক্ত [৩।৫]; ইয়াজিদের খড়্গ বাপ্পাকে পরাভূত করেও তার মন্ত্র-রক্ষিত দেহ ভেদ করতে অক্ষম [৩।৭] ইত্যাদি। শেষ দৃশ্যে বাপ্পারাও-এর মৃতদেহ রাশি রাশি শ্বেতপদ্মে রূপান্তরিত হওয়ার দৃশ্যও রীতিমত চমকপ্রদ। অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনার দ্বারা 'বাপ্পারাও' নাটকে চমক সৃষ্টির চেষ্টা আগাগোড়া পরিলক্ষিত হয়। এ সবই নাট্যকার রাজস্থান নাটকের থেকে আহরণ করেছেন। নাটকের 'প্রবেদন'-এ জাতীয় প্রেরণার কথা থাকলেও নাটকে তার নিতান্তই অভাব। বরং প্রেম ও প্রণয়ই তাঁর প্রধান উপজীব্য। এমন কি যে চারণদের গানের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার সুযোগ ছিল, সে সুযোগেরও সদ্ব্যবহার তিনি করেন নি। তারাও প্রেমসঙ্গীতই গেয়েছে।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদ তিনি নির্বিচারে ব্যবহার করেছেন। গিরিশচন্দ্র তবুও আদিবাসীদের চরিত্রানুযায়ী তাদের ভাষায় গান দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নিশিকান্ত ভীলকন্যার [লছমিয়া] মুখেও চণ্ডীদাসের পরিচিত সেই পদটি সংযোজিত করেছেন: 'সই কে বলে পীরিতি ভাল ......'।

অবশ্য দুই একটা দেশাত্মবোধক গান যে এ নাটকে নেই তা নয়। উদাহরণ স্বরূপ লছমিয়ার 'যুবক অথবা বালকবৃন্দ হও সবে আগুয়ান' গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে। [২।২]।

নিশিকান্ত যখন নাটক লিখেছেন তখন জাতীয়তাবোধের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। তাই বাপ্পারাও নাটকে ইয়াজিদ ও বাপ্পারাও-এর দ্বন্দ্বটা হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের রূপ না নিয়ে অন্য রূপ গ্রহণ করেছে। অবশ্য সেই সঙ্গে রাজপুত জাতির বীরত্ব ও মহত্ত্বকে নাট্যকার তুলে ধরতে ভুল করেন নি। বাপ্পারাও যুদ্ধ করেছেন তার আশ্রিতা গজনীর সুলতান সেলিমের কন্যা নোশেরাকে রক্ষার জন্যে। মানসিংহ বাপ্পারাওকে ইয়াজিদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন: 'সে ম্লেচ্ছ কন্যা, কেন তার জন্য বিপদকে আহ্বান করে আনবে। যদি একজন রাজপুতকে আশ্রয় দিয়ে এ বিপদকে ডেকে আনতে, আমি আপত্তি করতাম না।'

কিন্তু এর উত্তরে দৃপ্ত কণ্ঠে বাপ্পারাও বললেন: 'রাজপুতের শ্রেষ্ঠ সাধনা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আশ্রিত রক্ষণ।' [৩।১]।

নিশিকান্ত তাঁর এই নাটকে পূর্ব সূরীদের অনেক কিছু অনুসরণ করেছেন। চরিত্র সৃষ্টিতে এবং ভাষার দিক থেকে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসারী। দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকের আকবর কন্যা মেহের উন্নিসার মতোই সুলতান কন্যা নোশেরা পিতার প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্রূপে মুখর। [২।৩] দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সংলাপের ভাষা হুবহু শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বীরসিংহের মুখে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আবার সে যুগের ঐতিহাসিক নাটকে বন্দী-প্রেমের যে ছক গড়ে উঠেছিল সেলিমের কারাগারে বন্দী বাপ্পারাও ও নোশেরার প্রেমের কাহিনী চিত্রিত করে নাট্যকার তা বজায় রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। [৩।৭]।

॥ দেবলা দেবী ॥ নিশিকান্ত বসু রায় রচিত সে যুগের একখানি জনপ্রিয় নাটক

'দেবলা দেবী' [১৩২৫ সালে প্রকাশিত]। ইতিহাস থেকেই 'দেবলা দেবী'-র কাহিনী নেওয়া হয়েছে সত্যি, কিন্তু নাট্যকার কাহিনীকে তাঁর সুবিধা অনুযায়ী ঢেলে সাজিয়েছেন। এই সময়ের নাটকে দেশাত্মবোধের ভাঁটা পড়েছিল এবং নারী হরণ, খুন জখমের ঘটনায় দর্শকদের রোমাঞ্চিত করে তুলবার প্রয়াস দেখা যাচ্ছিল।

নিশিকান্ত যে আলাউদ্দিন খলজীর রাজত্বকাল থেকে কাহিনী আহরণ করেছেন সেটা রক্ত কলঙ্কিত সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তিনি সে রক্তের বন্যা বইয়েছেন তার সঙ্গে ইতিহাসের মিল সামান্য।

আলাউদ্দীন ১২৯৪-এ দেবগিরি রাজ্য জয় ক'রে বহু ধন রত্ন নিয়ে যান এবং দেবগিরি-রাজ রামচন্দ্রকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। রামচন্দ্র ইলিচপুর নামক স্থানটি এবং বাৎসরিক কর দানে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু তিন বছরের কর বাকি পড়ায় আলাউদ্দীন মালিক কাফুরের [যিনি মালিক নায়েব অর্থাৎ লেপটেন্যাণ্ট বলে আখ্যাত হতেন] নেতৃত্বে এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন দেবগিরির দিকে [১৩০৬-৭]। গুজরাটে পলায়ন পর রাজা রায় কর্ণদেব [২য়] এই সময়ে রামচন্দ্রের কাছে আশ্রয় লাভের জন্য আসছিলেন এবং রামচন্দ্রের পুত্র শঙ্করের সঙ্গে কর্ণদেবের কন্যা দেবলা দেবীর বিবাহ দিবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। এদিকে কর্ণদেবের মহিষী কমলাদেবী তখন দিল্লীতে আলা-উদ্দিনের হারেমে। দেবগিরি আক্রমণের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল দেবলা দেবীকে দিল্লীতে ধ'রে নিয়ে যাওয়া। দেবলাকে দেবগিরি আনবার পথে সে গুজরাটের গভর্ণর আলপ খাঁনের হাতে পড়ে যায়। আলপ খাঁ মালিক কাফুরের সঙ্গে যোগদানের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। সে দেবলাকে অপহরণ করে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেয়। আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খাঁর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। মালিক কাফুর দেবগিরি জয় করেন এবং রামচন্দ্র আবার বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি আলাউদ্দীনের কাছ থেকে রায়-ই-রায়ান উপাধি লাভ করেন।

ইতিহাসের এই কাহিনীকে নাট্যকার অন্যভাবে সাজিয়েছেন। পলায়নপর গুজরাটরাজ করুণ সিংহ [অর্থাৎ কর্ণদেব] তাঁর তথাকথিত অনুচর দেবী সিংহ এবং দেবলা দেবীকে নিয়ে প্রথম দৃশ্য সুরু হয়েছে। দেবগিরি অভিযানে কাফুরের সহযোগী ছিলেন খাজা হাজী, কিন্তু নাটকে কাফুরের সঙ্গে এসেছেন যুবরাজ খিজির খাঁ। দেবলা যখন পাঠান সৈনিকদের হাতের মুঠোয় এবং কাফুর

তাকে দিল্লী পাঠাতে চাইছে সেই সময় খিজির খাঁ তাতে বাধা দিলেন। বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ খিজির এখানে মহানুভব যুবরাজে পরিণত হয়েছেন; তিনি দেবলাকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাকে দেবগিরিরাজের আশ্রয় পর্যন্ত রক্ষকের মত সঙ্গদান করেছেন। এই নাটকে দেবলা দেবীকে বিবাহ দেওয়া হয়েছে দেবগিরির অধীশ্বর বলদেবজীর সঙ্গে। শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর ঘনঘটা: খিজির ঘাতকের হস্তে নিহত, আলাউদ্দীন কাফুরের ছুরিকাঘাতে নিহত এবং কমলাদেবীর আত্মহত্যা। এতে নাটক জমেছে, কিন্তু ইতিহাস অনেক পেছনে পড়ে গেছে।

এই নাটকের নায়ক প্রকৃতপক্ষে খিজির খাঁ। কিন্তু এই চরিত্রটি সে যুগের হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর পটভূমিকায় দেখাতে গিয়ে চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ অবাস্তব করে তোলা হয়েছে। বন্দী কাফুর অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তিলাভ করে খিজির খাঁর উদ্দেশ্যে বলছে: 'হে মহান্-উদার-পুরুষোত্তম' বা 'হে বিরাট পুরুষ আজ নতমস্তকে তোমার দেবদুর্লভ মহত্ত্বের নিকট মুক্তকণ্ঠে পরাজয় স্বীকার করছি।' [৫।৬]।

ইতিহাসে খিজিরের প্রতি কাফুরের বিরূপতা সুবিদিত। কাফুরের চক্রান্তে আলাউদ্দিন তাঁর বেগম এবং খিজির খাঁকে বন্দী করেন, আল্‌প খাঁকে হত্যা করেন। এই কাফুরের পরামর্শেই আলাউদ্দিন খিজির খাঁকে বঞ্চিত করে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র সিহাবুদ্দিন উমরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কাফুর ঐ ছয় বৎসরের বালকের অভিভাবক হয়ে রাজ্য চালান এবং খিজির ও তার পরবর্তী ভাই শাদী খানকে অন্ধ করে দেন। কিন্তু নাটকে কাফুরই নতজানু হয়ে খিজিরের কৃপাপ্রার্থী। খিজিরের অনুচর রূপে আলি খাঁ এবং মতিয়ার প্রেম ও বিষপানে আত্মত্যাগ প্রভৃতি উপাখ্যান এনে নাটকে কৌতূহল সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। অন্যদিকে দেবগিরির সিংহাসন বলরাজকে ফিরিয়ে দেওয়া তাকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন করা, বলরাজ ও দেবলার বিবাহে যৌতুক হিসাবে মুক্তাহার দান, খিজিরকে দেবলার ভ্রাতৃসম্বোধন—এই সব ঘটনাগুলি নাটকীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু ইতিহাসকে ভুলে না গেলে এই সব দৃশ্যের তারিফ করা কঠিন হয়ে পড়ে। পাঠান-মারাঠার এই সম্মিলন সমসাময়িক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আবহাওয়াকে জোরদার করার জন্যই সম্ভবত পরিকল্পিত। অথচ কমলা দেবীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত

যেভাবে প্রবাহিত তাতে ঐ সম্মিলনের সুর বার বার আহত করে এক প্রতিকূল আবেদন সৃষ্টি করেছে।

কমলা দেবী গণপৎকে বলছেন: 'এ চোখে নিদ্রা নেই…… মাঝে মাঝে যখন তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি একটা যবনিকা সরে গিয়ে আমার চোখের সামনে তাদের [অর্থাৎ মৃত পুত্রদের—লেঃ] মৃত্যু-দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে—তারা আলাউদ্দিনের হৃদয় শোণিত চায়।' [১।২]

এবং আলাউদ্দিনকে লক্ষ্য করে কমলা দেবীর উক্তি: 'পদ্মিনী আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সমস্ত যন্ত্রণা অবসান করেছিলেন, আর আমি যে-হাতে সেই আহত পুত্রদের শোণিত প্রবাহ রুদ্ধ করেছিলাম—সেই হাতে তোমার জন্য জীবন রক্ষা করেছি। কি জন্য? প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য।'

॥ **ললিতাদিত্য** ॥ নিশিকান্ত বসুর শেষ ঐতিহাসিক নাটক ললিতাদিত্য-এ [১৩৩০ সাল] সুদূর অতীতের ইতিহাসকে [৭ম শতাব্দী] অবলম্বন করা হয়েছে। কলহণের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থই তাঁর প্রধান অবলম্বন। এই গ্রন্থকে অবলম্বন করে তিনি কাশ্মীরের পরাক্রান্ত রাজা ললিতাদিত্যের শৌর্য বীর্য এবং প্রেমের কাহিনী অঙ্কিত করেছেন। নাট্যকারের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসের ঘটনাকে মাঝে মাঝে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এবং ইতিহাসে যার সামান্য ইঙ্গিত আছে তাকে বিস্তৃত করে রোমান্টিক প্রেম কাহিনী তিনি অঙ্কন করেছেন। একদিকে ললিতাদিত্য এবং কর্ণাটেশ্বরী বা রট্টার প্রেম, অন্যদিকে গৌড়রাজ ভূপালসেনের বীর ও উদার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়ন্ত এবং ললিতাদিত্যের পালিতা কন্যা চম্পার প্রেম কাহিনী। এই দুইটি ব্যক্তিপ্রেমকে ছাপিয়ে উঠেছে দেশপ্রেম, যেটা সে যুগের ঐতিহাসিক নাটকের অন্যতম অবলম্বন। ললিতাদিত্য ও রট্টার মধ্যে প্রবল ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও নিজ দেশ কর্ণাটের পরাধীনতার আশঙ্কায় রট্টা ললিতাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। অন্যদিকে কাশ্মীরের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ করার মুহূর্তে চম্পা তার দেশবাসীকে তার প্রিয়তম জয়ন্ত-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের আহ্বান জানিয়েছে। জয়ন্তও বাধ্য হয়ে তার প্রিয়তমা চম্পাকে বন্দী করতে বাধ্য হয়েছে। ললিতা ও রট্টার সম্পর্কের যে পরিণতি ঘটেছে জয়ন্ত ও চম্পার ক্ষেত্রে তা ঘটেনি —এক্ষেত্রে পরিণতি মিলনাত্মক।

এই যুগল রোমান্টিক প্রেম-কাহিনীর সঙ্গে ললিতাদিত্য কর্তৃক গৌড়রাজকে

হত্যা এবং কয়েকজন অসম সাহসী গৌড়বীর এই হত্যার প্রতিশোধে সংকল্প গ্রহণ করে তাদের প্রাণের বিনিময়ে ললিতাদিত্যের বিজয়স্তম্ভ চূর্ণ করার যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার সঙ্গে কল্হণের রাজতরঙ্গিণীর বিবরণের সম্পূর্ণ মিল আছে! এই প্রসঙ্গকে উপলক্ষ্য করে নাট্যকার দেশাত্মবোধকে উদ্দীপিত করারও প্রয়াস পেয়েছেন। ঠিক দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের চরিত্রের ভাষায় ললিতাদিত্যকে জয়ন্ত বলেছে: 'গৌড় আমার জন্মভূমি—আমার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি···আমার চিত্তহৃপ্তির জন্য যে লতিতাকে শ্যামসৌন্দর্যে ভূষিত করেছে, কুসুমের সঙ্গে সুবাস মাখিয়েছে—আকাশের গায়ে ইন্দ্রধনু রচনা করেছে—বিহগের কণ্ঠে কাকলি দিয়েছে······ গৌড় যে আমার সেই জন্মভূমি।' [২।১]।

নাটকে দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলা ও কাশ্মীরের বিস্তৃত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় গ্রহণ করেও তার মধ্যে ঐতিহাসিক আবহাওয়া যতটা সৃষ্টি করতে না পেরেছেন তার চেয়ে বেশী সৃষ্টি করেছেন রোমান্টিকতা।

॥ **আলমগীর** ॥ নিশিকান্ত বসু রায়ের নাটকগুলি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আবেদন নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু তিনি এর জন্যে যে বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছিলেন তা নিয়ে তেমন মতদ্বৈধের অবকাশ ছিল না। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ এ দিক থেকে অনেক দূর অগ্রসর হলেন। ভারতের ইতিহাসে যে ঔরঙ্গজেব তীব্র হিন্দু বিদ্বেষী বলে কথিত, ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর 'আলমগীর' [১৯২১] নাটকে তাঁর মুখেই হিন্দু-মুসলমান মিলনের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন।

ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে এর আগে দু'খানি বই লেখা হয়: একখানি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'রাজসিংহ' [১৮৯১] এবং দ্বিতীয়খানি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক 'দুর্গাদাস' [১৯০৬] দু'টি বই-ই রাজসিংহের কাছে ঔরঙ্গজেবের পরাজয়কে ভিত্তি করে রচিত। এই পরাজয় কাহিনী ইতিহাস সম্মত।[১]

কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটক রচনা করতে গিয়ে মোগল-রাজপুত যুদ্ধের দিকটাকে প্রাধান্য দেন নি; তিনি এই পটভূমিকার উপরে ঔরঙ্গজেব চরিত্রকে নতুনভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল রাজপুতের

বাহুবলটাই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন ব'লে তাঁদের. গ্রন্থের নামকরণ করেছেন রাজপুত বীরদের নাম দিয়ে। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তি চরিত্রকেই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন এবং নামকরণ করেছেন 'আলমগীর'। শব্দটি রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এই তাৎপর্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সামান্য সংলাপের মধ্য দিয়ে। দিল্লীর প্রসাদে ঔরঙ্গজেব নিজ হাতে ভীমসিংহের হস্তে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তখন অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন তখন :

ভীম। যদি দুর্ভাগ্যবশে এই অস্ত্র আপনার বিরুদ্ধে উত্তোলন করি ?
আও। ক্ষুদ্র বালক। আমি আলমগীর২ [ভীমসিংহের অস্ত্রগ্রহণ] [৭।২]

রণনিপুণ, চতুর এবং সর্বাপেক্ষা কর্মপটু ঔরঙ্গজেব সিংহাসন লাভের জন্য পিতা শাহজাহানকে বন্দী করেন, ভাইদের মধ্যে মোরাদকে বন্দী করে হত্যা করেন, যুদ্ধে পরাজিত দারাকেও হত্যা করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত সুজা আরাকানে পলায়ন করেও রেহাই পান নি, ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা তাঁকে সপরিবারে নিহত করেন। এইভাবে পিতাকে বন্দী করে এবং ভাইদের হত্যা করে ঔরঙ্গজেব সিংহাসন নিষ্কণ্টক করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত গোঁড়ামির ফলে পরধর্ম বিদ্বেষ তাঁর চরিত্রে বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। হিন্দুদের নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত করেন। আকবর জিজিয়া কর রহিত করেছিলেন, ঔরঙ্গজেব তা পুনঃপ্রবর্তন করেন। যে রাজপুতরা ছিল মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ তাঁর অনুদার ও আক্রমণাত্মক নীতির ফলে তারাই তাঁর পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

ঔরঙ্গজেবের এইসব কার্যকলাপের ফলে ইতিহাসে ঔরঙ্গজেব যে ভাবে চিত্রিত হয়েছেন তা এদেশে সুপরিচিত। তিনি যে সমস্ত অপরাধ করেছিলেন বা যে সব ভ্রান্তনীতির দ্বারা বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর অবচেতন মনে অপরাধবোধ থাকা অসম্ভব নয়। মানুষ মাত্রেরই মনে একটা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল সাজাহান নাটকে ঔরঙ্গজেব চরিত্রের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ এ ব্যাপারে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন এবং ঔরঙ্গজেবের কার্যক্রমের একটা কৈফিয়ৎ বা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন সম্পূর্ণ নিজের মত করে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ দুইভাবে ঔরঙ্গজেবের অন্তর্জীবনকে ব্যক্ত করেছেনঃ উদীপুরীর বর্ণনা এবং ঔরঙ্গজেবের নিভৃত আত্মগত উক্তির মধ্য দিয়ে। আলমগীর যতক্ষণ জাগ্রত ততক্ষণ তিনি শক্তিমান ও অপরাজেয় ; কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার দুষ্কৃতির স্মৃতি তাঁকে আক্রমণ করে। সম্রাট তখন শিশুর মত আচরণ করেন। উদিপুরী এই সম্রাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে ঔরঙ্গজেবের মধ্যে 'দুটো মানুষ' আছে, একটা নকল আর একটা আসল। এই 'নকলটা যখন ঘুমোয়, তখন আসলটা জেগে ওঠে। আবার নকলটা যখন জাগে, তখন আসলটা গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়।' উদিপুরীর সংলাপের মাধ্যমে ঔরঙ্গজেবের যে এই চারিত্রিক ব্যাখ্যা, এর সাহায্যে নাট্যকার ঔরঙ্গজেবের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। ট্র্যাজেডী রচনার জন্য এইরূপ সহানুভূতি সৃষ্টির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। কারণ নির্ভেজাল দুর্বৃত্ত কখনও ট্র্যাজেডীর নায়ক হতে পারে না। কিন্তু উদিপুরীর এই ব্যাখ্যা ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ কিনা তা চিন্তার অবকাশ দর্শকদের থাকে না, কারণ সেটা চরিত্র বিকাশের ধারায় সংলাপের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। একদিক থেকে আমরা উদীপুরীর সংলাপের মধ্য দিয়ে যেমন ঔরঙ্গজেব চরিত্রের এই বিকাশ দেখি, অন্যদিক থেকে ঔরঙ্গজেবের স্বগত উক্তিগুলির মধ্য দিয়েও তাঁর পরিচয় মেলে। অবশ্য এখানে স্পষ্টই বলে রাখা উচিত যে ঔরঙ্গজেবের এই যে চারিত্রিক বিকাশ বা চারিত্রিক পরিচয়, এর সবটাই নাট্যকারের নিজের ভাব-কল্পনার অভিব্যক্তি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, ইতিহাসে ঔরঙ্গজেবকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, আসলে তিনি সেরূপ নন, সেটা তাঁর নকল পরিচয়। এই 'আসল' পরিচয় প্রদানের প্রচেষ্টা উদীপুরীর সংলাপের মাধ্যমে যতটা সার্থক হয়েছে, ঔরঙ্গজেবের স্বগতোক্তির মাধ্যমে তা হয় নি।

ঔরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তনের একটা কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। রাজসিংহ এই কর প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিলে ঔরঙ্গজেব বলেছেনঃ —'রাজার মূর্তিতে যদি তোমার বাইরে আসতে সাহস থাকে, বেরিয়ে এস। না থাকে, যোগী-সন্ন্যাসীর ভণ্ডামীর আবরণ পর। তোমাদের যে কোন দেবায়তনে প্রবেশ কর। নরকের ভয় তুচ্ছ ক'রে যদি উন্মুক্ত চক্ষে সত্য দেখাতে তোমার সাহস থাকে, মন্দির মধ্যে ওই পুতুলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যদি দৃষ্টিশক্তিহীন না হও, তখন বুঝবে, যোগী, দণ্ডী, ব্রাহ্মণ, বৈরাগীর

মাথার উপর কেন আমি জিজিয়া কর স্থাপন করেছি। মূর্তির সম্মুখে, তীর্থ যাত্রীর উপরে নরকের ভয় দেখিয়ে কর সংগ্রহের অত্যাচার, আর সেই জড়-মূর্তির পশ্চাতে, নরকের অন্ধকার ভরা অন্তরালে কুক্ষিগত বীভৎসতা, যদি তুমি দেখতে পারতে রাজসিংহ—সেই সময় ব্রাহ্মণ বৈরাগীর লীলাকাহিনী কি কুৎসিৎ অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, যদি তুমি পড়তে পারতে রাজসিংহ, তা'হলে এ চিঠি লেখার ধৃষ্টতা না দেখিয়ে, এই তীর্থমন্দিরগুলোকে অগ্নিসাত করতে তুমি আমার সাহায্যে ছুটে আসতে—দেখতে।' [৫।১]।

ঔরঙ্গজেবের জিজিয়া কর প্রবর্তনের কারণ ঔরঙ্গজেবের ধর্মসংস্কারের ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত—একথা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। জিজিয়াকর প্রকৃতপক্ষে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলমানদের কাছ থেকে গৃহীত এক শ্রেণীর কর। বিজয়ী বা দখলদার পৃথক পৃথক নামে এই ধরণের কর বসিয়ে থাকেন এবং স্বভাবতই বিজিত দেশের অধিবাসীরা এই ধরণের করকে মোটেই ভাল চোখে দেখেন না। কিন্তু তাই বলে সেই কর স্থাপনের পিছনে ধর্মীয় সংস্কারের জন্যে চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্য—একথা রীতিমত কষ্ট কল্পনা। আসলে এটা বাঙালী হিন্দুর তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াজনিত অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুধু তাই নয় নাট্যকার এ প্রসঙ্গে আরও অগ্রসর হয়েছেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের স্বগতোক্তিতে প্রকাশ করেছেন: 'পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ঈর্ষায় বুদ্ধিহীন রাজপুত, তোমরা এতকাল মিলতে পারনি। তোমাদের কথায় বুঝলুম, এই জিজিয়া কর অবলম্বনে এইবার তোমাদের ভিতরে মিলবার প্রবৃত্তি জেগেছে। আমিও সেটা জাগাতে চাই। দিল্লীর ময়ূরাসন ঘিরে কতকগুলো অস্থির চিত্ত সামন্তকে আমি আর বসতে দিতে চাই না। সমস্ত রাজপুত রাজাগুলোকে যদি সাধারণ প্রজার পর্যায়ে ফেলতে পারি, তবেই আমার আলমগীর উপাধি সার্থক।' [১।২]

কোনও রাজপুত চরিত্রের মুখ দিয়ে যদি বলানো হতো যে: 'পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ঈর্ষায় বুদ্ধিহীন রাজপুত এবার একত্র মিলতে পারবে, জিজিয়া কর প্রবর্তনের ফলেই এই মিলন সম্ভব হবে' তা হ'লে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতো না। কিন্তু রাজপুতদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির জন্যই ঔরঙ্গজেব এই করের প্রবর্তন করেন এটা নিতান্তই হাস্যকর যুক্তি। অবশ্য নাট্যকার নিজেই শেষ পর্যন্ত এই সব ব্যাখ্যা টেনে নিয়ে যেতে পারেন নি। তাই ঔরঙ্গজেবকে শেষ

পর্যন্ত বলতে শুনি : 'এই জিজিয়া কর। এটা আমার একটা বিচিত্র রকমের খেয়াল, এ খেয়াল যে কেন এলো তা এখনও আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।......এ খেয়াল কেন হ'ল। হিন্দুরা আমাকে গাল দেবে আমি শুনে হাসব। মুসলমান আমার জয় ঘোষণা করবে আমি শুনে কাঁদবো।' [২ ২]

এই ধরণের উক্তির পিছনেও ইতিহাসের সমর্থন পাওয়া কঠিন। কারণ ঔরঙ্গজেব খেয়ালী বুদ্ধিহীন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, একথা বলা চলে না।

আসলে নাট্যকার তাঁর সমসাময়িক ভাবাবেগের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্য-কাহিনীকে স্থাপন করতে চেয়েছেন এবং এর একটা রাজনৈতিক প্রয়োজন যে ছিল তা প্রথমেই বলা হয়েছে।

আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণ যে জাতীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছিল এবং দেশাত্মবোধের প্রেরণা জুগিয়েছিল তার ফলে যে কাব্য, উপন্যাস এবং নাটকাদি লেখা হতে থাকে তার প্রথম দিকে, সেগুলি হয়ে ওঠে জাতীয় অতীত গৌরব কাহিনী কীর্তনের নামান্তর। কিন্তু রাজনৈতিক কারণেই এই ধারার পরিবর্তন ঘটে গেল। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদীর কৌশলে এদেশে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি এমনভাবে শিকড় মেলেছিল যে, তাকে উৎপাটন ছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনই ব্যর্থ হতে চলেছিল। তাই এই সময় নাটকে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি প্রচারের চেষ্টা হয়, একথা আগেই বলা হয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ এদিক থেকে অনেক দূর অগ্রসর হন। তিনি ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রতির কামনা পর্যন্ত আরোপ করেন। তাঁর আগে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, ঔরঙ্গজেবের পরাজয় ঘটেছে রাজপুত তথা হিন্দু বাহুবলের কাছে, অন্য দিকে 'আলমগীর' নাটকে ঔরঙ্গজেবের পরাজয় রাজপুত মহত্বের কাছে। তাঁর সাম্প্রদায়িক সত্তা রাজপুতের সংস্পর্শে শুধু বিলীন হয়ে যায়নি তাঁর মধ্যে সৌভ্রাত্রকামী এক নতুন জীবনের উদ্বোধন ঘটিয়েছে। তাই দেখা যায় আরাবল্লীর গুহাভ্যন্তরে আহত ভীমসিংহের কাছ থেকে শেষ পানীয়টুকু গ্রহণ করে ঔরঙ্গজেব রাজসিংহকে বলছেন : 'মহান্ রাণা রাজসিংহ। শুনুন, ঈশ্বর এক আলমগীর আর এক রাজসিংহকে এক সময়ে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। কি ভারতের দুর্ভাগ্য, যৌবনে তারা দু'জনে এক সময়ে এ গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে না। যখন উভয়ে প্রবেশ করলে তখন রাজসিংহ ক্ষত বিক্ষত দেহ, আর আলমগীর দেহে, মনে, বাক্যে জরার পীড়নে জর্জরিত। তবু

এ মিলনের অভিলাষ—হে কবি, বছর যাক, যুগ যাক্ বহু শতাব্দী চলে যাক, শতাব্দীর পারে, এক দিন তোমার তুলিকা-মুখে আলমগীরের এ মিলন-অভিলাষ মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষে এই [ভীমসিংহকে দেখাইয়া] চিরজাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর সম্মুখে, এই রহস্যময় গুহামধ্যে পরস্পরকে—হিন্দু-মুসলমানকে একবার আলিঙ্গন করি।' [৫।১১]

এইভাবে ইতিহাসের ঘটনাকে যুগের প্রয়োজনে, যুগের ভাবাদর্শে চিত্রিত করা ছাড়াও এই নাটকে রোমান্টিকতার অনুপ্রবেশ নাট্যকার যদৃচ্ছা ঘটিয়েছেন এবং এমন সব চমক সৃষ্টি করেছেন, যার সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনার তো মিলই নেই, উপরন্তু সেগুলিকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করাও কঠিন। নাটকে কিছু বাহুল্য বিষয়ও আছে। রূপকুমারীর কাহিনীতে রোমান্টিকতা, রাজসিংহের পারিবারিক দ্বন্দ্ব এই নাটকে বাহুল্য বিষয়। মোগল হারেমে রাজপুত রাজন্যবর্গের ইচ্ছামত প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ, কামবক্সের দেহে মাতৃশক্তির অলৌকিক বর্ম আরোপ প্রভৃতি অতিনাটকীয় ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের সামান্য উল্লেখ্য উদীপুরী এই নাটকে বিরাট স্থান অধিকার করেছে এবং অস্বাভাবিক প্রাধান্য অর্জন করেছে।

কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও নাটক হিসাবে বিচার করলে বলতে হবে যে, ক্ষীরোদপ্রসাদ একটি সার্থক ট্র্যাজেডী রচনা করেছেন—এ ট্র্যাজেডী আলমগীরের ট্র্যাজেডী। বুদ্ধি, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী ঔরঙ্গজেবের ট্র্যাজিক পরিণতি আমরা এ নাটকে দেখতে পাই- বার বার আত্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হয়ে গেলেন, যে রাজপুত জাতির বিরুদ্ধে তিনি সর্বাত্মক সংগ্রাম করলেন তাদের মহত্ত্বের কাছেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে মাথা নত করতে হলো। এই পরাজয় এসেছে তাঁর অস্থির চিত্ততা থেকে, এই পরাজয়ের পথে তাঁকে ঠেলে দিয়েছেন স্ত্রী উদীপুরী।

ট্র্যাজেডির নায়কের মতই ঔরঙ্গজেব চরিত্রে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব। "একদিকে চরিত্র-বিশ্লেষণে তিনি [নাট্যকার] নরনারীর মনের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া অতুল রহস্যের সন্ধান দিয়াছেন, অন্যদিকে চিরদিনের রোমান্স-প্রীতির পক্ষীরাজে আরোহণ করিয়া অবিশ্বাস্য প্রায় আকস্মিকতা ও আবেগ উদ্দামতার কল্প-লোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ধরণীর মৃত্তিকার স্পর্শ ও গন্ধ উভয়ই সেখানে দুষ্প্রাপ্য।" [বৈদ্যনাথ শীল, 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা', কলিকাতা,

(১৩৭৭ সাল), পৃঃ ৪৪৬]। এর কারণ শুধু ক্ষীরোদপ্রসাদ নয়, এ যুগের নাট্যকারদের প্রায় সবাই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। তাই নাটকের মূল ভিত্তি হয়েছে ভাবকল্পনা। উত্তেজনার খোরাক যোগাতে গিয়ে তাঁরা নাট্যধর্ম বিস্মৃত হয়েছেন।

দৃশ্যপট : প্রাচীন মিশর :

এতদিন পর্যন্ত রাজপুত ইতিহাস, মোগল বাদশাহের কাহিনী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলী ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান উপজীব্য ছিল। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সর্বপ্রথম এই অতি পরিচিত দৃশ্যপটের বাইরে তাঁর ঐতিহাসিক নাটককে স্থাপন করলেন। তিনি 'মিশরকুমারী' [১৯১৯] নামে যে নাটক রচনা করলেন তার বিষয়বস্তু প্রাচীন মিশর। নাট্যকার নিজেই বলেছেন যে তাঁর এই নাটক : 'প্রাচীন মিশরীয় সমাজ ও রীতিনীতির একখানি নতুন চিত্র।' '[নিবেদন]। ঐ নিবেদন-এ নাট্যকার আরও বলেছেন : 'প্রাচীন মিশর এক সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতায় জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ইতিহাস আমাদের দেশে সুপরিচিত নহে। সেই ইতিহাসের ভিত্তির উপর নাটক রচনা অনেকে হয়তো দুঃসাহসিক বলিয়া মনে করিতেন।'

এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কারণ নাট্যকারের ধারণা হইয়াছিল যে, নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের রুচি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই জন্যে তিনি ভারত ইতিহাসের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি না করে দৃশ্যপট সুদূর মিশর দেশে স্থাপন করলেন।

নাটককে ইতিহাসের ভিত্তির ওপরে দাঁড় করাতে গিয়েও নাট্যকার কল্পিত চরিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। নাটকে মিশরের ফারাও হিসেবে হারেম-হেবের এবং তার পুত্র যুবরাজ রামেশিস-এর উল্লেখ আছে। মিশরীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে কৃষ্ণবর্ণের ইথিওপিয়ান খারেব-এর বিদ্রোহ রয়েছে। প্রকৃত-পক্ষে নাটকটির মূল বিষয়বস্তু হলো বর্ণ বিদ্বেষ [শ্বেতচর্ম মিশরীয় এবং কৃষ্ণচর্ম কাফ্রীদের পারস্পরিক বিদ্বেষ]। নাটকে হারেম-হেবের সমসাময়িক আমন-দেবের প্রধান পুরোহিত রূপে সামন্দেশকে দেখানো হয়েছে। চরিত্রটি কাল্পনিক। তবে প্রধান পুরোহিতের ক্ষমতা অধিকার অনৈতিহাসিক নয়।

কিন্তু নাট্যকার মিশরীয় ইতিহাসের মূল ধারা বজায় না রেখে বরং তিনি তাঁর সমসাময়িক ভারতীয় প্রতিবেশই সৃষ্টি করে ফেলেছেন। অত্যাচারিত কাফ্রীদের শ্বেতাঙ্গ মিশরীয়দের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর অহিংস প্রতিরোধের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ তার সাদা চামড়ার অহংকার নিয়ে এ দেশের 'কালো আদমী'কে শুধু ঘৃণাই করেনি,তাদের ওপর নানা রকম অত্যাচার চালিয়েছে। এ ধরণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও আন্দোলন করতে হয়েছিল। ভারতে শ্বেতাঙ্গ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিব্যক্তি লাভ করলো বরদা প্রসন্নের 'মিশর কুমারী' নাটকে শ্বেতাঙ্গ মিশরীদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ কাফ্রীদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। কাফ্রী নেতা আবন প্রশ্ন তুললেন : 'কেন, কাফ্রীরা কি মানুষ নয়? তাদের কি সুখ দুঃখ নেই? একই আকাশের নীচে, একই সূর্যের উত্তাপে, একই ফলে জলে শস্যে কাফ্রী আর মিশরী কি জীবন ধারণ করে না? তবে কিসের জন্য তোমাতে আমাতে তফাৎ? তোমার রক্ত রক্ত, আমার রক্ত পচা নর্দমার জল? তোমার মাথা মাথা, আমার মাথা তোমার লাথি মারার জায়গা?' [১৫]

এইভাবে কাফ্রী নেতা আবন-এর মুখ দিয়ে মিশরীয়দের উদ্দেশ্যে যা বলানো হয়েছে তা বৃটীশ শ্বেতাঙ্গদের উদ্দেশ্যে ভারতবাসীরও কথা : 'তোমরা এই যে কাফ্রী জাতিটার উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত অত্যাচার কচ্ছ, তার হিসাব রাখ : তোমাদের অপরাধের কাহিনী শুনলে গাছের পাতা ঝরে পড়ে, পাহাড়ের পাথর নড়ে ওঠে, মরা মানুষ শতবর্ষের ঘুম থেকে এক মুহূর্তে শিউরে জেগে ওঠে। তোমাদের এই সব জুলুমের বিরুদ্ধে যদি আমরা একটি মুখের কথা কই, কি আঙ্গুল তুলি, তবেই আমাদের গুরুতর অপরাধ হয়।' [১৫]

মিসরীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কাফ্রীদের অহিংস প্রতিরোধই শুধু নয়, নাট্যকার সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের দু'টি ধারাই যুগপত উপস্থিত করেছেন। আবন যেমন একদিকের প্রতিনিধি, অন্যদিকের প্রতিনিধি তেমনি তাঁরই প্রতিবেশী পুত্র খারেব। সে তরুণ এবং সে উগ্র। তাই সে অবনের মত কথা বলে না : 'এ মিশরী। মিশরীরা যদি মানুষ হয় তবে দুনিয়ার পশু কে? তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এই নিরপরাধ কাফ্রীদের

উপর রাক্ষসের মত জুলুম করে আসছে। তাদের চোখে আমরা মানুষ নই, তারা আমাদের চোখে মানুষ হবে কে?' [১।১]

এ হচ্ছে সমসাময়িক ভারত ইতিহাসের তরুণ উগ্রপন্থীদের কথা, যারা সহিংস উপায়ে ইংরেজ মোকাবিলার জন্য অস্ত্রধারণ করেছিল।

নাট্যকার অবশ্য এই পথ সমর্থন করেন নি। তিনি দেখিয়েছেন যে ঐ সহিংস উপায়ে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় খারেব নাহরিণের [একটি কল্পিত চরিত্র : কাফ্রী ও মিশরীয় মিত্র] প্রভাবে ক্রমশঃ হিংসার পথ ছেড়ে অহিংসার পথ গ্রহণ করেছে। সে নাটকের উপসংহারে মিশরের সম্রাট হারেম-হেবকে বলেছে : 'সম্রাট, আমি আপনার কাফ্রী প্রজা। একদিন আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্তে বদ্ধ পরিকর হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম তাই বুঝি মনুষ্যত্ব। কিন্তু আজ আমি আমার ভ্রম বুঝতে পেরেছি। বুঝেছি স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচার নয়। তাই আজ আমি দেবতার নামে শপথ করছি, আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাজসেবায় অতিবাহিত করব। আমি কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি মিশরের প্রজাশক্তি এই মিলিত রাজশক্তির ছত্র-ছায়ার তলে চিরকাল মনুষ্যত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত হোক।' [৫।৭]

নাটকে এই ধরণের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নাহরিণ ও মিসরীয় যুবরাজ রামেশিসের প্রণয়-কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

: আরব্য ও পারস্য উপাখ্যান নিয়ে নাটক :

আরব্য বা পারস্য উপাখ্যান নিয়ে নাটক লেখবার প্রবণতা এ দেশে বেশ দেখা যায়। ঐ সব দেশের ঐতিহাসিক ব্যক্তি নিয়েও বাংলায় একাধিক নাটক লেখা হয়েছে। নাদির শাহকে নিয়ে লেখা হয়েছে দু-খানি নাটক : বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'নাদির শাহ' [১৯২১] এবং যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী' [১৯২৮]।

ভারতের বাইরের ঐতিহাসিক পুরুষ হলেও নাদির শাহ ভারত-ইতিহাসের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নন। বাবর, আকবর এবং ঔরঙ্গজীব-এর অপদার্থ উত্তরাধিকারদের নিন্দনীয় অক্ষমতা এবং অভিজাত সমাজের স্বার্থপর কার্য-কলাপের ফলে মোগল শাসিত রাজ্যে দুর্নীতি ও অক্ষমতা যখন দানা বেঁধেছিল ঠিক সেই সময় নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন [১৭৩৮ খ্রীঃ]।

বরদাপ্রসন্নের 'নাদির শাহ' শুধু ভারত আক্রমণ নিয়ে রচিত নয় ; নাটকের শেষ দু-টি অংকে ভারত আক্রমণের ঘটনা স্থান পেয়েছে। আগের অংক-গুলিতে অখ্যাত অবস্থা থেকে নাদিরের উত্থান দেখানো হয়েছে। ইতিহাসের নাদির শাহের গোটা চরিত্রই রূপায়ণের প্রয়াস পেয়েছেন নাট্যকার নাটকটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : 'আমি প্রয়াস পাইয়াছি আমার যতদূর সাধ্য ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেই চরিত্র [নাদিরের চরিত্র] অংকিত করিতে।' কিন্তু নাদির সম্পর্কে 'বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ'-এর 'বিভিন্ন রূপের' চিত্র পাঠ করে নাট্যকারের ধারণা হয়েছে যে, 'ইতিহাস প্রসিদ্ধ নাদির শাহের চরিত্র একটি প্রহেলিকা।'

নাদির শাহ চরিত্র 'প্রহেলিকা' মনে হওয়ার যা পরিণতি তা-ই ঘটেছে ; অর্থাৎ ইতিহাস থেকে কিছু কিছু ঘটনা গ্রহণ করা সত্ত্বেও নাদির শাহকে তিনি দুর্বোধ্য করে তুলেছেন।

ইতিহাস অনুসরণ করলে কিন্তু নাদিরকে 'প্রহেলিকা' মনে করবার কোনও কারণ দেখা যায় না। এক সাধারণ পরিবারে নাদির শাহ্-এর জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ ডাকাত। পারস্যরাজ শাহ হুসেনের মৃত্যুর পরে [১৭২৭] তার পুত্র শাহ তাহ্মাস সিংহাসন অধিকার করেন। শাহ হুসেনের কাছ থেকে আফগানরা পারস্য ছিনিয়ে নিয়েছিল। শাহ তাহ্মাস নাদিরের সাহায্যে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং নাদির [নাদির কুলি খান] তাঁর সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে নাদিরই প্রকৃতপক্ষে পারস্যের শাসক হন। তিনি ১৭৩২-এ তাহ্মাসকে গদিচ্যুত করেন এবং তাহ্মাসের উত্তরাধিকারী তাঁর শিশুপুত্রের মৃত্যুর পর তিনি নিজেই নিজেকে পারস্যের শাহ রূপে ঘোষণা করেন।

রীতিমত পুরুষকার নিয়েই সামান্য অবস্থা থেকে নাদির শাহ হয়েছিলেন। তাঁর অসীম শৌর্য এবং সাহসের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু নাট্যকার বরদাপ্রসন্ন নাদিরকে পুরোপুরি সেই মর্যাদা দেননি এবং দেননি যে তা তিনি 'নিবেদন' অংশে নিজেই স্বীকার করেছেন : "নাট্যকার মাত্রেরই একটা প্রতিপাদ্য বিষয় থাকা প্রয়োজন, তাহা প্রচ্ছন্নই হউক কি পরিস্ফুটই হউক। 'নাদির শাহ' ঐতিহাসিক নাটক—অর্থাৎ ইতিহাসের ভিত্তির উপর ইহার গল্পাংশ গঠিত। ইতিহাস ইহার ভিত্তি—অবলম্বন সর্বজনীন [cosmopolitan] ধর্ম,

একমাত্র যাহাকে আশ্রয় করিয়া সকল জাতি, সকল সমাজ দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, পূর্বপক্ষে সেই বিরাট সমস্যা যাহা যুগে যুগে মানবের চিন্তাশক্তিকে আলোড়িত করিয়াছে—ঈশ্বরোস্তি ন বা, উত্তরপক্ষ সেই চরাচরের একমাত্র ধ্রুব সত্য : 'স বা জয়মাত্মা, সর্বস্ত সার্বস্তেশান' : ইত্যাদি [যজুর্বেদ]।...আমাদের দুষমন্ পাপরূপী শয়তান সহস্র প্রলোভন লইয়া আমাদের পশ্চাতে তাড়না করিতেছে, মানবাত্মা স্বভাবত নিম্নগামী নহে, তথাপি কেবলমাত্র পুরুষকার লইয়া তাহাকে জয় করিতে পারে না, তাহাকে জয় করিতে হইলে চাই তাঁহার করুণা। গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাই আমি প্রাণ দিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

নাট্যকারের এই দৃষ্টিভঙ্গিই নাটকটির সার্থকতার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। কারণ, ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব-এর প্রশ্নে পাপপুণ্যের বিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তা যেমন ইতিহাসও থাকে না, তেমনি নাটক হিসাবেও সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। ইতিহাসের ঘটনাবলীর আলোকে নাদির শাহকে না দেখে একটা মনগড়া আদর্শবাদের দিক থেকে নাট্যকার তাঁকে রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন। তাই ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে তিনি সর্বত্র আদর্শকে মেলাতে পারেন নি। এই ব্যর্থতা ঢাকবার জন্যে শয়তান, মোল্লাবাসী প্রভৃতি অতি-প্রাকৃত চরিত্রেরও অবতারণা করা হয়েছে। নাদির ইতিহাসের একজন যোগ্য নায়ক হওয়া সত্ত্বেও শয়তান বনে গেছেন। নাট্যকারের ভাষ্যদৃষ্টে দেখা যাবে শয়তানই সব, নাদির তার হাতের পুতুল। এই চরিত্রটির নির্দেশে নদী শুকিয়ে গেছে এবং নিমজ্জমান তরুণীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে [১।৩]; কখনও যুদ্ধরত নাদিরের প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি অলৌকিক প্রভাবে হরণ করে নাদিরের কাছে তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে [২।৫]; কখনও পাঁচ শত সুশিক্ষিত আফগান সৈন্য নিয়ে সে সেনাপতি বিশেষকে সাহায্য করেছে [২।৬]। শয়তানের এই সব অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় যে নাট্যকার তাঁর নাটকের 'শয়তানের স্বপ্ন' বলে যে বিকল্প নামকরণ করেছিলেন, সেই নামটাই ঠিক। এই অতি-প্রাকৃত শক্তির জন্যে নাদির চরিত্রটি ইতিহাসের নায়ক হিসাবে পরিস্ফুট হতে পারে নি। ইতিহাস এবং নাট্যশিল্প দুই দিক থেকেই এটা অনভিপ্রেত।

অনৈতিহাসিক চরিত্র এনে নাটকের কোন কোন অংশে ইতিহাসের বিকৃতি

ঘটানো হয়েছে। যেমন নাদিরের চিরশত্রু বেগম-আকবরী দিয়ে তাহ্‌মাসের শিশুপুত্রকে হত্যা করান হয়েছে। অথচ নাদির সত্যিই এই শিশুপুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে তাকেই শাহ্ বলে ঘোষণা করেছিলেন। এটা অবশ্য **mock ceremony** হতে পারে, কিন্তু এটা তিনি করেছিলেন এবং এই শিশু-পুত্রের মৃত্যুর পরই তিনি নিজেকে শাহ রূপে ঘোষণা করেন।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণ সংক্রান্ত অংশে নাট্যকার মোটামুটি ইতিহাসের অনুসরণ করেছেন এবং মোগল সম্রাট মোহম্মদ শাহ্‌-এর স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে নাদিরের আক্রমণের ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি যথার্থই রচিত হয়েছে: 'আমি সেই দিল্লীর সম্রাট যাকে সমস্ত হিন্দুস্থানের লোক একদিন দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা বলে পূজা করতো। আজ আমার কিছু নেই। দক্ষিণে মারাঠা আর পশ্চিমে রাজপুত প্রজ্বলিত বহ্নিশিখার মত মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অস্তিত্বটুকু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। তার উপর এই নাদির একটা মূর্তিমান ধ্বংসের ঝটিকার মত উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে ধেয়ে আসছে।' [৪।৩]।

অত্যাচারী নাদির শাহের যে রূপ নাটকে ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে ইতিহাসের মিল আছে। নির্বিচারে লুণ্ঠন, নরহত্যা, গৃহদাহ থেকে সুরু করে ময়ূর সিংহাসন, কোহিনূর রত্ন অপহরণ সবই ইতিহাস সমর্থিত।

: অপরেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক :

ঐতিহাসিক নাটকে যখন বাংলার রঙ্গমঞ্চ জমজমাট, সেই সময় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাটক রচনা আরম্ভ করেন। কয়েকখানি ইংরেজী নাটকের অনুবাদ করে তিনি নাট্যকার রূপে আবির্ভূত হন এবং অনেকগুলি পৌরাণিক নাটকও তিনি রচনা করেন। নাটকের ধর্ম বিশেষ ভাবে ঐতিহাসিক নাটকের ধর্ম সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য নাটক বিশেষভাবে **Henrik Ibsen**-এর নাটকের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। সে যুগে যে সব বাংলা ঐতিহাসিক নাটক লেখা হচ্ছিল সেগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট সমালোচনা তিনি করেছেন। তিনি বলেছেন: 'ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাষণ, ঐতিহাসিক চরিত্রের যথাযথ মর্যাদা-রক্ষণ, এ সকল ভাব ঐতিহাসিক নামধেয় নাটক হইতে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে। Sensation বা উত্তেজনাই ঐতিহাসিক নাটকের মূল

মগ্ন হইয়া নাট্য-সাহিত্যকে এমনই হীন স্তরে নামাইয়া দিয়াছে যে, সে কথা স্মরণ করিতেও লজ্জা হয়। সত্য অপেক্ষা মিথ্যা আস্ফালন এবং মিথ্যা অভিমানই বহু নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। দেশময় তখন একটি উত্তেজনার প্রবল তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। সেই উত্তেজনাকে অবলম্বন করিয়া বাংলার নাট্যশালা উদর পূরণ করিয়াছে, কিন্তু মনের খোরাক বিশেষ কিছু আহরণ করিতে পারে নাই।' [রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, ১৯৭২ সংস্করণ, পৃঃ ৯৩]। তখনকার ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে এই মন্তব্য করা সত্বেও অপরেশচন্দ্র নিজে তাঁর নাটকে কি যুগপ্রভাব সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পেরেছিলেন? সম্পূর্ণভাবে পারেন নি। তার কারণ তিনি নিজে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের চাহিদাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না।

অপরেশচন্দ্র তিনখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন; 'রাখী বন্ধন' [১৯২০] 'অযোধ্যার বেগম' [১৯২১] এবং 'ইরাণের রাণী' [১৯২৩]।

॥ রাখী বন্ধন ॥ অপরেশচন্দ্র তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'রাখী বন্ধন' তাঁর পূর্বে অনুসৃত রাজপুত কাহিনী অবলম্বন করেই রচনা করেন। এই নাটকটির যথার্থ ঐতিহাসিক মর্যাদা নেই। এ দিক থেকে তিনি যত্নবানও হন নি। তিনি ইউরোপীয় নাট্যকলার কাঠামোর দিকেই বেশী মনোনিবেশ করেছেন এবং ব্যবসায়ী নাট্য-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকায় নাটককে নানা আড়ম্বরে সজ্জিত করে দর্শকদের মন হরণের চেষ্টা করেছেন।

'রাখাবন্ধন' নাটকটির ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন: 'জগৎপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেনের আদর্শেই রচিত।' পিতাহারা এক রমণীর পিতৃহত্যার প্রতিবিধান-এর কাহিনী নিয়ে নাটকটি রচিত। এই রাতপুত রমণীর নাম ধারাবতী। Henrik Ibsen-এর '*The Vikings at Helgeland*' নামক নাটককে অবলম্বন করে রাখী বন্ধন নাটকটি রচিত হয়। ৮ম-১০ম শতাব্দীর স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান জলদস্যুদের বলা হতো Vikings[৪]। ১০ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের উত্তর নরওয়ে-এর পটভূমিকায় নাটকটি রচিত। কোন "আদর্শায়িত" চরিত্র উপস্থিত না করে প্রাচীন স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান জীবন থেকে বাস্তব চরিত্রই ইবসেন উপস্থিত করেছেন তাঁর নাটকে। আর তাঁর অনুসরণে অপরেশচন্দ্র ভারতের ষোড়শ শতাব্দীর পটভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন তাঁর কাহিনীকে। এই দুই

দেশের দুইটি পৃথক যুগের জীবনযাত্রার কোনও মিলই নেই। তাই ইবসেনের নাটক যেখানে হয়েছে বাস্তব, সেখানে অপরেশচন্দ্রের নাটক হয়েছে রোমাণ্টিক।

রাজপুত রমণী বীরাঙ্গনা, সাহসী—সবই ঠিক। কিন্তু তাঁরা রক্তমাংসের মানুষ। অথচ ধারাবতীর সমস্ত মানবিক বোধকে লুপ্ত করে তাকে একটা হিংস্র জীবে পরিণত করা হয়েছে। তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে [প্রথম অঙ্ক/ প্রথম দৃশ্য] যে, তার পিতা তাকে বাঘের মাংস খাওয়াতেন বাঘের মত গায়ের জোর হবে বলে। নাট্যকারের সৃষ্ট এই হিংস্র রমণী শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে একটির পর একটি হত্যাকাণ্ডের ইন্ধন জুগিয়েছে।

॥ **অযোধ্যার বেগম** ॥ অপরেশচন্দ্রের 'অযোধ্যার বেগম' নাটকটি বাংলার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপিত। নবাব মীরকাশিম উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্তু তাঁর এবং নবাবের সম্মিলিত সৈন্যদল বক্সার যুদ্ধে ইংরেজের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় [১৭৬৪]। মীরকাশিমের শেষ জীবনের দুঃখ লাঞ্ছনা নাটকটির অন্যতম উপজীব্য হলেও নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং অযোধ্যার বেগম বা বউ-বেগম-এর দাম্পত্য সম্পর্কই নাটকটির মূল বিষয়।

ইতিপূর্বে চণ্ডীচরণ সেন 'অযোধ্যার বেগম' এই নামেই একখানা উপন্যাস রচনা করেন [১৮৮৬]। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে অপরেশচন্দ্র যে তাঁর নাটকের তথ্য আহরণ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। আর এই উপন্যাসের যেমন জনশ্রুতিই প্রধান অবলম্বন, অপরেশচন্দ্রের নাটকের প্রধান অবলম্বন সেই ধরণের জনশ্রুতি।

চণ্ডীচরণ তাঁর উপন্যাসে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং বৌ-বেগমের চরিত্র একই সঙ্গে এইভাবে মূল্যায়ন করেছেন : 'নবাব সুজাউদ্দৌলা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত নরপিশাচ ছিলেন। বউ-বেগমের এই সকল বিষয় নিবারণ করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইত বলিয়াই নবাবের উপর তাঁহার কিছু প্রভুত্ব ছিল।'

'......এ সংসারে অর্থ সম্পত্তির লিপ্সাই মানুষকে ঘোর মোহান্ধকারে নিপতিত করিয়া, চরমে তাহাদিগকে বিনাশের পথে পরিচালনা করে। অযোধ্যার বেগম মোহান্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছেন ধীরে ধীরে তাহার জীবন-তরী বিনাশের দিকে পরিচালিত হইতেছে।'

অপরেশচন্দ্র তাঁর নাটকে বউ-বেগমের মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে : 'বাল্যকাল থেকে এক ফকিরের কাছে শিখেছিলেম, রমণীর কর্তব্য কি। সে শিক্ষা এখনও ভুলতে পারিনি। নবাব-মহিষীর জীবন লাঞ্ছনার জীবন। স্বামী ব্যাভিচারী, বিলাসী, হৃদয় বলে কোন বস্তু তাঁর নেই।' [১।৩]।

ইতিহাসেও সুজাউদ্দৌলার বিলাসী ও ব্যাভিচারী চরিত্রের পরিচয় আছে। বক্সারে যুদ্ধের মুখোমুখী হয়েও তিনি শিবিরে নিরুদ্বেগে নৃত্যগীত উপভোগ করেছেন। এমন একজন নবাবের স্ত্রীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াই স্বাভাবিক। এবং তাই বউ বেগমের অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর নাটকের ভিত্তি রচনা করা অসঙ্গত হয়নি। নাটকের মূল বক্তব্য দাম্পত্য জীবনের সংঘাত হলেও অপরেশচন্দ্রও সমসাময়িক ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তিনিও এই নাটকে দেশাত্মবোধের কথা এবং হিন্দু-মুসলিম বিরোধের কথা উপস্থাপিত না করে পারেন নি।

পলাশীতে ইংরেজ প্রাধান্যের যে সূচনা হয়, বক্সারে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়; বাংলা ও বিহার সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের করতলগত হয়; অযোধ্যার নবাবও ইংরেজের প্রভাবাধীনে আসে। অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্ব প্রকৃত পক্ষে এখান থেকেই সুরু হয়। তাই নাটকে বক্সার যুদ্ধে পরাজয়ের পর মীরকাশিম বলছেন : 'গাছ বেঁচে রইলো—বাংলার মাটি উর্বর, এ মাটিতে বিশ্বাসঘাতক জন্মাবে। আবার রায়দুর্লভ, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র ভিন্ন আকারে বাংলায় দেখা দিবে। এরা দেশ চায়নি—স্বাতন্ত্র্য চেয়েছিল, ভবিষ্যতেও এদের কেউ দেশ চাইবে না, চাইবে আত্ম-প্রাধান্য।'

মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : 'হিন্দুদ্বেষী, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাযুক্ত আত্মদ্রোহী। আত্মহত্যাই হবে তাদের ধর্ম।'

॥ **ইরাণের রাণী** ॥ অপরেশচন্দ্র তাঁর শেষ ঐতিহাসিক নাটক 'ইরাণের রাণী'তে ভারতের ইতিহাসের পরিবর্তে ইরাণের ইতিহাস অবলম্বন করেছেন। নাটকটি Oscar Wilde-এর *The Duchess of Padua*-এর অনুসরণে লেখা হয়।

এই নাটকের নায়িকা ইরাণের রাণী। তাঁরই বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের কাহিনী নিয়ে নাটকটি লেখা হয়েছে। 'অযোধ্যার বেগম' নাটকে আমরা বউ-বেগমের যে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখি, 'ইরাণের রাণী'তে সেই

প্রতিক্রিয়া অনেক বেশী তীব্র। রাণী বলছেন: 'বন্ধন বটে, তবে বন্ধনটা এক পক্ষের। আর সহধর্মিনী সে অত্যাচার সইবার জন্য, বলবান্ পুরুষের লাথি খাবার জন্য, তার খেয়ালের পুতুল হবার জন্য, তার সুখের জন্য।' [২।১]। অথবা: 'পোষা কুকুরের জন্য তুমি ত কখন রাত জেগে বসে থাকোনি—কখন তোমার প্রভু দয়া করে বাইরের আমোদ ফেলে ঘরে ফিরবেন; আর তুমি চোখের জল মুছে হাসিমুখে হয় পাখা দিয়ে তাকে বাতাস করতে বসবে কিংবা পদসেবা করে তোমার পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করে রাখবে।' [২।১]

নারীর মনের এই তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রাচীন ইরাণের পটভূমিকায় বেমানান। নাট্যকার ইবসনের দ্বারা, বিশেষভাবে A Doll's House-এর দ্বারা প্রভাবিত এবং সেই সঙ্গে সমসাময়িক কলিকাতার জীবনচিত্রও তাঁর মনে ছিল। তাই নারীত্বের এই নতুন মূল্যবোধ স্বভাবতই তাঁর নাটকে স্থান পেয়েছে।

শুধু এই একটি ব্যাপারই নয়। পরাধীন দেশের নাট্যকার হিসাবে ঔপনিবেশিক্ শাসনের আওতায় জনসাধারণের দুর্বিসহ জীবনযাত্রার দিক থেকেও স্বভাবতই তিনি চোখ ফেরাতে পারেননি। তিনি লিখেছেন:

> 'হোথা দীন প্রজা
> অন্নাভাবে ক্ষুধায় কাতর
> পড়ে রহে ব্যাধি ক্লিষ্ট
> জীর্ণ ভগ্ন অন্ধকার কারাগৃহ মাঝে।' [১।৩]।

নাট্যকার এই সঙ্গে বিদেশী শাসনের আওতায় যে নূতন বণিক সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের বিলাসী ও অলস জীবনযাত্রার উপরেও কটাক্ষ করেছেন।

ইরাণের রাজা দায়ুদ অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর অত্যাচারের যে প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে সেটা বিংশ শতাব্দীর ভারতের জনগণের মনের প্রতিক্রিয়া। দায়ুদ সখেদে বলেছেন: 'গরীব চাষা, রাস্তার মুটে, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বড়লোক দেখলে আর পাগড়ী খুলে সেলাম করে না। বলে মানুষ সব এক। একজন একজনের কাছে মাথা নোয়াব কেন?' [১।৩]।

অপরেশচন্দ্র তাঁর নাটকে মননশীলতার দিকে ঝুঁকছিলেন এবং কোনও চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব তিনি ভালভাবেই পরিস্ফুট করেছেন। কিন্তু তিনিও যে যুগ-প্রভাব একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি তা আমরা দেখেছি। তবে বিদেশী শাসকদের প্রতি পরাধীন দেশের নাট্যকারের মধ্যে জাতিবৈরিতা

স্বাভাবিক ভাবেই থাকে, তা থেকে তিনি মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মনোভাবও সুস্পষ্ট : 'পাঠক যদি একটু অবহিত হইয়া তখনকার ঐতিহাসিক নাটক এখন পাঠ করেন তাহা হইলে দেখিবেন, কাব্যের অমৃতধারা অপেক্ষা জাতিবৈরিতার বিষ তাহার সর্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; দেখিবেন যে, রাজা বা স্বদেশপ্রাণ উদার চরিত্র আঁকিতে গিয়া কতকগুলি প্ল্যাটফরম স্পীকারের সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং এই অভিনব সৃষ্টির মধ্যে নরনারীর ব্যাকরণগত প্রভেদ থাকিলেও ভিতরের পার্থক্য কিছুই নাই। দেখিবেন যে, প্রায় প্রতি ঐতিহাসিক নাটকেই দুইটা করিয়া দল আছে, তাহার একদল নির্যাতিত আর একদল অত্যাচারী ; একদল স্বদেশের জন্য জীবন আহুতি দিতেছে, আর একদল তাহারই বিরুদ্ধে তরবারি ধরিয়াছে। মানুষ যখন তাহার অন্তরের দেবতাকে ভুলিয়া বহির্মুখী হয়, তখন শুধু যে তাহার মনুষ্যত্বের অপহ্নব ঘটে তাহা নহে, তাহার ভিতর সুন্দর যাহা তাহা সে হারাইয়া ফেলে ; শেষে তাহার কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত থাকে না। তখনকার বহু ঐতিহাসিক নাটকে এই হীনতা ও দীনতার পরিচয় আমরা পদে পদে পাইয়াছি।' ['রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর', ১৯৭২ সংস্করণ, পৃঃ. ৯৩]।

অপরেশচন্দ্র যাকে 'দীনতা' ও 'হীনতা' বলেছেন নিছক নাট্যকলা বিচারে তা হয়তো মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, স্বাধীনতার জন্য যে জাতি আন্দোলন রত সেই জাতির কাব্য, উপন্যাস, বিশেষভাবে নাটক সঙ্গত কারণেই দেশাত্মবোধের বাহন হতেই পারে এবং অপরেশচন্দ্র যে ত্রুটীগুলি নির্দেশ করেছেন সেগুলির মূলে ঐ একটি কারণই রয়েছে। তাই নাটক বিচারে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা আলোচনা করতে পারি কিন্তু তাকে 'দীনতা' ও 'হীনতা' বলতে বিবেকে বাধে। অপরেশচন্দ্র সচেতনভাবে ঐগুলি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছেন, জাতিবৈরিতা উগ্রভাবে তাঁর নাটকে প্রবেশ করেনি, কিন্তু তাঁর নাটকও সমসাময়িক প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত নয়। তা যদি হতো তবে তাঁর 'অযোধ্যার বেগম'-এ মীরকাশিম বাংলার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে বক্তৃতা করতেন না এবং মুসলমানদের সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য অত কঠোর হতো না।

এই যুগে দেশাত্মবোধের কাহিনী নিয়ে সোজাসুজি নাটক রচনা করার অসুবিধা ছিল। ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্ট ভালভাবেই চালু ছিল। যার

ফলে ১৯২২-এ মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ভূপেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা' নাটকটিকে নিষিদ্ধ করা হয়।' এই জন্যে নাট্য-কারেরা দেশের বা বিদেশের অতীত ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই এ যুগের দেশাত্মবোধকে রূপায়িত করার চেষ্টা করছিলেন।

দুই একজন নাট্যকার নয়, এ যুগের প্রায় প্রতিটি নাট্যকার সুযোগ পেলেই ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ প্রচারে উৎসাহিত হয়েছেন। নিশিকান্ত বসু, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রমুখ তো বটেই হরিপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রাণী দুর্গাবতী'তে, হরনাথ বসু তাঁর 'ময়ূর সিংহাসন', 'গুরুগোবিন্দ', 'মহারাষ্ট্র গৌরব' প্রভৃতিতে, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাজীরাও' নাটকে, প্রমথ রায় চৌধুরী তাঁর 'হাম্বির', 'চিতরোদ্ধার', 'জয় পরাজয়'-এ, অতুলানন্দ রায় তাঁর 'পাণিপথ' নাটকে এই প্রচেষ্টা করেছেন।

বাঙালীর ভাবাবেগকে ব্যবহার করে এই সময় দ্বিজেন্দ্রলালও একখানি নাটক রচনা করেন। এই নাটকে অবশ্য হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কোনও বাণী নেই, বা সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনেরও ছোঁয়াচ নেই। এটা নিছক বাঙালীর অতীত বীরত্বের একটি কাহিনী।

: দ্বিজেন্দ্রলালের একখানি নাটকীয় রোমান্স :

বাঙালী যুবক বিজয়সিংহ সিংহল জয় করেছিল, এমন একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এই কাহিনীর সত্যতা অস্বীকার করেছেন; তবুও বাঙালীর এই গৌরবের কাহিনী নিঃসন্দেহে বাঙালীর ভাবাবেগকে উদ্দীপ্ত করে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'আমরা' কবিতায় এই কাহিনীকে অমর করে রেখে গেছেন:

'বাঙালীর ছেলে বিজয় সিংহ
হেলায় লঙ্কা করিল জয়।'

এই কবিতাই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে 'সিংহল বিজয় নাটক' [১৯১৫] রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু তাঁর জীবন সায়াহ্নে লিখিত এই শেষ নাটকটি ভাবাবেগের দিক থেকে যতই জমজমাট হোক, নাটক হিসাবে সার্থক হয়নি।

বঙ্গেশ্বর সিংহবাহু তাঁর পুত্র বিজয় সিংহকে গুরুতর অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে কারারুদ্ধ করেন। এক ডাকাতের সাহায্যে বিজয় উদ্ধার লাভ

করে শ্যামদেশে চলে যায়, শ্যামদেশ অধিকার করে আবার বঙ্গে ফিরে আসে। কিন্তু বিমাতার জন্ত পিতার সঙ্গে বিজয়ের সম্পর্ক ভাল হতে পারে না; বিজয় নির্বাসিত হয়। বিজয়সিংহ সিংহল জয় করে। কিন্তু দেশে যখন সে ফিরলো তখনই নাটকীয়ভাবে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। বিজয়সিংহ বুদ্ধদেবের আদেশে এবার সিংহলে ধর্মপ্রচার করতে যাত্রা করেন। রাজ্যভার দিয়ে যান কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্রকে।

নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে ঐক্য ও সঙ্গতির নিতান্তই অভাব হেতু 'সিংহল বিজয়' একটী সংহত নাটকীয় কাহিনী হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি।

নাট্যকারের কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনার মিল নেই। তা ছাড়া সিংহলের প্রাচীন আখ্যায়িকা যে 'মহাবংশ' অবলম্বনে নাট্যকার তাঁর নাটকের কাহিনী রচনা করেছেন সেই গ্রন্থের সঙ্গেও অনেকক্ষেত্রে অমিল রয়েছে। নাটকের অধিকাংশ ঘটনাই নাট্যকারের কল্পনার সৃষ্টি। 'মহাবংশ'-এ সিংহ-বাহুর কোনও কন্যার কথা পাওয়া যায় না; সুমিত্র বিজয়েরই সহোদর ভাই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সিংহবাহুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং কন্যা সুরমার চরিত্র কল্পনা করা হয়েছে। এমন কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা সিংহল বিজয়ে বহু আছে: বিজয়ের শ্যাম দেশ জয়, পিতা কর্তৃক পদাঘাত, রাণীকে অন্ধ করে দেওয়া থেকে সুরু করে তাঁর মৃত্যুর দৃশ্য কাল্পনিক। অত্যাচারী বিজয়সিংহকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা 'মহাবংশ' সম্মত নয়। 'মহাবংশে'-র কুবণ্না সিংহল বিজয় নাটকে কুবেণী, তবে নামের সঙ্গতি ছাড়া নাটকে কুবেণী নতুন সৃষ্টি।

নাট্যকার অবান্তর চরিত্র ও অবান্তর ঘটনা সংযোজন করতে গিয়ে নাটকটিকে দীর্ঘ করে ফেলেছেন—নাটকীয় সংহতি নষ্ট হয়ে গেছে। "নাটকীয় গতির উত্তাপেই নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই নাটকের অধিকাংশ ঘটনাই গতিবেগের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় নি। আকস্মিকতার চমক, উদ্ভট রোমাঞ্চকর ঘটনার সংযোজনা, দূরবিস্তৃত অরণ্য সমুদ্র জনহীন দ্বীপভূমি পরিবেষ্টিত পটভূমিকা বর্ণময় রোমাঞ্চের জগৎই সৃষ্টি করেছে।" [রথীন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড : সাহিত্য সংসদ সংস্করণ]

এই নাটকের কাহিনী প্রকৃতপক্ষে তিনটি: সিংহবাহু-রাণী সুরমা ও বিজয়কে নিয়ে একটি, বিজয় ও তার সঙ্গিদল নিয়ে আর একটি এবং কলিসেন-জয়সেন-

বসুমিত্রা-কুবেণী নিয়ে আর একটা কাহিনী। এই তিনটি কাহিনীর যোগ সূত্র যে বিজয় সে এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ নয় যাতে স্বাভাবিক ভাবে তাকে ঘিরে একটি সংহত প্লট গড়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া বঙ্গদেশ, শ্যামদেশ, সমুদ্র বক্ষ সিংহল প্রভৃতি বিস্তৃত ঘটনার ক্ষেত্রে নাটকটি তার ঐক্য হারিয়ে ফেলেছে।

নাটকটিতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর চেয়ে পারিবারিক ষড়যন্ত্রের কাহিনী, বিপরীতমুখী প্রেমাদর্শ অর্থাৎ নিষ্কাম প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের আদর্শ প্রভৃতিই বড় হয়ে উঠেছে। সিংহবাহু চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু তিনি কাহিনীর নায়ক নন। আসলে কতকগুলি রোমাঞ্চকর এবং সংবেদনশীল ঘটনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এই নাটকে; নাটকের নায়ক হয়েছে রূপকথার রাজপুত্র। তাকে ঘিরে রয়েছে দৈব-সহায়তা: 'এই বিজয়সিংহকে যেন একটা দৈবশক্তি ঘিরে রক্ষা কচ্ছে।' [৫।১]।

বিজয়সিংহ যেন এই দৈব সহায়তা বলেই বিষ প্রয়োগের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে, সমুদ্র সমাধি, ঘাতকের আক্রমণ থেকে অনায়াসে উদ্ধার পেয়ে যাচ্ছে। লঙ্কার অধিবাসীরাও নাটকে মানুষ নয়, যক্ষ। যেমন: 'লঙ্কার যক্ষের রাজত্বের পরমায়ু শেষ হয়েছে—মানুষের যুগ এসেছে।' [৪।৩]

অথবা, 'যক্ষের আগে এ স্বর্ণলঙ্কা রাক্ষসের ছিল, তাপস।' [৩।৫] এই যক্ষের রাজত্বে যে বিজয়সিংহ কিছু অলৌকিক কাণ্ড দেখবেন তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। এই রাজ্যের রাণী কুবেণী যাদুমন্ত্রে বিজয়সিংহকে মুগ্ধ করে রেখেছেন [৪।৪], যাদুদণ্ডে তাঁকে চালনা করেছেন। অন্যদিকে Shakespeare-এর কমেডির নায়িকার মত বিজয়সিংহের স্ত্রী লীলা বালকের ছদ্মবেশে স্বামীর অনুসরণ করেছেন। এক কথায় নাট্যকার বহু চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ করেছেন এই নাটকে; কিন্তু একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী রচনার মধ্য দিয়ে সার্থক নাটক রচনা করতে পারেন নি। নাটকটি ঐতিহাসিক নাটকও হয়নি, হয়েছে পুরাবৃত্ত আশ্রয়ী একখানি নাটকীয় রোমান্স।

১। ঔরঙ্গজীবের আক্রমণাত্মক নীতি মেবারের শিশোদীয় এবং মাড়-ওয়ারের রাঠোরদের মিলিত শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছিল। এই মিলিত শক্তির কাছে পদে পদে মোগলেরা পরাজয় বরণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন: 'The sufferings of the Mughal

had been considerable and they could not gain any definite success against the Rajputs. These considerations led the Emperor and the Rana Joy Singha, son and successor of Raj Singha to conclude a treaty in June 1681.' [*An Advanced History of India* : by Majumder, Raychaudhuri and Dutta, New York (1965). p. 504.]

২। আলমগীর অর্থ বিশ্ববিজয়ী [Conqueror of the World.]

৩। 'রাজসিংহ বিখ্যাত মাড়বারী দুর্গাদাসের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন। ঔরঙ্গজেব পুনশ্চ পরাজিত ও অপসারিত হইয়া, বেত্রাহত কুক্কুরের ন্যায় পলায়ন করিলেন। রাজপুতেরা তাঁহার সর্বস্ব লুঠিয়া লইল। ঔরঙ্গজেবের বিস্তর সেনা মরিল। ঔরঙ্গজেব ও আজিম ভয়ে পলাইয়া রাণাদের পরিত্যক্ত রাজধানী চিতোরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। সুবল দাস নামক একজন রাজপুত সেনাপতি পশ্চাতে গিয়া চিতোর ও আজমীরের মধ্যে সেনা স্থাপন করিলেন। আবার আহার বন্ধের ভয়। অতএব খাঁ রহিলাকে বার হাজার ফৌজের সহিত সুবল দাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিয়া ঔরঙ্গজেব স্বয়ং আজমীরে পলায়ন করিলেন। আর কখনও উদয়পুরমুখী হইলেন না'। ['রাজসিংহ' অষ্টম খণ্ড, ষোড়শ পরিচ্ছেদ]

৬। Ibsen এই বইটি যখন রচনা করেন [১৮৫৭] তখন এটির নাম ছিল *The Warriors at Helgeland.* ১৯০৩-এ লণ্ডন-এ 'ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে' অভিনয়ের সময় এর নামকরণ করা হয় *The Vikings.*

৭

নাটক ও নাট্যশালায় নব যুগের সূচনা

১৯২৩ থেকে বাংলা নাটক ও নাট্যশালার এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই সময় রাজনৈতিক অবস্থা অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। ১৯২২-এর ৪ ফেব্রুয়ারী যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় চৌরিচোরায় উত্তেজিত জনতা কর্তৃক থানা আক্রমণ-এর ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় গান্ধীজী চিন্তান্বিত হলেন। সত্যাগ্রহ তিনি স্থগিত রাখলেন, দেশবাসীকে সরকারের আইন অমান্য করে কারাবরণ করতে নিষেধ করলেন এবং গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করতে বললেন। এর মধ্যে চরকা কাটা ও খদ্দর প্রচার হল প্রথম কাজ।

গান্ধীজীর এই ডাকে শুধু বাঙালী কবিরাই নয়[১] বাঙালী নাট্যকারেরাও সাড়া দিয়েছিলেন। নাট্যকার মনোমোহন রায়-এর 'জীবন যুদ্ধ' নাটকে আমরা চরকা ও খদ্দরের মহিমা কীর্তন শুনতে পেলাম:

> খদ্দর পর বোলো গাও খদ্দর বাণী
> খদ্দর মোদের দেশের রাজা চরখা মোদের রাণী।

চরকা ও খদ্দর একটি উৎসাহের সৃষ্টি করলেও তা বরাবর একই স্তরে থাকলো না। গান্ধীজী আবার সত্যাগ্রহের ডাক দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু দেশের মধ্যে তখন অবসাদ দেখা দিয়েছে, খিলাফত আন্দোলনও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছে। চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে বাংলায় স্বরাজ্যদল নতুনভাবে কাজ আরম্ভ করলেন, আবার বিপ্লবীদের অস্তিত্বও নতুন করে দেখা দিল। এই অবস্থার মধ্যে ১৯২৬-এ কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা হয়ে গেল। তবে ১৯২৭ থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মোড় ঘুরলো। কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হলো, আবার আইন অমান্য আন্দোলন এবং বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে আবার নানা রকম প্রস্তাব। ইতিমধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক অনেক তিক্ত হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত নতুন এক সংবিধান রচিত হয়েছিল এবং কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্বও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যাবার পর

রাজনৈতিক অবস্থায় আবার পরিবর্তন ঘটে গেল। দেশের এই পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে বাংলা নাটক ও নাট্যশালায় নতুন যুগের সুরু হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটক যে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি করেছিল, সেই যুগ যখন ম্লান হবার মুখে তখন আবির্তাব ঘটলো নতুন দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন নাট্যকলা বিশারদ এক নতুন নট-সম্প্রদায়ের, যার শিরোমণি হলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। প্রয়োগশিল্পী শিশিরকুমার মঞ্চের দৃশ্যপট, পোষাক পরিচ্ছদ, অ্যাসেম্বল এ্যাকটিং সব দিক থেকেই রঙ্গমঞ্চে নব-যুগের প্রবর্তন করলেন। সে যুগের নাট্যকারদের উপরেও তাঁর প্রভাব পড়লো —তিনি পরামর্শ দিয়ে কোনও কোন॰ নাটক লেখালেন আবার আগের লেখা নাটককে তিনি নতুন ভাবে অভিনয় করলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক শিশিরকুমার ১৯২১-এ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালেন। যে নাটকের অভিনয় করে তিনি প্রথম জনচিত্ত জয় করলেন সেটি হচ্ছে ঐতিহাসিক নাটক 'আলমগীর' [ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত]। এই নাটকটি যে সে যুগের প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আবেদন নিয়ে রচিত হয়েছিল সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এই যুগের ঐতিহাসিক নাটকের সুরু নিশিকান্ত বসু রায়ের 'বঙ্গে বর্গী' নাটকটি নিয়ে। নাটকটি যথেষ্ট মঞ্চ-সাফল্য লাভ করে ছিল।

॥ **বঙ্গেবর্গী** ॥ বাংলায় বর্গী আক্রমণের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে নিশিকান্ত বসু রায়ের 'বঙ্গেবর্গী'[২] [১৯২৩] নাটকটি রচিত। ১৭৪০-এ গিরিয়ার যুদ্ধে উপকারী প্রভু শুজাউদ্দীনের পুত্র বাংলার নবাব সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে আলীবর্দী খাঁ বাংলার সিংহাসন দখল করেন। এই হত্যা-কাণ্ডের জন্য আলীবর্দী অনুতপ্ত ছিলেন। বর্ধমানে মারাঠারা যখন নবাব শিবির অবরোধ করে সমস্ত রসদ লুণ্ঠন করে [১৭৭২] তখনকার ঘটনা নিয়ে নাটকের সুরু এবং মারাঠা বাহিনীর নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে শিবিরে আমন্ত্রণ করে হত্যা করার ঘটনা [১৭৪৪] দিয়ে নাটকের সমাপ্তি। নাটকে দু-বছরের যে সময় সীমা রয়েছে সেই দু-বছরে মারাঠাদের সঙ্গে বাংলার নবাবের কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছে; মারাঠা উৎপীড়নে বাংলা বিধ্বস্ত হয়েছে, সৈন্যদল অবসাদগ্রস্ত ও রাজকোষ শূন্য হয়েছে। শেষে 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' নীতি অবলম্বন ক'রে বর্গী বিতাড়ন সম্ভব হয়েছিল।

'বঙ্গেবর্গী' নাটকটিও রীতিমত ঘটনা শঙ্কুল এবং বর্গীর অত্যাচারের কাহিনী বেশ ভালভাবেই এতে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলার ইতিহাসের যে কাহিনী অবলম্বনে আজও ছেলে ঘুমপাড়ানোর জন্যে ছড়া করে বাঙালী মায়েরা আবৃত্তি করেন ['ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এলো দেশে'] সেই কাহিনীর প্রতি বাঙালী নাটক-দর্শকদের আকর্ষণ স্বাভাবিক। তাই নাটকটি জনপ্রিয় হয়েছিল।

কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে বিচার করতে গেলে নাটকের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি সহজেই চোখে পড়বে। এই নাটকের প্রধান ত্রুটি এতে ইতিহাস-বহির্ভূত বিষয়ের এবং চরিত্রের প্রাধান্য রয়েছে। গৌরী [ভাস্করের কন্যা], মাধুরী [মোহনলালের ভগ্নী] প্রভৃতি অনৈতিহাসিক চরিত্র তো আছেই ; সেই সঙ্গে আছে উপানন্দ, ছিদাম, শান্তিরাম, উমাতারা প্রভৃতি ইতিহাস বহির্ভূত চরিত্রগুলি। এই চরিত্রগুলিকে ইতিহাস গ্রাস করে আপনার অংগীভূত করে নেয়নি, এরা নিজেদের ছোট ছোট কাহিনী নিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে ফুটে উঠেছে। বাংলা নাটকের উদ্ভব যুগ থেকে আমরা সামাজিক নাটকে যে প্রসঙ্গগুলি দেখেছি সেই ধরণের প্রসঙ্গ অনায়াসে এই ঐতিহাসিক নাটকে স্থান করে নিয়েছে।

এই নাটকের একটি প্রসঙ্গ উপানন্দ নামক একজন ধনী গৃহস্থের। অর্থ পিশাচ, কুশীদজীবী, বিয়ে পাগলা এই বুড়োর গতানুগতিক চরিত্রের একমাত্র আনন্দ পরিবেশন ছাড়া আর কোনও মূল্য নেই এই নাটকে। মোহনলালকে একঘরে করা উপলক্ষে উপাধ্যায়, স্মৃতিরত্ন, তর্কচঞ্চু, ছিদাম প্রভৃতি কয়েকটি কমিক চরিত্র নিয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চিত্র আঁকা হয়েছে এবং এতে কৌতুক রসও সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে এ ধরণের দৃশ্য নেহাতই বেমানান। ইতিহাসের পাত্র-পাত্রী নিয়েও ইচ্ছা করলে যেখানে কৌতুককর অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, সেখানে ইতিহাস বহির্ভূত চিত্র এবং মূল ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রসঙ্গ আনবার কোনও সার্থকতা নেই।

বঙ্গেবর্গী নাটকের অন্যতমা প্রধান নারী চরিত্র মাধুরী [মোহনলালের ভগ্নী] কল্পিত চরিত্র। সে বর্গীর দ্বারা অপহৃতা, কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিতের সাহায্যে নিরাপদে ফিরে এসেছে ; কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি, সমাজ তার 'পূত চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করতে দ্বিধা বোধ করেনি'। এই মাধুরীই

হীরাঝিল কক্ষ থেকে বন্দিনী গৌরীকে [ভাস্করের কন্যা] উদ্ধার করেছে। এই মাধুরীকে দিয়ে নাট্যকার সমাজ সংস্কার আর দেশপ্রেমের বক্তৃতা করিয়েছেন: 'সমাজ না জেনে—না শুনে আমার পূত চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। দেখব একবার যে বিধাতার অভিশাপ থেকে এই পাপ ঘৃণ্য সমাজ কেমন ক'রে তার কল্পিত পবিত্রতা রক্ষা করে; দেখব একবার যে এই কঙ্কালসার স্থবির সমাজের কোন মেরুদণ্ড তার উচ্চশির সদর্পে খাড়া রাখতে পারে।' [২।৫]। অথবা, 'যে ভারতে একদিন লাঞ্ছিতা-মর্মপীড়িতা-অসহায় সতীত্ব রক্ষার্থে স্বয়ং ভগবানকে ছুটে আসতে হয়েছিল—সে ভারতের সতীর এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রুর জন্য এমন এক একটা প্রলয় সংঘটিত হয়েছে যার সংঘাতে লক্ষ লক্ষ মুকুট চূর্ণ হয়ে গেছে—সে ভারতে রমণীর মর্যাদা রক্ষা করতে চির-বৈরী সব, হিংসা দ্বেষ বিরোধ বিস্মৃত হয়ে গলাগলি ধ'রে এক পতাকার মূলে দাঁড়িয়ে পাপের সঙ্গে লড়েছে—দৃপ্তশির উন্নত করে হাসতে হাসতে অম্লান বদনে মরণকে আলিঙ্গন করে অমর হয়েছে—যে নিঃস্ব ভারত আজ গৌরবের যা কিছু সমস্ত অতীতের বুকে বিসর্জন দিয়ে শুধু সতীর মহিমার পতাকা উড়িয়ে; সতীর মহিমার ডঙ্কা বাজিয়ে আজও জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে—জগতের মাঝে তার অস্তিত্ব তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে··।' [৩।২]।

ঘৃণ্য সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা বা ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে এই ধরণের আবেগময় প্রকাশ সবই আধুনিক যুগের ব্যাপার।

নাটকে সামাজিক সমস্যা, দেশাত্মবোধের আবেগ এক সঙ্গে ধরতে গিয়ে ইতিহাসের পরিমণ্ডলটি ভালভাবে ফুটে উঠতে পারেনি। তাছাড়া নাটকে যে ভাবে ভাস্কর পণ্ডিতকে চিত্রিত করা হয়েছে ইতিহাসে তার সমর্থন মেলে না।

নাটকে বর্গীর অত্যাচারের নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতকে মহানুভব করে তোলা হয়েছে। অন্য কেউ নয় অত্যাচারিত পক্ষেরই একজন [মাধুরী] তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে বলেছে: 'এমন স্নেহ-করুণ উদার হৃদয় যাঁর তিনি কি মানুষ—না স্বর্গের দেবতা।' [২।৫]। এই ভাস্কর পণ্ডিত বর্গীর অত্যাচারের মূল নায়ক হয়েও অপহৃতা বাঙালী মেয়েকে [মাধুরী] একাকী শত্রুর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি তাঁর অত্যাচারী সৈনিকদের হাত থেকে তাকে উদ্ধারের সময় ভানোজীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন: 'এই পশুগুলোকে আদেশ জানিয়েছিলে, যে কোন রমণীর বা শিশুর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করলে তার শাস্তি মৃত্যু?' [২।৫]।

কিন্তু বর্গীর অত্যাচার সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ। বর্গীর অত্যাচার সম্পর্কে সমসাময়িক কালে গঙ্গারাম যে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' রচনা করেন তাতে বলা হয়েছে :

'ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল।
বরগির ভয়ে [তারা] সব পলাইল॥
* * *
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া॥
কারও হাত কাটে কারও কাটে নাক কান।
একই চোটে কারও বধয়ে পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া যায়।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বান্ধি দেয় তার গলায়॥
এক জনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভরে [তারা] ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে যত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগি গ্রামে সাধায়।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুন লাগায়।'

['সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৩, পৃঃ ২২৩-২৪]। এই ধরনের অত্যাচারের নায়ককে "মহানুভব" ক'রে তোলা, সমর্থন করা যায় না। ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যা প্রসঙ্গটি অবশ্য নাট্যকারের কল্পনা নয়। এর সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনার মিল আছে।

ভাস্কর পণ্ডিতের চরিত্র নাট্যকার যে ভাবে রূপায়িত করেছেন তার পেছনে দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত যে শিবাজীর শৌর্য বীর্যের কাহিনী বাঙালীকে মুগ্ধ করেছিল সেই শিবাজীর মর্যাদায় ভাস্কর পণ্ডিতকে নাট্যকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয়ত কাহিনীতে নাটকীয় গুণ আরোপ করার জন্য 'মানুষ ভাস্কর'-এর কাছ থেকে কন্যা গৌরীকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে 'প্রেত ভাস্কর'-এ পরিণত করা হয়েছে : "প্রতিশোধ! ভাস্কর পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গেছে—মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে—মানুষ ভাস্কর ম'রে গিয়ে প্রেত-ভাস্করে পরিণত হয়েছে। এতদিন বাঙলার উপর দিয়ে মানুষ ভাস্কর বিচরণ করেছে—তাই

রমণীর সম্মান অক্ষুন্ন ছিল – আজ গৌরীর শ্মশানের উপর প্রেত-ভাস্কর নৃত্য করবে।" [২।৮]

নাটকের মূল চরিত্রে এই দ্বন্দ্ব নাটকের ঘটনাবলী রূপায়ণে সাহায্য করেছে সত্যি, কিন্তু ইতিহাস বিকৃত হয়েছে। নারী হরণ, চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড প্রভৃতির ফলে নাটকটি জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এই জনপ্রিয়তার মূলে অন্যতম যে চরিত্র ভাস্কর পণ্ডিত তা ভাবাবেগের কাছে ছাড়পত্র পেলেও ইতিহাস কোনও অবস্থাতেই ছাড়পত্র দেবে না।

'বঙ্গেবর্গী'র পর এ যুগের যে ঐতিহাসিক নাটকটির নাম করতে হয় সেটি যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী'। ১৯২৪-এ যে যোগেশচন্দ্র শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নির্দেশে ভবভূতির অনুসরণে 'সীতা' নাটক রচনা করেন, তিনিই 'দিগ্বিজয়ীর' রচয়িতা।

॥ দিগ্বিজয়ী ॥ আমরা বরদা প্রসন্নের 'নাদির শাহ' নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে, কি ভাবে নাট্যকার ঐতিহাসিক নাদিরকে একটি 'প্রহেলিকা' করে তুলেছিলেন। বরদাপ্রসন্নের পর ঐ নাদির শাহকে নিয়ে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী যখন 'দিগ্বিজয়ী' নাটক [১৯২৮] রচনা করেন তখন তিনিও বরদা প্রসন্নের প্রভাব কাটাতে পারলেন না।

নাটকের ভূমিকায় [নিবেদন] যোগেশচন্দ্র লিখেছেন—"নাটকের অনেক চরিত্র এবং দৃশ্য ঐতিহাসিক। কোনও স্থলেই আমি ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুন্ন করি নাই, এবং নাটকের বাহিরের ঐতিহাসিক রূপটিকেও অবহেলা করি নাই।" কিন্তু নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, 'দিগ্বিজয়ী নাটকখানি ঐতিহাসিক হইলেও ইহার মূল ভাবটি চিরন্তন; সেইজন্য ইহার কোনও ঐতিহাসিক নাম দিলাম না।' এই 'চিরন্তন মূল ভাবটি' [অর্থাৎ 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'] নাটকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে নাট্যকার যেখানেই কল্পনার রশিকে আলগা করেছেন সেখানেই তা ইতিহাসের পরিধি অতিক্রম করে গেছে।

নাট্যকার ভূমিকায় বলেছেন – "যাহারা স্কুলপাঠ্য ভারত-ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁদের চক্ষে নাদিরশাহ শুধু নরহন্তা দস্যু মাত্র।" স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের এই ত্রুটি দূর করতে গিয়ে নাট্যকার নাদিরের যে জীবন-দর্শন কল্পনা করেছেন তার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের সমন্বয় ঘটাতে পারেননি।

নাদিরশাহের দিগ্বিজয়ের কাহিনীই এ নাটকে স্থান পেয়েছে এবং দিল্লীতে

তিনি যে অবাধ নরহত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়েছিলেন তাই নাটকের প্রধান উপজীব্য। নাটকটির আকর গ্রন্থ হিসাবে Sir Motimer Durand-এর গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে 'নিবেদন'-এ। এই বইটিও ইতিহাস ও কিম্বদন্তী মিশিয়েই রচনা করা হয়েছিল। তা ছাড়া নাদির সম্পর্কিত তত্ত্বকথা নাট্যকারের নিজের ভাবকল্পনার সৃষ্টি। তার ফলে নাটকের একাধিক জায়গায় কালাতিক্রমী প্রক্ষেপ ঘটেছে। যেমন দিল্লীতে নাদিরের অত্যাচার দৃশ্যে পরিকল্পিত উন্মাদিনী রমণী চরিত্র। নাদির তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিয়েছে :

> 'আমি শুধু রাজপুতের নই, আমি মহারাষ্ট্রের, আমি কান্যকুব্জের, আমি গুর্জরের, সৌরাষ্ট্রের, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের আমি মিলিত ভারতের নারী আত্মা [চতুর্থ অঙ্ক]।

অথবা :

> 'আমি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ক্রেস্তান [।] ভারতের সর্বধর্মের সর্বমানবতার অভিশাপময় বাণীমূর্তি।' [চতুর্থ অঙ্ক]।

এই সর্বভারতীয়ত্ব বোধ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের হতে পারে না, এটা নাট্যকারের সমসাময়িক যুগের কথা।

ইতিহাসের ঘটনার আলোকে বা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নাট্যকার নাদির চরিত্র অঙ্কন করেন নি। তিনি নাদিরের ওপর অতিমানবত্ব আরোপ করেছেন। তার ফলে নাটক হয়েছে রোমান্টিক এবং নাদির চরিত্র হয়েছে রহস্যময়। রহমত খাঁকে দিয়ে নাট্যকার প্রশ্ন করিয়েছেন : 'আপনার বীরত্বে সমগ্র ইরাণ মুগ্ধ—ঔদার্যে বিস্মিত—নিষ্ঠুরতায় স্তম্ভিত। আপনি বিচিত্র—অর্থহীন—রহস্যময়। * * * আপনি রাজা না পয়গম্বর—না ঈশ্বর স্বয়ং? * * * হে ভয়ঙ্কর, আপনি কে, অথচ আপনার আকর্ষণ অসামান্য।' নাদিরের উত্তর : 'আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি—জগতের শক্তিদাতা। * * * যে মানুষের সামান্য ত্রুটীও ক্ষমা করে না—সেই ক্ষমাহীন, দয়াহীন বিচারক ঈশ্বর আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—পাপীর দণ্ডবিধান করতে।' [পঞ্চম অঙ্ক]

নাট্যকার নাদিরে জীবনের এই তত্ত্বকথাকেই প্রাধান্য দিয়ে নাটকে বলেছেন : 'নাদিরের জীবনের যে তত্ত্বকথা [philosophy] আমি নাটকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি তা ইতিহাস বিরোধী নয়।' কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন যে, তত্ত্বকথাকে অতিমানব-রহস্যে মণ্ডিত করতে গিয়ে তিনি বাস্তব ইতিহাসকে অতিক্রম করে গেছেন।

নাদির চরিত্রের ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ণ না করেও তাঁকে নিয়ে সার্থক ট্র্যাজেডী রচনা করা সম্ভব। কারণ, যে নাদির দেশের মুক্তিদাতারূপে বন্দিত হয়েছিলেন তিনিই একদিন তাঁরই দেশবাসীর হাতে, অনুগত বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর হাতে নিহত হন। কিন্তু কাহিনীকে এই সহজ পথে গ্রহণ না করে নাট্যকার ঐতিহাসিক নাদিরের সঙ্গে অতিমানব নাদিরকে মেলাতে চেষ্টা করেন। নাটকে ট্র্যাজিক রসের প্রতি নাট্যকার পাঠকদের বা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের যথেষ্টই চেষ্টা করেছেন। নাটকের সালে বেগ চরিত্রটির মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে: 'পৃথিবীতে অনেক প্রতিভা পথ হারা হয়ে নভঃস্খলিত জ্যোতিষ্কের মত কোথায় ঘুর্ণিপাকের অন্ধকারে ডুবে গেছে, না হয় আর একটা যাবে।" [৩য় অঙ্ক]

অথবা এই সালে বেগ-এরই আর একটি উক্তি: 'ঈশ্বর তাকে শক্তি দিয়েছিলেন অনন্ত, কিন্তু সে-শক্তির সদ্‌ব্যবহার সে করেনি।' [পঞ্চম অঙ্ক]।

প্রথম অঙ্কে জ্যোতিষীর মুখ দিয়েও নাদিরের পতনের সম্ভাব্য কারণ বলা হয়েছে, আবার তৃতীয় অঙ্কে জনৈকা রমণীর অভিশাপের মধ্য দিয়েও নাদিরের ট্যাজেডীর স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে: 'স্ত্রীপুত্র কন্যা পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে—নিখিল সংসার বিষাক্ত হবে···তোমার সিংহাসন বিষাক্ত হবে—প্রজা বিষাক্ত হবে—হারেম বিষাক্ত হবে।'

শক্তির অপব্যবহার করে নাদির সবাইকেই শত্রু করে তোলেন এবং তাঁর পতন ঘটে—এই হচ্ছে নাট্যকারের ট্র্যাজিক পরিকল্পনা। খাঁটী ট্র্যাজেডীর মতই বাইরের দ্বন্দ্বের সঙ্গে পুত্র, হারেম ওপ্রজা—এই তিনের সঙ্গেতাঁর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বও গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে কোনও বিষয়ে হৃদয়ে ঐকান্তিকতা থাকলেই হৃদয়ে আঘাত আসে। নাদিরের মধ্যে প্রেম, ভালবাসা কোনও ব্যাপারেই ঐকান্তিকতা নেই। তাই শুধু মাত্র আকস্মিক হৃদয় বিস্ফোরণে ট্র্যাজিক সংবিত সৃষ্টি হয়নি। 'নাটকের যিনি নায়ক সেই নাদির শাহের মতি-গতিতে ঐকান্তিকতা বাস্তবিকতা ও গভীরতা অপেক্ষা, অতিনাট্যিক অস্থিরতা, ভঙ্গীসর্বস্বতা এবং কৌতুহলজনক প্রদর্শন প্রবণতা—এক কথায় কৃত্রিমতা ফুটিয়া ওঠায়, ট্র্যাজিক চরিত্র হিসাবে তাঁর গাম্ভীর্য ব্যাহত হইয়া গিয়াছে।' [সাধনকুমার ভট্টাচার্য: 'নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার', চতুর্থ খণ্ড]।

আর শুধু তাই নয়, নাটকটি বেশ মেলোড্রামা লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে এবং এই মেলোড্রামাটিক ব্যাপার নাদিরের জীবনেই ছিল। এটা ঐতিহাসিকদেরও দৃষ্টি এড়ায়নি।[৩]

'বঙ্গে বর্গী', 'দিগ্বিজয়ী', 'আলমগীর' প্রভৃতি নাটকের এবং সেই সঙ্গে 'সীতা'র মত পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে যখন মঞ্চ জমজমাট, তখন সম্পূর্ণ নূতন রীতিতে পৌরাণিক নাটক রচনা করলেন মন্মথ রায়।

: পৌরাণিক নাটকের আবরণে সমসাময়িক চিন্তা :

নতুন ধরণের যে পৌরাণিক নাটকটি এই সময় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো তার নাম 'কারাগার'। সেটা ১৯৩০-এর কথা, এই বছরই নাটকটি রচিত হয়।

মন্মথ রায়ের প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক 'দেবাসুর'। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯২৮-এ। ১৯২৭-এর শেষ ভাগ থেকেই ভারতের জাতীয় আন্দোলন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজের দাবী, 'সাইমন কমিশনে'র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, চতুর্দিকে হরতাল ও বিক্ষোভ, জননেতাদের উপর লাঠি চার্জ, বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর গুলীতে লাহোরের পুলিশ সুপার মিঃ স্যানডার্স-এর মৃত্যু—এই সমস্ত ঘটনায় স্বাধীনতা সংগ্রাম রীতিমত তুঙ্গে উঠেছিল। ঠিক এই সময়ই রচিত হয় 'দেবাসুর' নাটক।

নাট্যকার বলেছেন: 'ঋগ্বেদে দেবাসুর সংগ্রামের যে সুপ্রচুর ইঙ্গিত রয়েছে তারই ভিত্তিতে'[৪] নাটকটি পরিকল্পিত। দীর্ঘ এক নদীপ্রান্তে বন্দী দেবগণ। নদী স্নানার্থী দধীচির কাছে বৃত্রাসুর মুক্তিপণ নির্ধারণ করলো এই বলে: 'ঐ পৌলমী যে দেবতার মুক্তি চেয়ে তাঁর নাম উচ্চারণ করবেন, তিনি যদি আপনি যতটুকু সময় নদীতে ডুব দিয়ে থাকবেন, সেই সময়টুকুর মধ্যে ঐ সেতুপথে নদীর পরপারে চলে যেতে পারেন, মুক্ত হবেন তিনি। আপনি ডুব দিয়ে ওঠার পর আমাদের এ পারে যে দেবতাকে পাব তৎক্ষণাৎ তাঁকে হত্যা করবো তা সে ইন্দ্রই হোন আর যেই হোন। এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

দধীচি রাজী হলেন। জলে নামতে নামতে বললেন: "আমি ডুব দিলাম শচী। তুমি নাম উচ্চারণ কর, যদি পার অন্ততঃ একজন দেবতারও জীবন রক্ষা কর। আজ না হয় এক যুগ পরে সেই দেবতার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার হতে দেবভূমিকে রক্ষা করে দেবভূমির শৃঙ্খল পাশ ছিন্ন করবে—সেই,

আশাতে আমি ডুব দিলাম···আমার জাতি অক্ষয় হোক—আমার জাতি অমর হোক ··আমার জাতি জয়লাভ করুক।'

দধীচি সেই যে ডুব দিলেন আর উঠলেন না। তার ফলে সব দেবতাই একে একে পারে চলে গেলেন। দেবতারা রক্ষা পেলেন এবং দধীচির অস্থি থেকে নির্মিত বজ্র-অস্ত্রেই দেবরাজ ইন্দ্র বধ করলেন বৃত্রাসুরকে। দেবতারা স্বাধীনতা ফিরে পেলেন।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে মন্মথ রায় তাঁর সমসাময়িক যুগের কথাই বলতে চেয়েছেন। সেই সময় সোজাসুজি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করতে না পেরে আমরা দেখেছি সংবাদপত্রের প্রবন্ধে পর্যন্ত বিদেশী শাসকদের অসুর কল্পনা করা হয়েছে। অসুরনাশিনীদুর্গা ও কালী হয়ে উঠেছেন ভারত মাতা। দেবাসুরের সংগ্রামচিত্র ভারতীয় ও ইংরেজের সংগ্রামের রূপকেই পরিকল্পিত, যদিও কাহিনীটা ঋগ্বেদের। দধীচি এক্ষেত্রে গান্ধীজী।

মন্মথ রায়ের 'কারাগার'ও [১৯৩০] একই ভাবে পরিকল্পিত। নাট্যকারের ভাষায়: 'তখন সমগ্র ভারতে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন।· জেলে চলো...ভরতি কর জেল—এই তখন জাতীয় ধ্বনি। কংসের অত্যাচারে জর্জরিত যাদবগণ ও পরিত্রাতা ভগবানের আবির্ভাব হবে কারাগারে, এই জলন্ত বিশ্বাসে দলে দলে চললো সেই মহাতীর্থে—কংস কারাগারে।'

শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে 'কারাগার' নাটকটি রচিত। রাজা কংস নির্মম অত্যাচারে যাদবকুলকে যখন নিপীড়ন করছিলেন. তখন সেই নিপীড়িত বান্ধবদের আকুল প্রার্থনায় তাদের পরিত্রাণের জন্য ভগবান দুর্বৃত্ত কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করলেন শত্রু নিধনের জন্যে অধর্ম প্লাবিত পৃথিবীতে ধর্মস্থাপনের জন্যে এবং দুর্বৃত্ত কংসকে নিধন করে শান্তি স্থাপনের জন্যে।

নাটকটির বিন্যাসে পৌরাণিক নাটকের বৈশিষ্ট্য পুরাপুরি আছে, অর্থাৎ দেবশক্তির সঙ্গে দানবশক্তির সংগ্রাম এবং পরিণামে দেবশক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও পরাধীনজাতির মুক্তির আবেগ এই নাটকে সঞ্চারিত হয়েছে। ইংরেজ শাসিত গোটা ভারতবর্ষই তো কারাগার এবং সেই ভারতের শৃঙ্খলিত সন্তান বাসুদেব, দেবকী, কঙ্ক, করুণা প্রভৃতি। অন্যদিকে কংস অত্যাচারী বৃটীশ রাজশক্তির প্রতীক।' সংগ্রামী

জনসাধারণের নায়ক বাসুদেবের অহিংস সংগ্রাম মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। ভারতের ভাগ্যবিধাতা কৃষ্ণ এবং তারই উদ্বোধনের জন্যে নিপীড়িত জনগণের আর্তকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে : 'ভগবন জাগৃহি।'

সংলাপে এবং গানে[৫] নিপীড়িত ও নির্যাচিত মানবাত্মার বেদনা যেমন পরিস্ফুট তেমনি পরিস্ফুট মুক্তিকামী জনসাধারণের জন্য অভয় মন্ত্র :

'নাহি ভয় নাহি ভয়
মৃত্যু সাগরে মন্থন শেষ, আসে মৃত্যুঞ্জয়॥
হত্যায় আসে হত্যা নাশন,
শৃঙ্খলে তার মুক্তি-ভাষণ
অন্ধকারায় তমো-বিদারণ
জাগিছে জ্যোতির্ময়॥
দলিত হৃদয় শতদলে তাঁর
আঁখিজল-ঘেরা আসন বিথার।
ব্যথাবিহারীরে দেখিবি কে আয়
ধ্বংসের মাঝে শঙ্খ বাজায়
নিখিলের হৃদি-রক্ত-আভায়
নবীন অভ্যুদয়॥' [ধরিত্রীর গান, ৪।৪]

পৌরাণিক নাটকের ছদ্মাবরণে এই দেশাত্মবোধক নাটকটির তাৎপর্য অনুধাবন করতে তখনকার রাজপুরুষেরা ভুল করেন নি। অষ্টাদশ অভিনয়ের পরই ১৯৩১-এর ১লা ফেব্রুয়ারী নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয় ১৮৭৬-এর Dramatic Performances Act অনুসারে। কারণ বৃটীশ রাজপুরুষদের মতে এই নাটক 'is likely to excite feelings of disaffection towards the government established by law in British India,' তদানীন্তন বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য আইনবিদ ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের এক প্রশ্নের উত্তরে বাংলা কাউন্সিলের ১৯৩১-এর মার্চ অধিবেশনে হোম মেম্বর মিঃ W.D.R. Prentice বলেছিলেন : 'The Government had prohibited the further performances of the mythological play 'Karagar' as it was likely to exercise feelings of disaffection towards Government. The play ostensibly did not relate to present day

politics, but actually its bearing on present day politics was beyond doubt ?' [The 'Advance', 6.3.31]

'কারাগার' নাটকের ওপর সরকারী আক্রমণের বিরুদ্ধে সে যুগের সংবাদ-পত্রগুলি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলো। Amrita Bazar Patrika লিখেছিল : 'If germs of sedition can be discovered in this book then we believe very little in the ancient Epics and Purans of the Hindus can be considered safe by the authorities……It is then the belief of the censoring authorities in Bengal that loyalty can be preserved in the mind of people in this twentieth century by excluding from it all that is great and noble."

[11. 2. 1931]

আনন্দবাজার পত্রিকা [৯/২/১৯৩১] মন্তব্য করেছিল: "বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের কর্তারা ইহার অভিনয়ে এমন কি আপত্তির কারণ দেখিতে পাইলেন ? অথবা দ্বাপর যুগের কারাগারের সঙ্গে এই কলিযুগের কারাগারের সাদৃশ্য অনুভব করিয়াই কি তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্থ হইয়া উঠিয়াছেন ?"

সরকার অবশ্য এই সব প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেন নি। নাটকটি নিষিদ্ধ হবার প্রায় ছ-মাস পরে তদানীন্তন সরকারের মতে আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দিয়ে ৮ আগষ্ট, ১৯৩১ নাট্য-নিকেতনে অভিনীত হয়।

: মন্মথ রায়ের ঐতিহাসিক নাটক :

মন্মথ রায় তাঁর এই সব পৌরাণিক নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটকও এই সময় রচনা করেন। এগুলি হচ্ছে 'খনা' [১৯৩২], 'অশোক' [১৯৩৩] এবং 'মীরকাশিম' [১৯৩৮]।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি অশোকের জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করে 'অশোক' নাটকটি রচিত হয়েছে। অশোকের জীবনের পরিচিত বিষয় ধর্মপ্রবৃত্তি ও চণ্ডপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব এই নাটকের মূল উপজীব্য। এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ধর্ম প্রবৃত্তিরই জয় হয়েছে। অশোকের জীবন নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষও নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু সেই নাটক অলৌকিকতায় ভারাক্রান্ত এবং তাত্বিক বক্তৃতায় কণ্টকিত। কিন্তু মন্মথ রায় তাঁর নাটকে ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। তিনি অশোকের মানবিক পরিচয়টাই উদ্‌ঘাটনের দিকে

জোর দিয়েছেন। তার ফলে নাটকটি বাস্তব ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপরে দাঁড়াতে পেরেছে।

প্রথমে যিনি ছদ্ম আবরণে পৌরাণিক নাটক সুরু করে ছিলেন, তিনিই পরে বাংলা ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় অবলম্বনে ঐতিহাসিক নাটক রচনা করলেন। ১৯৩৮-এ রচিত এই নাটকখানির নাম 'মীরকাশিম।' অনেক পরে অবশ্য মন্মথ রায় 'সিপাহী বিদ্রোহ'-এর কাহিনী নিয়েও একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। মীরকাশিম নাটকটি সেন্সর না করে সরকার অভিনীত হতে দেননি। সেন্সর-এ ক্ষত-বিক্ষত হলেও নাটকটির মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করার মত অনেক কিছুই আছে।

এই নাটকটিতেও নাট্যকার মন্মথ রায় ইতিহাসকে সততার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। নাটকের ভূমিকায় আকর গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করে নাট্যকার লিখেছেন: 'বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে মীরকাশিমের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে এবং এ নাটকে ইতিহাস বিকৃত করা হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।'

বিশ্বাসঘাতক এবং দুরভিসন্ধিপরায়ণ এক দালালের চাতুর্যে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ প্রভুত্ব পাকাপাকি হয়ে যায় নবাব মীরকাশিমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে। বাংলার এই শেষ ও স্বাধীন নবাব স্বাধীনতার দীপশিখাটি প্রজ্বলিত রাখার শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ এবং স্বার্থান্বেষীরা তাঁর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। ইতিহাসের এই মর্মান্তিক কাহিনী মন্মথ রায় বিবৃত করেছেন তাঁর 'মীরকাশিম' নাটকে।

মীরকাশিমের চার বছর নবাবীর মধ্যে প্রায় তিন বছর স্বাধীনভাবে বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তিনি যখনই স্বাধীন নবাবের মত আচরণ করতে চেষ্টা করলেন তখনই ইংরেজের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো। গোলামী অথবা নবাবী—এর মধ্যে শেষেরটাই তিনি বেছে নিলেন। সুরু হলো সংঘর্ষ। একটি নয়, একটির পর একটি সংঘর্ষ। আর এই সংঘর্ষে সেনানায়কদের বিশ্বাসঘাতকতা, সে যুগে যাদের অর্থ নবাব উজীর সৃষ্টি করিত, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, উপর্যুপরি পরাজয়, অপরের আশ্রয়ে বাস এবং অপরের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ এই অবস্থার মধ্যে কারও পক্ষই স্বাভাবিক বা স্থির ভাবে কাজ করা সম্ভব নয়।

ইতিহাসের এই সব ঘটনা যেমন দ্রুত একটির পর একটি এসেছে, নাটকেও তেমনি ঘটনা অতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। বাইরের ঘটনা মীরকাশিমের

অন্তর্দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তুলেছে। তাই ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করেও সার্থক নাটক রচিত হতে পেরেছে। নাটকে ভীড় করেছে বহু চরিত্র ; কিন্তু মীরকাশিম তাদের মধ্যে মোটেই হারিয়ে যান নি। তাঁর মৃত্যুকালীন ঘোষণা পরাধীন ভারতবাসীর সামনে করুণ আবেদন এনে দিয়েছে: 'পলাশীর প্রাঙ্গণ যে রক্তে রাঙা হয়েছে—সে-রক্তে সারা বাংলা লাল হয়ে গেল—সেই রক্তের বন্যা ধেয়ে আসছে, সারা ভারত লালে লাল হয়ে গেল…'

নাটকে মীরকাশিমের মৃত্যু দৃশ্য অতর্কিতে এসেছে। মীরকাশিমের মৃত্যু সম্পর্কে এখনও ঐতিহাসিকেরা একমত নন। তবে অতি দীন অবস্থায় দিল্লীতে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল, এটা মোটামুটি ভাবে সবাই বলেছেন। নাট্যকারও সেই-ভাবেই মৃত্যু দৃশ্য রচনা করেছেন।

: শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটক :

অসহযোগ আন্দোলনের যুগে আর একজন নাট্যকার দেশাত্মবোধক নাটক লিখতে আরম্ভ করেন—ইনি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ইনিও স্বদেশী যুগের নাট্যকারদের মতই দেশাত্মবোধক নাটক রচনার জন্য ঐতিহাসিক কাহিনীই বেছে নিয়েছিলেন এবং সমসাময়িক ভাবাবেগের ওপরে দাঁড়িয়েই ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। তবুও তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন স্বদেশী যুগের নাটকের সঙ্গে এই যুগের নাটকের পার্থক্য কোথায়। তাঁর ভাষায়: "স্বদেশী যুগের 'ছত্রপতি শিবাজী', 'সিরাজদ্দৌল্লা' 'মীরকাশিম', 'প্রতাপাদিত্য' আর স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনের 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'মীরকাশিম', 'বাংলার প্রতাপ' তুলনা করলে দুই যুগের নাট্যকারদের দৃষ্টিকোণের পার্থক্য উপলব্ধি হবে। পরবর্তী নাটকে একটা সংগঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যা পূর্ববর্তীদের নাটকে পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। আরো একটা পার্থক্য স্পষ্ট দেখা যাবে। তা হচ্ছে দেশ-প্রেমকে, স্বাধীনতা-প্রীতিকে উদীয়মান তরুণ তরুণীর প্রেমের ও স্বাধীনতা প্রীতির সঙ্গে এক করবার চেষ্টা করা হয়েছে।…দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে, স্বদেশ-প্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতি ব্যাহত হলে ব্যক্তিগত প্রেম ও প্রীতি পরিপূর্ণতা লাভ করে না।" ['বাংলার নাটক ও নাট্যশালা', কলিকাতা (১৩৬৪), পৃঃ ৩৪-৩৫]

১৯৩০-এ মন্মথ রায় যখন 'কারাগার' নাটক রচনা করেন, ঠিক সেই বৎসরই

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' রচিত হয়। মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীর গৌরবময় উত্থান এই নাটকের বিষয়বস্তু।

॥ গৈরিক পতাকা ॥ গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে যে বালগঙ্গাধর তিলক মারাঠী যুবকদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গণপতির [গণেশ] উৎসব ও জাতীয় বীর শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসবের প্রচলন করেন এবং তিলেকের দ্বারা শিবাজী উৎসবের প্রবর্তনের ছয় বছর পরে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় বাংলায় শিবাজী-উৎসবের আন্দোলন সৃষ্টি করেন সখারাম গণেশ দেউস্কর[৬] এবং বাংলার সে-যুগের চরমপন্থীরা শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন। তাই স্বাধীনতাকামী বাঙালীর কাছে শিবাজীকে শচীন্দ্রনাথ হঠাৎ উপস্থিত করেন নি। নাট্যকার একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে কিভাবে ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং উদার বীরত্বের মধ্য দিয়ে সার্থক করে তোলা যায় তার এক সার্থক চিত্র অঙ্কন করেছেন 'গৈরিক পতাকা' নাটকে। তাঁর নাটকের পটভূমি মোগল ও মারাঠা সংঘর্ষ হলেও এই নাটকে তিনি বিশ শতকের প্রথম যুগের দেশাত্মবোধের আদর্শকে রূপদান করেছেন। 'জাতিগঠনের প্রয়াসের কথা মনে রাখিয়া' নাটকটি উৎসর্গও করা হয়েছিল সে যুগের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশে।

নাট্যকার নাটকের 'নিবেদন'-এ বলেছেন : 'মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতি আজ তরুণ বাঙালীর প্রাণে যে প্রেরণা এনে দেয় তা-ই অবলম্বন করে আমি 'গৌরিক পতাকা' রচনা করলুম। ইতিহাস থেকে এর উপাদান নিয়েছি, ঐতিহাসিক ঘটনাও সংস্থাপন করেছি—কিন্তু বাধ্য হয়ে ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীদের সকল নাম গ্রহণ করতে পারিনি—কল্পিত চরিত্রের অবতারণাও করেছি'।

নাটকটি সুরু হয়েছে ভবানী মন্দিরের দৃশ্য দিয়ে। শিবাজী এই ভবানী দেবীর ভক্ত ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সে বঙ্গভঙ্গ যুগের চরমপন্থী স্বাদেশিকদের বিশেষভাবে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে যে শিবাজী উৎসব নিষ্পন্ন হয় সেই উৎসবের অঙ্গরূপে ভবানীপূজা হয়েছিল [১৯০৬, জুন] স্বাদেশিকতার সঙ্গে গীতা, কালী প্রভৃতি মিশিয়ে 'ভবানী মন্দির'-এর অপূর্ব এক পরিকল্পনা বিপ্লবীরা বাংলায় আনেন। শচীন সেনগুপ্তের নাটকে প্রথম দৃশ্য দেখে এটা অনুমান করা কঠিন নয় যে, সেই স্মৃতি তাঁর মধ্যে ভালভাবেই

কাজ করেছিল। সেই সঙ্গে নাট্যকার সে যুগের গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন।

শিবাজীকে ঘিরে হিন্দু পুনরুত্থানের যে স্বপ্ন সে যুগে অনেকের মনে জেগেছিল, নাট্যকার তা থেকে মুক্ত নন। শিবাজী বলেছেন: 'হিন্দু জাতিকে, মানব-সভ্যতার বিশিষ্ট একটি ধারাকে সঞ্জীবিত, অব্যাহত রাখার জন্য আমি চাই সম্পদ, আমি চাই শক্তি, আমি চাই প্রভুত্ব।' [১।১]

যদিও শিবাজী বলেছেন: 'আমি জানি দরিদ্র প্রজা, হিন্দুই হোক, আর মুসলমানই হোক রাজ অত্যাচার সমানেই তাদের সইতে হয়', এবং বিজাপুরের নির্যাতিত মুসলমান প্রজাদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, তবুও বলবো, শিবাজীর উদারতা প্রদর্শনের জন্যই এটা করা হয়েছে। সে যুগে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল। সে যুগে হিন্দু এবং মুসলমান হিসাবে দুই পক্ষকে মুখোমুখী সংঘর্ষে দাঁড় করানোর ফলে কিছু ক্ষতিই হয়েছে।

অবশ্য নাটকের মূল সুর দেশাত্মবোধক এবং সংলাপে ও গানের মধ্য দিয়ে সেই দেশাত্মবোধের সুর প্রতিধ্বনিত। যেমন: 'দেশের জন্যে মরে মরে আমরা দেশকে শ্মশান করে রেখে যাব, আর তোরা, ওরে নবীন মারহাঠা, তোরাই সেই শ্মশানে নন্দন-কানন রচনা করবি'—শিবাজী [৫।৫]

অথবা:

> 'সোনার ভারত, তরুণ ভারত। জয়তী আঁচলে
> থেক না ঢাকা,
> গৌরবে হের, গৈরিকে ওড়ে যৌবনেরই জয় পতাকা।
> মহামানবের এ মহাসাগরে মহাভারতের আরতি চাই,
> জাতি চলে আজি নব মনোরথে যৌবনে ক'রে সারথী ভাই.
> জয় জয় জয় যুবক-ভারত। যুবরাজ তব নবীন প্রাণ,
> যুগে যুগে গাহো নব-নব সুরে, ভুবন ভোলান অমর গান।"...[৫।৫]

শিবাজীর উন্নত চরিত্র, তাঁর বীরত্ব, তাঁর উদারতা, নারীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা—এ সব কিছুকে নাট্যকার উপস্থিত করেছেন এই নাটকে। এত ঘটনাবলী আবর্তিত হয়েছে। ঘোড়পুরের চরিত্র নাটকের কাহিনীকে জটিল করে তুলেছে। কিন্তু রণরাও এবং বীরাবাঈ-এর কাহিনী অতি-নাটকীয়তার দোষে দুষ্ট।

॥ সিরাজদ্দৌলা ॥ গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' রচনার ৩৩ বছর পরে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক [১৯৩৮] রচনা করেন। দুটি

নাটকেরই উদ্দেশ্য ছিল দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা। তবে দুজনের নাটক রচনার সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশ এক রকম ছিল না। গিরিশচন্দ্রের ক্ষেত্রে ছিল বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের যুগ,—যখন সবে স্বদেশী অন্দোলন সুরু হয়েছে। অন্যদিকে শচীন সেনগুপ্তের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, তিনি নাটক লিখেছিলেন এমন যুগে যে যুগে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে, গণ আন্দোলনের একাধিক জোয়ার দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বে একটি মহাযুদ্ধ শেষে আর একটি মহাযুদ্ধে আলোড়িত হবার প্রস্তুতি চলছে।

এই আবহাওয়ার মধ্যে শচীন্দ্রনাথ নাটক রচনা সুরু করেন। আধুনিক মঞ্চ ব্যবস্থার অনুকূল ছিল তাঁর নাটকগুলি—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি নিজে আগের যুগের ও তাঁর নিজের যুগের নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গির যে পার্থক্যের কথা বলেছেন সেই পার্থক্য খুব স্পষ্ট হয়ে তাঁর নাটকে ধরা পড়েনি। তাঁর সিরাজদ্দৌলা নাটক গিরিশচন্দ্রের প্রভাব মুক্ত নয়। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা নাটকের কামিনীকান্ত ওরফে করিম চাচার মত শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলাতেও পুরন্দর ওরফে গোলাম হোসেন রয়েছে। এই গোলাম হোসেনের পোষাক পরিচ্ছদ দেখলে তাকে যতটা ভাঁড় মনে হবে, আসলে অতটা ভাঁড়ামি সে করেনি। সে নবাব সিরাজদ্দৌলার পার্শ্বচর, পরামর্শদাতা, নবাবের সুখ-দুঃখের অংশভাগী—নবাব প্রাসাদ থেকে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত তার অবাধ গতি। আর একটি চরিত্র আলেয়া। গিরিশচন্দ্র 'মীরকাশিম' নাটকে উদাসিনী তারাকে এনেছেন, শচীন্দ্রনাথ 'সিরাজদ্দৌলা'য় এনেছেন আলেয়াকে। তবে আলেয়া ঠিক তারার মত চরিণী ধরণের চরিত্র নয়—অর্থাৎ দেশাত্মবোধের বক্তৃতা দিয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে না। তবে 'সমাজ-পরিত্যক্তা সামান্য এক নর্তকী' সে নয়। আলেয়ারও গতিবিধি সর্বত্র—যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত। সে নবাবকে ভালবাসে, নবাবের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করে, পরাজিত নবাবের পলায়নে সাহায্য করে। সে মোহনলালের ভগ্নি। এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণ তার গান। তবে সে গানগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শেষের দিকে তার গান কারুণ্যকে বাড়িয়ে তুলেছে।

গিরিশচন্দ্রের নাটক আরম্ভ হয়েছে ষড়যন্ত্রকারীদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে; শচীন্দ্রনাথের নাটক আরম্ভ হয়েছে সিরাজের এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে। শচীন্দ্রনাথ সিরাজের হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই নাটক শেষ করেছেন, ইংরেজ

পক্ষীয় কোনও চরিত্রের মহত্ত্ব ও উদারতা প্রদর্শনের সুযোগ তিনি দেননি। কিন্তু তবুও বলবো এই নাটকটিতেও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা সৃষ্টির অবকাশ ছিল তার সদ্ব্যবহার করা হয়নি। এরও কারণ গিরিশচন্দ্রের মতই শচীন্দ্রনাথও মীরজাফরের সতের বছরের পুত্র মীরণকেই সিরাজের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করেছেন।

সিরাজদ্দৌলাকে যে রাত্রে হত্যা করা হয় সে রাত্রে কর্নেল ক্লাইভ মীরজাফরের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য তাঁর সঙ্গে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থান করছিলেন। তিনি তখন সর্বেসর্বা। তাঁকে না জানিয়ে এমন কি মীরজাফরেরও অজ্ঞাতে মীরণ সিরাজদ্দৌলাকে কিভাবে হত্যা করতে পারে এ সম্পর্কে সঙ্গত কারণেই অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে: 'Sirajudowla was put to death at the instigation of the English Chiefs and Jagat Seth.' [*Rigaz-us-Salatan*] এ সম্পর্কে অক্ষয়কুমার মৈত্র যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন [সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থের অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ] সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মত শচীন্দ্রনাথও এই হত্যার ব্যাপারে অক্ষয়কুমারের মত ঐতিহাসিক প্রদত্ত তথ্যের ওপরে দাঁড়ান নি।

শচীন্দ্রনাথ যে সিরাজদ্দৌলাকে ট্র্যাজিডীর নায়ক হিসাবে এঁকেছেন তিনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ় এবং ন্যায়নিষ্ঠ, কিন্তু তাঁর উদারতাই তাঁর পতন ডেকে আনলো। তিনি নাটকের ভূমিকায় বলেছেন: 'এই চরিত্র বিশ্লেষণ করেই দেখাতে চেয়েছি, সিরাজের মত উদার স্বভাবের লোকের পক্ষে, তাঁর মত তেজস্বী, নির্ভীক সত্যাশ্রয়ী তরুণের পক্ষে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করা সম্ভবপর নয়। বয়স যদি তাঁর পরিণত হতো, কূটনীতিতে তিনি যদি পারদর্শী হতেন, তা হলে মানুষ হিসেবে ছোট হয়েও শাসক হিসেবে তিনি হয়তো বড় হতে পারতেন। সিরাজের অসহায়তা, সিরাজের পারদর্শিতা সিরাজের অন্তরের দয়া দাক্ষিণ্যই তাঁকে জীবনের শোচনীয় পরিণতির পথে ঠেলে দিয়েছিল—তাঁর অক্ষমতাও নয়, অযোগ্যতাও নয়।'

একথা সত্যি যে, সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে এক বিস্তৃত ষড়যন্ত্রজাল রচিত হয়েছিল; সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল দেশের অর্থলোভী ও ক্ষমতালোভী বিশ্বাস-ঘাতকের দল। কিন্তু তার সুযোগ গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করছিল যারা তাদের প্রতি দেশবাসীর ক্রোধ সার্থকভাবে জাগ্রত করার চেষ্টা এ নাটকে নেই। সিরাজ-হত্যার দৃশ্যে জনতাকে আনা হয়েছে এবং তাদের

সামনে দাঁড়িয়ে এ যুগের রাজনৈতিক নেতার মত সিরাজ যে বক্তৃতা দিয়েছেন. তার ভাষা একজন ব্যর্থ জননায়কের কৈফিয়তের ভাষা। সেই বক্তৃতাতেও প্রকৃত শত্রুকে চিনিয়ে দেবার ইঙ্গিত নেই। তবে এই বক্তৃতা সিরাজের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে—এটা ঠিক।

অবশ্য নাটকের মধ্যে একাধিক স্থানে এই ধরণের বক্তৃতা আছে। যে সময়ে নাটকটি লেখা হয়েছে সেই সময়ে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা যে ভাষায় বক্তৃতা করতেন সিরাজের বক্তৃতা হুবহু সেই রকম। অর্থাৎ 'হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি' এই বাংলার স্বাধীনতার জন্যে সিরাজ আহ্বান জানিয়েছেন [২।১]। এইসব বক্তৃতা প্রচণ্ড ভাবাবেগে পূর্ণ।

'গৈরিক পতাকা', সিরাজদ্দৌলা' ছাড়াও শচীন্দ্রনাথ 'আবুল হাসান', 'রাষ্ট্রবিপ্লব', 'কামাল আতাতুর্ক', 'বাংলার প্রতাপ', 'ধাত্রীপান্না' [১৯৪৪]— এই কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। সম্রাট শাজাহানের পুত্র দারার উদার ধর্মবোধের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোড়ামির সংঘাত সৃষ্টি করে 'রাষ্ট্রবিপ্লব' রচিত। তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক-এর অভ্যুত্থান এক সময়ে এ দেশেও যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। সেই আতাতুর্কের জীবন নিয়ে কামাল আতাতুর্ক রচিত। রাজপুত ইতিহাসের ধাত্রীপান্নার অপূর্ব ত্যাগের কাহিনী নিয়ে ধাত্রীপান্না রচিত।

প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে নাট্যকার 'বাংলার প্রতাপ' রচনা করেন। এই নাটকটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাট্যকার বলেছেন : 'বাংলার প্রতাপে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন-নাট্যরূপ আমি গড়ে তুলতে চাইনি। সেই কারণ তাঁর জীবনের পরিণতি পর্যন্ত আমি নাটককে টেনে নিই নি,········· প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের ওপর আমি তত জোর দিতে চাই নি, যত জোর দিতে দিয়েছি প্রতাপকে অবলম্বন ক'রে, বাংলায় বিদেশীদের উপদ্রব নিবারণ করবার যে প্রয়াস একদা রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তারই ওপর।' [নাটকের ভূমিকা] এমন কি প্রতাপ চরিত্রের ঐতিহাসিক ব্যর্থতাকে নাট্যকার গোপন করেছেন এবং এর স্বপক্ষে তাঁর বক্তব্য : 'আজকের দিনে পরাজয়ের কথা, বিফলতার কথা আমি প্রচার করতে চাই না।' [ভূমিকা]

এই ধরণের প্রচেষ্টার দ্বারা সমসাময়িক জাতীয় ভাবাবেগের তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু নাটক প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক হয়ে ওঠে না। কারণ মানুষ যেমন ইতিহাস গড়ে, তেমনি ঐতিহাসিক ঘটনার আবর্তে তার চরিত্রও

গঠিত হয়। তাই একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি দেখানো যায় না। সেই চেষ্টা করতে গিয়ে 'বাংলার প্রতাপ'-এ শচীন্দ্রনাথ ব্যর্থতাই বরণ করেছেন।

: রমেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়' :

বাংলার বার ভুঞাদের[৭] অন্যতম কেদার রায়। পাঠান রাজত্বের পতনের পর ১৫৮০-এ যে সময় সারা বাংলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল, তার আগে থেকেই চাঁদ রায় ও কেদার রায় এই দুই ভাই সুবর্ণ গ্রামের কাছে শ্রীপুরে রাজধানী স্থাপন করে প্রবল প্রতাপে শাসন দণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। এরা ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করে নৌবলের সাহায্যে সন্দ্বীপ প্রমুখ স্থান দখল করেন। দায়ুদ শাহ্-এর [পাঠান আমলের শেষ রাজা] প্রথম পরাজয়ের পর [১৫৭৫] মোগল পক্ষীয় ইতিমদ খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন সোনার গাঁও দখল করতে আসেন। সেই সন্দ্বীপ চাঁদ রায়ের হাত ছাড়া হয়ে ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পর কার্ভেলো প্রমুখ পর্তুগীজরা ঐ দ্বীপ অধিকার করে। কিন্তু পরে দ্বীপটি আরাকান রাজের দ্বারা অধিকৃত হলে [১৬০২] কার্ভেলো জীর্ণতরী নিয়ে আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে শ্রীপুর আসেন। এই সময় মানসিংহ মুক্ত রায় নামে এক সেনাপতিকে শ্রীপুর অধিকার করার জন্যে প্রেরণ করেন। পথে যে নৌযুদ্ধ হয় তাতে কেদার রায়ের পক্ষে নেতৃত্ব করেন কার্ভেলো। মুক্ত রায় যুদ্ধে নিহত হন, মানসিংহ এসে কেদার রায়কে যুদ্ধে হারিয়ে দেন। কেদার রায়ের সঙ্গে মানসিংহের এক সন্ধি হয়। কিন্তু কেদার রায় সন্ধির সর্ত মতো কর না দিয়ে আগের মতই স্বাধীন ভাবে চলতে থাকেন। এইবার কেদার রায়কে শায়েস্তা করার জন্যে মানসিংহ সেনাপতি কিলমক খাঁকে বিপুল সেনাবাহিনী সহ শ্রীপুরে পাঠান। যুদ্ধে কিলমক নিহত হন। এবার মানসিংহ স্বয়ং এসে ফতেজঙ্গপুরের যুদ্ধে কেদার রায়কে পরাজিত ও নিহত করেন। এই ভাবে পূর্ববঙ্গ অধিকার করার পর কেদার রায়ের শিলাময়ী দেবীকে মানসিংহ অম্বরে নিয়ে যান।[৮]

এই ঐতিহাসিক কাহিনীর ওপরেই রমেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়' নাটক [১৯৩৬] রচিত। নাট্যকার মোটামুটি ভাবে ইতিহাসের ঘটনার অনুসরণ করেছেন এবং তা করতে গিয়েই তিনি জাতীয়তার ভাবোদ্দীপক এই নাটকটিতে ঈশা খাঁ-সোনামণি প্রসঙ্গটি এনেছেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের

সঙ্গে ঈশা খাঁর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে দেখে তিনি রূপোন্মত্ত হন এবং চাঁদ রায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী শ্রীমন্তকে হস্তগত করে সোনামণিকে অপহরণ করে নিয়ে বিবাহ করেন।[৯] এই অপমানে চাঁদ রায় প্রাণ ত্যাগ করেন এবং কেদার রায়ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে আজীবন হৃদয়ে বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জলিত রেখেছিলেন।

নাটকের মূল ঘটনা কেদার রায়ের সঙ্গে মোগল শক্তির সংঘাত। সেই সংঘাতকে অবলম্বন করে হিন্দু জাতীয়তাবাদ তুলে ধরা হয়েছে। ক্ষীরোদ-প্রসাদের প্রতাপাদিত্য আর কেদার রায়ের মধ্যে শুধু এই দিক থেকে নয় অন্য দিক থেকেও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

চাঁদ রায়ের সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের এবং রডার সঙ্গে কার্ভেলোর ভূমিকার মিল সহজেই চোখে পড়ে। তা ছাড়া প্রতাপাদিত্য নাটকের ভবানন্দ মজুমদারের ভূমিকা নিয়েছে শ্রীমন্ত।[১০] দেশ প্রেমিক আর দেশদ্রোহীর চিত্র দুটি নাটকেই পাশাপাশি আঁকা হয়েছে।

ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'কেদার রায়ের' কিছু ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে; সেটা অবশ্য ইতিহাসের ঘটনাকে বিকৃত করা হয়েছে বলে নয়। বরং বলা যায় ইতিহাসের ঘটনাকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে বলে। কিন্তু নাটকের মূল দ্বন্দ্বের মাঝখানে ছাপিয়ে উঠেছে ঈশা খাঁ-সোনার কাহিনী এবং এই কাহিনীকে আবার একটা সামাজিক সমস্যার আধারে রাখা হয়েছে। তাই নাটকের মূল ভাবাবেগকে এই কাহিনী খণ্ডিত করেছে বলতেই হয়।

দ্বিতীয়তঃ নাটকটি শেষের দিকে মেলোড্রামার পর্যায়ে নেমে গেছে। শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর ঘনঘটা ট্র্যাজেডী সৃষ্টির সহায়ক না হয়ে অন্তরায় হয়েছে। বঙ্গ ললনাদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ এবং তার সামনে মানসিংহের পশ্চাদপসরণ দৃশ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা রীতিমত রোমাণ্টিক। নাটকের গানগুলিও এই জাতীয় নাটকের ভাবের সহায়ক হয়নি। একটি গান [৫।১] ছাড়া, আর সবই রোমাণ্টিক প্রণয়গীতি না হয় আধ্যাত্মিক গান।

১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চরকার গান' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

২। "বাঙ্গালীরা মারাঠা সৈন্যদিগকে বর্গী বলিত। বাংলা দেশে মারাঠা

সৈন্যদের মধ্যে একশ্রেণীর নাম ছিল শিলাদার। ইহারা নিজেদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিত। নিম্নশ্রেণীর যে সমুদয় সৈন্যদের অশ্ব ও অস্ত্র মারাঠা সরকার দিতেন তাহাদের নাম ছিল বার্গীর। 'বর্গী' এই 'বার্গীরে'রই অপভ্রংশ।" রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলা দেশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা [ফাল্গুন, ১৩৭৩] পৃঃ ১৫৬।

৩। নাদির সম্পর্কে একটি মন্তব্য: "He has been designed—Robber chief, but his antecedents, like those of many others, have filled the position and have redeeming points of melodramatic interest." [*Encyclopaedia Britanica*].

৪। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা', কলিকাতা, [১৯৬৫], পৃঃ ৩২।

৫। 'কারাগারের' গানগুলি রচনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম ও হেমেন্দ্রকুমার রায়।

৬। এই সখারাম দেউস্করের 'দেশের কথা' পুস্তকটি ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করে দেয়। এ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৭। বারভুঞা: দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে বাংলায় পাঠান রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সমগ্র বঙ্গভূমি শাসনাধীনে আনতে তাদের প্রায় দেড়শত বছর লেগে যায়। ততদিন পর্যন্ত বঙ্গভূমি দিল্লীর অধীন ছিল। কিন্তু ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের এক পাঠান শাসনকর্তা দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই সময় থেকে ১৫৭৬-এ আকবর কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাল পর্যন্ত বঙ্গের স্বাধীন-শাসন যুগ। এই স্বাধীন পাঠান রাজত্বের পতন ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই যে মোগল রাজত্বের সুরু হয়েছিল তা নয়; পাঠানেরা বিজিত হবার পর দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে; দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হয়; চার দিকে সামন্ত রাজা বা ভূম্যধিকারীরা মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে। এদের মধ্যে হিন্দু এবং পাঠান দুই শ্রেণীই ছিল। এই ভূম্যধিকারীরা ভৌমিক বা ভুঞা নামে অভিহিত হতেন। অধিকারের বিস্তৃতি অনুসারে এদের ক্ষমতা কম বেশী হতো। এদের কারও শাসনস্থল একটি পরগণাও নয়, আবার কেউ বা একখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর।

মোগল-পাঠান যুগে এমন কত ভূঞা মাথা তুলেছিলেন তার হিসাব করাই কঠিন। তবে মোগলদের বঙ্গবিজয়ের সময় বা পরে বার জন ভূঞা প্রাধান্য লাভ করেন। বলতে গেলে তাঁরাই নিম্নবঙ্গের দক্ষিণভাগকে নিজেরা ভাগ করে নিয়েছিলেন। এই জন্যে সে সময় বঙ্গভূমিকে 'বারভূঞার মুলুক' বলা হতো। এঁরা যদিও ভূম্যধিকারী বা জমিদার, কিন্তু এরা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন শাসক। এদের সৈন্য ছিল, অস্ত্রশস্ত্র নৌবাহিনী পর্যন্ত ছিল। এঁরা দুর্গ পর্যন্ত তৈরী করতেন। এদের মধ্যে অনেকেই বীর বলে পরিগণিত হয়েছেন। বারভূঞার মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, শ্রীপুর বা বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, বাক্‌লা বা চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দরাম রায় প্রভৃতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

৮। 'মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীকে অম্বরে লইয়া যান নাই, তিনি কেদার রায়ের শিলাময়ী দেবীমূর্তি লইয়া গিয়াছিলেন। সে মূর্তি এখনও 'সল্লাদেবী' নামে অম্বরের রাজধানীতে পূজিত হইতেছেন।'—নিখিলনাথ রায়, 'প্রতাপাদিত্য' পৃঃ ৪৯৮-৫১৩ দ্রঃ।

৯। স্বরূপচন্দ্র রায়: 'সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস' পৃঃ ১০৩-০৪, **Bradley Birt, 'Romance of an Eastern Capital' pp. 78-80,** যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—'কেদার রায়' পৃঃ ৩২-৩৩।

১০। মানসিংহের প্রতি কেদার রায়ের উক্তি—"আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই যশোর জয় করতে আপনি পেয়েছিলেন—ভবানন্দ মজুমদারকে, আর শ্রীপুরে পেয়েছেন—শ্রীমন্ত খাঁকে।" [৫।৩]



৮.

ঐতিহাসিক নাটক ও ঐতিহাসিক যাত্রা

যাত্রা পুরোপুরি আমাদের নিজস্ব সম্পদ। শুধু যাত্রা নয়, নাটগীত, পাঁচালী কবি প্রভৃতি যে সব রীতি এদেশে প্রচলিত ছিল সেগুলির মধ্যেও নাটকীয় উপাদান ছিল। তবুও ঐ সব রীতি থেকে বাংলা নাটকের সৃষ্টি হয় নি। তবে একথা বলতে বাধা নেই যে যাত্রা আর নাটক পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে আর দেশের একটা বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে যাত্রা ও নাটকের ক্রমবিকাশ ঘটায় তার প্রতিফলন উভয়ের মধ্যেই তুল্যমূল্য ভাবে পড়েছে।

প্রাচীন যুগের গীতি, নাটগীত, পাঁচালী, কবি প্রভৃতি যেমন ধর্ম কথাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল তেমনি ধর্মীয় উৎসবের সংগীতই যাত্রায় পরিণতি লাভ ঘটেছে।[১] পূর্ণাঙ্গ নাটক কোন সমাজেই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেনি। সব জায়গাতেই দেখা যায় গীতিপ্রধান আবৃত্তির মধ্যেই নাটক ও অভিনয় কলার বীজ উপ্ত থেকেছে। আমাদের দেশের যাত্রার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও একথা স্মরণীয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে যাত্রার বীজ বাংলার মাটিতে উপ্ত হয়েছিল; তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে অঙ্কুরিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে তা নানা শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হয়। 'যাত্রার' জন্মটা আগে হলেও তার বিকাশটা ঘটেছে থিয়েটারের পাশাপাশি।

যাত্রার কাহিনী প্রথম দিকে ছিল পুরোপুরি পৌরাণিক কাহিনী, কৃষ্ণযাত্রা কালীয়দমন, রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, নন্দবিদায় যাত্রা, নল-দময়ন্তী যাত্রা, মনসার ভাসান যাত্রা, প্রভৃতি নাম থেকেই এ-বিষয়ে ধারণা করা যেতে পারে। এর পরে যে 'নূতন যাত্রা'-র প্রবর্তন হয় তাতে: 'একদিকে যেমন দেব কাহিনীর পরিবর্তে মানবীয় কাহিনী, বিশেষভাবে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী গ্রহণ করা হচ্ছিল, [১৮২২ থেকে] তেমনি এর মধ্যে নাটকীয় উপাদানও প্রবেশ করেছিল।'[২] উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে থিয়েটারের প্রভাবে যাত্রায় ক্রমশঃ অভিনয়ের

প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। ফলে যাত্রা-নাটকেও অভিনয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাবের বেশ বড় বড় সংলাপ সংযোজিত হতে থাকে। আবার অন্য দিকে যাত্রার সংগীত প্রাধান্যের দ্বারা থিয়েটারী নাটকও প্রভাবিত হয়।

থিয়েটারের যুগেও পুরাণো যাত্রা একেবারে বন্ধ হয়নি। তবে যাত্রা অন্ততঃ অভিনয়ের দিক থেকে বিশেষভাবে থিয়েটারের দিকে ঝোঁকে। ১৮৬০-এ মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী'র পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বেশ কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক লেখা হয়। স্বভাবতই যাত্রাওয়ালারাও এদিকে আকৃষ্ট হন। যাত্রায় যে উচ্চগ্রামের জমজমাট সংলাপ তা ঐতিহাসিক চরিত্রে সংযোজিত করার অনেক সুবিধা। এইসব কারণে ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে যাত্রার পালাও রচিত হইতে থাকে।

: প্রথম ঐতিহাসিক যাত্রার পালা :

যতদূর জানা যায় চ'রে পাগলা নামে ফরাসডাঙ্গার এক যাত্রাওয়ালা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে 'সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয় করেন। এই গ্রন্থ বিখ্যাত হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড়ের চরিত্র লইয়া সংকলিত হইয়াছিল।'[৩] এ সম্পর্কে বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এর পর পর ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে আরও যাত্রার পালা রচিত হয়েছিল কিনা তারও কোন হদিশ পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যাত্রাওয়ালারা আসর জমিয়ে রেখেছেন, পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে লেখা ভক্তি ভাব সমৃদ্ধ গীতাভিনয়ের দ্বারা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে "ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল রায় প্রমুখ সুকণ্ঠ গায়ক ও অধিকারীর প্রচেষ্টায় ইংরাজী আদর্শের নাটকের সঙ্গে কথকতার ধরণের বক্তৃতা এবং পুরাণো যাত্রা-পাঁচালী পদ্ধতির ভক্তিরসপূর্ণ গান যোগ করিয়া 'গীতাভিনয়' নামে নতুন যাত্রা পদ্ধতির সৃষ্টি"[৪] হয়। লোকরঞ্জন ছাড়াও এর উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা। কিন্তু এই যুগের যাত্রাওয়ালারা পৌরাণিক কাহিনীকেই অবলম্বন করেন। ঐ সময়ের থিয়েটারের কিছু সংখ্যক নাট্যকারদের মধ্যেও ঐ যাত্রাওয়ালাদের প্রভাব সংক্রমিত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা গিরিশচন্দ্রের নাম করতে পারি।

পরস্পর প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও যাত্রা ও থিয়েটার তাদের আপন বৈশিষ্ট্য নিয়েই অগ্রসর হতে থাকলো। কিন্তু ১৯০৩-এর পর থেকে যে ঐতিহাসিক

বিশেষভাবে দেশাত্মবোধক নাটকের জোয়ার এলো তা থেকে যাত্রাও দূরে থাকতে পারলো না। মন্মথ রায় মহাশয়ের ভাষায় বলতে গেলে : 'হঠাৎ যাত্রার আসরে এল এক নতুন জোয়ার। এ যেন ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করতে করতে দুকূলপ্লাবী গঙ্গা ধারাকে নিয়ে এলেন যাত্রা জগতে। এই নব ভগীরথ চারণ কবি মুকুন্দদাস। যাত্রাগান আবার এক নতুন সুরে নতুন ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করল।' ['শতবর্ষে নাট্যশালা' গ্রন্থের 'লোকনাট্য' শীর্ষক প্রবন্ধ]।

: স্বদেশী যাত্রা :

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যখন স্বদেশী আন্দোলনে এবং স্বদেশী আন্দোলন যখন রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হয়, ঠিক সেই সময়ে 'স্বদেশী যাত্রার' আবির্ভাব। এই যাত্রার অন্যতম প্রবর্তক মুকুন্দ দাস। বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত 'মুকুন্দ দাসের গ্রন্থাবলী'তে এইভাবে মুকুন্দ দাসের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে : "স্বাধীনতার স্বপ্নে যাঁহারা বাংলার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, চারণ কবি মুকুন্দ দাস তাঁহাদের অন্যতম। বরিশালের উপকণ্ঠে কালী মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁর সকল স্বপ্ন, সকল সাধনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় সংগঠন সফল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 'আনন্দময়ী আশ্রম'। মুকুন্দ দাস নামে পরিচিত হইলেও তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর দে বা যজ্ঞা। তিনি সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক ৺অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গ লাভ করেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নানাস্থানে স্বদেশী প্রচারে বাহির হন। 'মাতৃপূজা' তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য যাত্রাভিনয়।'[৫]

মাতৃপূজা ছাড়াও তাঁর পথ, সাথী, পল্লীসেবা, সমাজ, ব্রহ্মচারিণী, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি যাত্রা পালার অভিনয় জনপ্রিয় হয়েছিল। এই পালাগুলিতে বিধিবদ্ধ সামাজিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী ছিল না। প্রধান অভিনেতা একটি উচ্চাদর্শ নিয়ে নাটকের অঙ্কগুলিতে বিচরণ করতেন। মুক্তিকামী একদল আত্মত্যাগীকে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করতেন, নেশাগ্রস্ত মাতাল, বিদেশী সভ্যতার অনুরাগী নবজাত মধ্যবিত্ত সমাজের অধঃপতনকে ধিক্কার দিতেন, কর্মবিমুখ তার্কিক দাম্ভিককে বিদ্রূপ করতেন এবং দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ

করতেন। অভিনয়ে গানই ছিল প্রাণ এবং এই গানের মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক চেতনা এবং একটা উচ্চ আদর্শবোধ ফুটে উঠতো। ১৮৭৬-এ যে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন জারী করা হয়; সেই আইনে 'যাত্রা'কে নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। ঐ আইনের শেষ ধারায় ছিল: 'Nothing in this Act applies to any 'Jatras' or performance of alike at religious festival.'

যাত্রাকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে বাদ দেবার কারণ হলো এই যে, যাত্রা তখনও শাসকদের দৃষ্টিতে থিয়েটারের মত মারাত্মক হয়ে ওঠেনি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে থিয়েটারের যুগেও যাঁরা যাত্রা চালাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নবীন গুই, অনন্ত চক্রবর্তী [উলুবেড়িয়া], ভগবান গাঙ্গুলী, রোকো ও সাধু প্রভৃতি। এদের সঙ্গে যে দুজন বিখ্যাত যাত্রাওয়ালাদের দেখা যায় তাঁরা হলেন ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল রায়। এঁরা সবাই পৌরাণিক বিষয় নিয়েই যাত্রার পালা বাঁধতেন। সুতরাং শাসকদের পক্ষে তাঁরা ভীতিপ্রদ ছিলেন না।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাপ্তি ও তীব্রতার যুগে যাত্রাও আর জাতীয় ভাবধারা থেকে দূরে থাকতে পারলো না। এই শিল্প-মাধ্যমটিও বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে উদ্যত হলো। বিদেশী শাসকরা সক্রিয় হয়ে উঠলেন। মথুর সাহার যাত্রার 'পদ্মিনী' এবং 'ভরতপুরের দুর্গাজয়', ভূষণ দাসের যাত্রার 'মাতৃপূজা' সরকার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। মুকুন্দ দাসের আগে থেকেই দেশাত্মবোধক যাত্রাপালার রচনা সুরু হয়েছিল। মতিলাল রায়ের জীবদ্দশাতেই শশী অধিকারীর যাত্রা জনপ্রিয়তা লাভ করে। এঁর 'প্রতাপাদিত্য' নামক ঐতিহাসিক পালা সাধারণের মধ্যে এমনই উন্মাদনার সৃষ্টি করে যে, সরকার এই পালার অভিনয় নিষিদ্ধ করে দেন।

এই শশী অধিকারীরই সমসাময়িক হচ্ছেন ভূষণ দাস। ভূষণ দাসের দলের পালা লেখক ছিলেন মতিলাল ঘোষ। এঁরই রচিত 'মাতৃপূজা' [মুকুন্দদাসের এই'নামীয় পালা সম্পূর্ণ পৃথক পালা] নিষিদ্ধ হয়।

মতিলাল রায় নিজে দেশাত্মবোধক পালা রচনা না করলেও তাঁর পুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় দেশাত্মবোধক যাত্রা পালা রচনা না করে পারেন নি—কারণ তখন যুগের হাওয়া সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তিনি 'রামলীলাবসান', 'মণিপুরের

গৌরব' এবং 'মনোজয়ের মহামুক্তি' নামে যে তিনটি দেশাত্মবোধক পালা রচনা করেন তা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'রণজিত রাজার জীবন যজ্ঞ'ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, রাজদ্রোহের অপরাধে হরিপদবাবুকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল।

মুকুন্দ দাসের যাত্রাতেই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়। তাই তাঁর যাত্রা শুধু পল্লী অঞ্চলে নয়, সহরাঞ্চলেও যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সে যুগের জাতীয় আন্দোলনের মূল সুর "বিলাতী বস্ত্র বয়কট কর, চরকা কাটো, নিজের কাপড় নিজে তৈরী কর, স্বদেশী মিলের মোটা কাপড় পর" জাতির নেতাদের এই নির্দেশ মুকুন্দদাসের যাত্রায় স্থান লাভ করে। তিনিই সম্ভবতঃ প্রথম যাত্রা গায়ক যিনি তাঁর যাত্রার বা নাটকের গানে রাজদ্রোহ প্রচার করে সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি কর্তৃক দণ্ডিত হন।

আমি আগেই বলেছি তাঁর যাত্রার প্রাণ দেশাত্মবোধক গান। তাঁর মাতৃ-পূজার যে গানটির জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় সেটি এই :

বাবু বুঝবে কি আর ম'লে !
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে ॥
খেতে ভাত সোনার থালে,
নাউ সেটিসফাইড ষ্টীলের থালে,
তোদের মত মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মেলে।
পমেটম লাইক করিলি, দেশী আতর ফেলে
সাধে কি তোদের দেয় রে গালি
ব্রুট ননসেন্স ফুলিশ বলে ॥
ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা,
চোখের ঐ চশমা জোড়া, দেখ্না তোরা খুলে।
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিতেছে কলে,
ডু ইউ নো বাঙালী বাবু—
ইওর হেড ফিরিঙ্গীর বুটের তলে ॥
মুকুন্দের কথা ধর, এখনো সামলে চল,
সাহেবী চালটি ছাড়, যদি সুখ চাও কপালে।
বন্দে মাতরম্ বাজাও ডঙ্কা, জাগুক ভাই সকলে,

দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক আজ
প্রেমময়ীর প্রেম সলিলে।'

এই গানে সোজাসুজি শ্বেত ইঁদুর অর্থে শ্বেতাঙ্গ বৃটীশদের আক্রমণ করা হয়েছে। অন্যত্র নানাভাবে বাঙালী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা এবং বিদেশী বয়কটের জন্য গানের মাধ্যমে প্রচার চালানো হয়েছে। যেমন তাঁর 'কর্মক্ষেত্র' পালার গানে :

ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি, বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না।...

অথবা :

...এমন করে পরের হাতে
বিকিয়ে দিলি সোনার দেশ,
ধিক্ বাঙালী নীরব রইলি
থাকতে চৌদ্দ কোটি হাত॥

মুকুন্দদাস তাঁর 'মাতৃপূজা' যখন প্রথম অভিনয় করেন তখন সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ রাজশক্তি শঙ্কিত হয়ে এই পালাটিকে বন্ধ করে দেন এবং রাজদ্রোহিতার অপরাধে মুকুন্দ দাসকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসে আড়াই বছরের জন্য সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। আর শুধু কারাবাসই নয় মুক্তি পাবার পরেও যখন তিনি তাঁর দলকে নিয়ে যাত্রা করে বেড়াতেন, তখনো সরকারের হাতে তাঁর লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। পুলিশ তাঁকে বরাবর অনুসরণ করতো এবং নানাভাবে তাঁকে বিব্রত করতো। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করা যায়নি। চারণের মত তিনি গান গেয়ে বেড়িয়েছেন, দেশাত্মবোধক যাত্রা পালার অভিনয় করেছেন। গান এবং তার সঙ্গে উদাত্ত অভিনয়ে তিনি জনচিত্তকে মাতিয়ে তুলতে পারতেন। তিনি যে গানগুলি গাইতেন এবং যে পালাগুলির অভিনয় করতেন, তার মধ্যে কয়টি যে তাঁর নিজস্ব রচনা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি কাজী নজরুল, বিধুভূষণ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির গান যে ব্যবহার করেছেন, সেটা তো স্পষ্ট। বরং একটিও তাঁর নিজের রচনা কিনা এটাই প্রশ্ন। ইদানীং কালে মুকুন্দদাসকে 'চারণ-কবি' আখ্যা দিয়ে তাঁর লিখিত গান ও যাত্রা-পালার সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি চারণের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—সঙ্গীত, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তিনি সুন্দরভাবে দেশাত্মবোধ প্রচার করেছেন,

তবুও তিনি নিজে কিছু রচনা করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। যেমন 'ব্রহ্মচারিণী' নামে যে পালাটি তাঁর নামে চালানো হয়েছে সেটি বিধুভূষণ বসুর রচনা। [ডঃ অশোককুমার কুণ্ডু সম্পাদিত 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী', ১৩৮৩ গ্রন্থের ৩১৩ পৃষ্ঠায় সনৎকুমার মিত্রের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]। তাঁর পালাগুলির রচয়িতা যিনিই হন, ঐ পালাগুলি যে দেশের জনচিত্তকে উদ্বেলিত করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মুকুন্দ দাস তাঁর পালা গানের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার যে জোয়ার এনে- ছিলেন জাতীয় জীবনধারায় তা কখনোই ভুলবার নয়। এই প্লাবন সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনে যে বিরাট এক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। মুকুন্দ দাসের পর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর মতো দল গড়ে এই স্বাদেশিকতার ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন কিছুদিন। মুকুন্দ দাসের অনুপ্রেরণায় তখনকার অন্যান্য যাত্রা দলও এই ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই পর্যায়ে মথুর সাহার দলের নাম করা যায়। এই জনপ্রিয় দলটিও জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এই সঙ্গে শ্রীচরণ ভাণ্ডারী প্রভৃতি আরও কয়েকটি দলের কথা এসে পড়ে। আসল কথা সেই ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে যে জাতীয়তার উন্মেষ, নেতৃবৃন্দের প্রয়াসে ও প্রেরণায় স্বাধীনতা-আন্দোলনের যে পরিব্যাপ্তি, তার ভাব-সান্নিধ্য থেকে যাত্রাও নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেনি। এ দিক দিয়ে থিয়েটারের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না।

: থিয়েটারের প্রভাব :

মুকুন্দ দাস যে সময়ে গীতি প্রধান স্বদেশী পালা গাইছেন, সেই সময় থেকেই যাত্রাগানে থিয়েটারের প্রভাবে পড়ে। এর ফলে যাত্রা তার গীতাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রায় পরিণত হতে থাকে। মথুর সাহা তো তাঁর যাত্রাদলের নামকরণই করেন 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি।' শুধু থিয়েট্রিক্যাল অভিনয় নয়, যাত্রার দলপতিরা ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর দিকেও দৃষ্টি দেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী' নাটকটি যাত্রা জগতে একটি অভিনব অবদান রূপে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে। চ'রে পাগলার পরে তিনিই ঐতিহাসিক যাত্রার প্রথম রূপকার। তারপর ঐতিহাসিক পালা

লেখেন ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী। যাত্রার বিখ্যাত পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন: 'ঐতিহাসিক পালাও ভোলাবাবুর আগে একমাত্র হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ই লিখেছিলেন বলে মনে হয়।'

বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষ দিকে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 'পদ্মিনী' রচনা করেন। তার পূর্বেই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'পদ্মিনী' রচিত হয় [১৯০৬ খৃষ্টাব্দে]। থিয়েটারে এই নাটকের জনপ্রিয়তাই হরিপদ চট্টোপাধ্যায়কে পালা রচনায় প্রেরণা দেয়। বাস্তবিক পক্ষে এটা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে, থিয়েটারের যে সব পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সেই সব বিষয় যাত্রার পালাতেও অনুপ্রবেশ করেছে। এটা এ যুগেও লক্ষ্য করা যায়। এদিক থেকে যাত্রা তার অস্তিত্বকে রক্ষার জন্যই থিয়েটারের অনুসরণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে থিয়েটার ও যাত্রা পালার নামও এক। প্রথম দিক দিয়ে থিয়েটারের অনেক জনপ্রিয় নাটক সামান্য রদবদল করেও যাত্রায় অভিনীত হয়েছে। এ অবস্থায় হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী' ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পদ্মিনী'কে অনুসরণ করবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

শুধু দূরের ইতিহাস নয়, কাছাকাছি কালের ইতিহাস নিয়েও যাত্রার পালা রচিত হতে থাকে। এমনই একটি পালা রচিত হয় মহারাজ নন্দকুমারকে নিয়ে।

: নন্দকুমার প্রসঙ্গ :

সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ নন্দকুমারকে সিরাজদ্দৌলা হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। ইংরেজরা আলিনগরের সন্ধি অগ্রাহ্য করে যখন ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করে তখন সিরাজ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ইংরেজদের উদ্দেশ্যে। তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি যে কোন অবস্থায় চন্দননগরে ফরাসীদের রক্ষা করবেন। কিন্তু কার্যত তিনি কিছুই করলেন না। ফলে, ক্লাইভ ও ওয়াটসন সহজেই চন্দননগর দখল করে নিল।

ইংরেজরাই স্বীকার করেছেন যে, সেই সময় চন্দননগরের কাছে নন্দকুমারের অধীনে নবাবের বহু সৈন্য ছিল। এবং তারা অগ্রসর হলে ইংরেজরা ঐ ফরাসী অধিকৃত সহর দখল করতে পারতো না। Orme's *Indostan*, [Vol II, p 137]-এ বলা হয়েছে যে, আমীন চাঁদকে [উমিচাঁদ] দিয়ে ইংরেজরা

নন্দকুমারের কাছে ১২০০ ঘুষ পাঠান।[৬] একালের ইতিহাস '*An Advanced History of India*' [By Majumder. Roy Chaudhuri, and Dutta] -তে বলা হয়েছে 'It is almost certain that Nanda Kumar was bribed, but it does not appear that Nawab had given any definite order to Nanda Kumar to risist the English.' [p. 661]

এই নন্দকুমার মীরজাফর যখন মসনদে বসলেন তখন তাঁর দেওয়ান। ক্লাইভ-এরও তিনি মুন্সী হয়েছিলেন। মীরজাফর প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে না পারায় বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব ইংরেজদের দেন। ১৭৫৮-এর ১৯ আগষ্ট নন্দকুমার ঐ সব স্থানের তহশীলদার নিযুক্ত হন। ঐ সময় হেষ্টিংস ছিলেন মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে রেসিডেন্ট [পলাশীর যুদ্ধের পর এই ব্যবস্থাই হয়েছিল]। বর্ধমান প্রমুখ স্থানের রাজস্ব আদায়ের ব্যাপার নিয়ে হেষ্টিংস-এর সঙ্গে নন্দকুমারের বিবাধ বাধে। পরে হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেল হন, কিন্তু বরাবর নন্দকুমারের প্রতি তিনি তীব্র ঘৃণা পোষণ করতেন। হেষ্টিংস তাঁকে বলেছেন "the basest of mankind."

হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেল হিসেবে কাজ আরম্ভ করার পর কাউন্সিলের সভ্যগণের মধ্যে একমাত্র বারওয়েল তাঁর সমর্থনে ছিলেন। অপর তিনজন সদস্য প্রথম থেকেই হেষ্টিংস-এর বিরোধিতা করতে থাকলেন। এই সংখ্যাধিক্যের বিরোধের কথা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হেষ্টিংস-এর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনতে আরম্ভ করলো। নন্দকুমারও অভিযোগ আনলেন যে, হেষ্টিংস মীরজাফরের বিধবা স্ত্রী মণিবেগমের কাছ থেকে ৩,৫৪,১০৫৲ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছেন। এই অভিযোগের নিষ্পত্তি হবার আগেই মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে জালিয়াতের অভিযোগ আনলেন। বিচারে নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হলেন এবং প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। অনেকেরই ধারণা এর পেছনে হেষ্টিংসই সক্রিয় ছিলেন এবং তিনিই মোহনপ্রসাদকে দিয়ে জালিয়াতির মামলা করান। কিন্তু কাউন্সিলের যে সব সদস্য নন্দকুমারকে উৎসাহ দিয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু তাঁকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টাই করেন নি। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে P. F. Roberts লিখেছেন: 'It casts the darkest and most sinister shadow over the reputa-

tion of the men who used him for their own purpose and then callously and contemptuosly flung him to the wolves.' [*Journal of Indian History*, **March, 1924.**]। কাউন্সিলের সদস্য, হেষ্টিংস, কারও আচরণ কোনও ভাবেই সমর্থন করা যায় না। আবার যে নন্দকুমারকে আমরা ইতিহাসে পাই তাঁকেও জাতীয় বীর হিসেবে সম্মান দেওয়া যায় না। বরাবরই তিনি, যে ইংরেজ ভারতে সাম্রাজ্য গড়ে তুলছে তাদেরই বিশ্বস্ত লোক। সিরাজকে ছেড়ে তিনি মীরজাফরের দেওয়ান ; মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তিনি মীরজাফরেরই সহযাত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ সত্য ছিল কিনা এ বিষয়ে এখনও অবশ্য সন্দেহ আছে ; আর ঐ জালিয়াতির মামলায় তাঁর ফাঁসী হওয়াতেই তিনি শহীদ হয়ে যান এবং বাংলা নাটকে জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেন। নতুবা রাজা নবকৃষ্ণের জীবনী লেখক **N.N. Ghosh** নন্দকুমারের চরিত্র কলঙ্কিত করেই এঁকেছেন [*Memoirs of Maharaja Nubakissen Bahadur* দ্র:] Macaulay এবং Mallesionও নন্দকুমারের নিন্দা করেছেন। সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই দলে।

এই নন্দকুমারকে নিয়ে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 'নন্দকুমারের ফাঁসি' নামে যে যাত্রা-নাটক রচনা করেছিলেন [১৮৮৬-৮৭] তাতে নন্দকুমারকে জাতীয় বীর হিসাবেই প্রতিপন্ন করা হয়েছিল।

অবশ্য নাটকীয় দ্বন্দ্বটাকে অনেকখানি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই নাটকে নন্দকুমারের প্রতিপক্ষ প্রতাপ [অর্থাৎ মোহনপ্রসাদ]। এই মোহনপ্রসাদের প্রতি হেষ্টিংস বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করেন এবং এই মোহন প্রসাদ ছিলেন নন্দকুমারের শত্রু। একদিন নন্দকুমারেরই পিতার অনুগ্রহে সে লালিত পালিত হয়েছে, কিন্তু কালে সে-ই নন্দকুমারের চরম শত্রু হয়ে উঠেছিল। নাটকে তার সংলাপ: '...নন্দকুমারের জীবিত দেহ আমার চক্ষের শূল, নন্দকুমার জীবিত থাকতে আমি কিছুতেই সুস্থির হতে পারবো না।' [৩।১]। কিন্তু এই ধরণের প্রচণ্ড বৈরিতা কেন, নাটকে তার হদিশ পাওয়া যাবে না।

অথচ আজ এটা সুবিদিত যে, আসল নাটের গুরু ছিলেন হেষ্টিংস। মোহন-প্রসাদকে দিয়ে তিনিই নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা এনেছিলেন। **Macaulay**ও তাঁর ***Essays on Warren Hastings*** গ্রন্থে বলেছেন: **'The**

ostensible prosecutor was a native. But it was then, and still is the opinion of everybody, idiots and biographers excepted, that Hastings was the real mover in the business.' [p. 446] ।

এই নাটকে বৃটীশ সাম্রাজ্যশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা নেই, সে যুগে তা থাকা সম্ভবও ছিল না। তবে ইংরেজ সম্পর্কে মোহভঙ্গের কথা আছে :

'ওহো বিধি। এই কি তোমার বিধি,
... ...
এই তবে এই তবে আনিয়া ইংরাজে,
অপার সাগর পারে আছিল যে জন,
সাধ করে আনাইয়া তারে,
বসালে সোনার ঠাটে, সোনার ভারতে,—
ছড়াইলে কাল-ফণী ফুলমালা ভ্রমে,
ভেবেছিলে মনে মনে মনোহর সুবাসিত
সে মালার বাসে প্রফুল্লিত উদ্‌ভাসিত
করিবে অন্তর। কিন্তু হায়। দেখ আসি এবে
দংশিলে সে কাল-ফণী বিনা দোষে ভেবে।'

[নন্দকুমারের অন্তিম উক্তি, ৪।১]

আগেই বলেছি যে, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'নন্দকুমারের ফাঁসি' নাটকে আসল প্রতিপক্ষ প্রতাপ বা মোহনপ্রসাদ। তাই নাটকে আত্মকলহের ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ওপরে নয়। প্রতাপ সম্পর্কে পুরোহিত সদাচারী বলেছেন : "হায়! বঙ্গ সন্তান! নির্লজ্জ বঙ্গ সন্তান। ধিক তোমাদের, স্বজাতিদ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ যে জীবনের একমাত্র উপাস্য, সে জীবনের মূল্য কি :—আজ যেমন নন্দকুমার স্বজাতির বিদ্বেষে দিবানিশি দগ্ধ হচ্ছে, কাল সমস্ত বঙ্গবাসী এইরূপ পরস্পর দগ্ধ হবে।" [১।১]। ইংরেজ ফ্রান্সিসও বলেছে : '[স্বগত] ও! বাঙ্গালী কি স্বজাতি বিদ্বেষী।' [৩।১]।

এই নন্দকুমারকে নিয়ে পরবর্তী কালে থিয়েটারের জন্যে একাধিক নাটক রচিত হয়েছে। একখানি রচনা করেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং অপরখানি রচনা করেছেন মহেন্দ্র গুপ্ত। নন্দকুমারকে নিয়ে অতুলকৃষ্ণ মিত্রও একখানি নাটক রচনা করেন বলে জানা যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে একমাত্র উল্লেখ ছাড়া আর কোনও নিদর্শনই পাওয়া যায় না—এ কথা অতুলকৃষ্ণের নাটক আলোচনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ নন্দকুমার চরিত্র অবলম্বনে বাঙালীর সাহসিকতা এবং সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্তে আত্মবিসর্জনের মহান আদর্শ প্রচার করেছেন। এই নাটকে ইতিহাসের নন্দকুমারের দিকে যত না দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে দেশাত্মবোধ প্রচারে। সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। এই নাটকটি বৃটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সম্ভবতঃ অতুলকৃষ্ণের 'নন্দকুমারের ফাঁসি'র প্রচারও সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল।

নন্দকুমারকে নিয়ে নাটক লেখা এখানেই শেষ হয় নি। কারণ জাতীয় আন্দোলনের যুগে ইংরেজের সঙ্গে বিবাদ করে যাঁরাই পরাজিত হয়েছেন [সেটা যত ব্যক্তিগত ব্যাপারই হোক না কেন] তাঁরাই আদর্শ চরিত্রের লোক—দেশহিতব্রতী এবং ন্যায়পরায়ণ। এই দৃষ্টি নিয়েই মহেন্দ্র গুপ্ত 'মহারাজ নন্দকুমার' নাটকটি রচনা করেন।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পরে ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী ঐতিহাসিক নাটক লিখতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে অনুসরণ করলেন। এ জন্তে যাত্রার পালা হিসেবে তাঁর নাটক সে যুগে সাফল্য লাভ করলেও তাঁর নাম চাপা পড়ে গেছে। ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর স্মৃতিচারণে তাই লিখেছেন: 'ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর দেহটি ছিল যেমন বিরাট, তাঁর সৃজনী শক্তিও ছিল তেমনি অসীম; তাঁর গানগুলোও ছিল অপূর্ব।......এত শক্তিমান হয়েও ভোলাবাবু চরিত্র-চিত্রণে ও উপমার অবতারণায় ডি. এল রায়কে অনুসরণ করতেন। হয়ত এই জন্যই তাঁর কোন নাটক কালজয়ী হ'ল না।'

ভোলানাথ দ্বিজেন্দ্রলালের মতই কাব্যধর্মী গদ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁর নাটকে, তবে নাটকের মাঝে মাঝে গৈরিশছন্দের সংলাপও তিনি রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকের মত তাঁর ঐতিহাসিক যাত্রা পালাও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ। তাছাড়া রঙ্গমঞ্চ থেকে সেদিন যুগের প্রয়োজনেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ও সম্প্রীতির আবেদন জানানো হয়েছে; যাত্রা পালার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস থেকে সরে এসে কাল্পনিক রোমান্টিক চরিত্র রচনা করতে হয়েছে। ভোলানাথের 'পঞ্চনদ' [১৯১৮] নাটকটির কথাই ধরা যাক। সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পটভূমিকায় নাটকটি রচিত। ১০০১ খৃষ্টাব্দে মামুদের পাঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণের

কাহিনী এই নাটকে বিধৃত। পঞ্চনদের রচয়িতা ভূমিকাতেই বলেছেন: 'সুলতান মামুদ যদিও একজন রক্ত পিপাসু, ধর্মদ্বেষী দস্যুবিশেষ সম্রাট ছিলেন, কিন্তু অনেক স্থলে তাহার উদারতা, প্রকৃত বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিয়া তাঁর চরিত্র অঙ্কিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।' এই সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে লেখক মামুদকে এমনই উদার করে তুলেছেন, যেটা ধর্মীয় কোনও নেতার পক্ষেই শোভন। মামুদ বলেছেন: 'জাত কেবল তোমার আমার চক্ষে দরিয়া। ঈশ্বরের চক্ষে জাতিভেদ নাই। সেথায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একাকার।' [৪।১] অথবা: 'আমি জানি সাম্য,—আমি জানি অভেদ—আমি জানি ঈশ্বর জগৎময়। দরিয়া! তোমরা যাকে আল্লা বল, অন্যে তাঁকে শিব বলে। এই তো?' [৪।১]

ঐতিহাসিক যাত্রা নাটকের রচয়িতাগণও নাট্যকারদের মতই অনেক নাটকের বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন রাজপুত ইতিহাস থেকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নাটকের অনুসরণে তাঁদের যাত্রা-পালার একই নাম রেখেছেন। যেমন ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'দুর্গাদাস।' নামের সামান্য পরিবর্তন করে থিয়েটারী নাটকের একই বিষয় নিয়ে অনেক যাত্রা-নাটক রচিত হয়েছে। যেমন: বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজা সীতারাম,' 'মহারাজ নন্দকুমার'; শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মীরকাশেমের স্বপ্ন', ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'সিরাজের স্বপ্ন' প্রভৃতি। এই সব যাত্রা-নাটকেও মীরকাশেম, সিরাজ, নন্দকুমার, সীতারাম প্রভৃতি চরিত্র জাতীয় বীর হিসাবেই চিত্রিত হয়েছেন।

থিয়েটারের উন্নতির যুগে তার পাশাপাশি থেকে যাঁরা যাত্রার জন্যে ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন তাঁদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ যথেষ্ট ছিল এবং প্রাচীন কাহিনীতেও তাঁরা সমসাময়িক ভাবকে সঞ্চারিত করেছেন। তবুও থিয়েটারের চেয়ে যাত্রা-পালার কিছু স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়বেই। প্রথমত, যাত্রা সব সময়েই গীতিবহুল, সে ভক্তিমূলক বা সামাজিক বা ঐতিহাসিক যে ধরণের যাত্রাই হোক—এই গীতিবাহুল্য সর্বদাই লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে এই গানই যাত্রায় বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠতো। দ্বিতীয়ত, আগেকার দিনের ঐতিহাসিক যাত্রায়ও পোষাক পরিচ্ছদ ছিল অনৈতিহাসিক। তৃতীয়ত, অভিনেতাদের আচরণ [আগেকার দিনে পুরুষেরাই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন] অনেক সময় আসরে রসভঙ্গ ঘটাতো।

ধীরে ধীরে অবশ্য এই সব অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যাত্রার প্রাচীন ধারায় অনেক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক যাত্রা-নাটকেরও কিছু পরিবর্তন হয় এবং তা প্রায় থিয়েটারের কাছাকাছি চলে আসে। এই পরিবর্তন যারা আনেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ব্রজেন্দ্র কুমার দে [এঁর ঐতিহাসিক নাটক : বঙ্গবীর, রক্ততিলক, রাজসন্ন্যাসী, চাঁদের মেয়ে, চাষার ছেলে, বিচারক, বাঙালী প্রভৃতি] ; ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ [এঁর ঐতিহাসিক নাটক : 'মদনমোহন']; কানাইলাল শীল [এঁর ঐতিহাসিক নাটক : 'দল মাদল'], সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় [এঁর ঐতিহাসিক নাটক : 'পলাশীর পরে'], নন্দগোপাল রায়চৌধুরী [এঁর ঐতিহাসিক নাটক : 'রাণী দুর্গাবতী'], জীতেন্দ্রনাথ বসাক [এঁর ঐতিহাসিক নাটক : 'বিদ্রোহী বাঙালী', 'লাল বাঈ']। এ ছাড়া 'রাজা সীতারাম'-এর রচয়িতা বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ; 'শিবাজী,' 'পৃথ্বীরাজ,' 'রানী ভবানী' প্রভৃতি রচয়িতা আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নামও করা যেতে পারে।

বর্তমানে অর্থাৎ সত্তরর দশকে অবশ্য ঐতিহাসিক যাত্রা পালা বিষয়বস্তুর দিক থেকে থিয়েটারের নাটককে পেছনে ফেলে এসেছে বললেই হয়। নব গঠিত বাংলা দেশ এবং শেখ মুজিবকে নিয়ে কয়েকখানি নাটক লেখা হয়েছে। যেমন উৎপল দত্তের 'জয় বাংলা,' অরুণ রায়ের 'আমি মুজিব বলছি', সত্যপ্রকাশ দত্তের 'মুজিবর রহমান'। সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে নাটক লিখেছেন নরেশ চক্রবর্তী, উৎপল দত্ত ['রাইফেল']। হিটলার, কার্ল মার্ক্স, লেনিন, হো-চি মিন প্রভৃতিকে নিয়েও নাটক লিখেছেন শম্ভু বাগ। বিনয়-বাদল-দিনেশ এর কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছেন নরেশ চক্রবর্তী।

: ঐতিহাসিক পালায় ভক্তির আতিশয্য :

থিয়েটার নাটকের পাশে প্রথম যখন যাত্রা-নাটক রচিত হচ্ছিল তখন এবং তার পরেও ঐতিহাসিক যাত্রা পালা রচয়িতারা রোমান্টিকতা ও দেবভক্তির ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

বিষ্ণুপুরের রাজ পরিবারকে কেন্দ্র করে একাধিক নাটক রচিত হয়েছে। এর মধ্যে একখানি ফণীভূষণ বিদ্যা বিনোদ রচিত 'মদনমোহন' [১৯৩৬] এবং আর একখানা কানাইলাল শীল রচিত 'দলমাদল' [এই শতাব্দীর ৫ম দশকে লেখা]।

অবশ্য কানাইলাল 'বীরপূজা' নামেও একখানি নাটক লেখেন। 'দলমাদল' বীর পূজারই পরিপূরক। কানাইলালের দুইখানি এবং ফণীভূষণের একখানি—এই তিনখানি নাটকই বিষ্ণুপুরের দেবতা মদনমোহনের অলৌকিক কাহিনী নিয়ে রচিত। কানাইলাল তাঁর 'দলমাদল' নাটকের নিবেদন-এ লিখেছেন : 'বর্গীর অত্যাচারে বাংলা যখন বিধ্বস্ত, বাংলার অসহায় নবাব আলিবর্দি শত্রুপীড়নে বিপর্যস্ত, বাংলার ঘরে ঘরে করুণ আর্ত-হাহাকার, তখন ক্ষুদ্র বিষ্ণুপুর যে ক্ষুরধার অস্ত্রে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহা লৌহ গঠিত নয়, কুসুম চন্দনে গড়া। যে দলমাদল কামান মদনমোহন স্বয়ং চালনা করিয়া বর্গী-বিতাড়ন করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহাকে এখনও সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এই অধ্যাত্ম সাধনাই ভারতের বাহুতে চিরদিন বল সঞ্চার করিয়াছে। সবাই যখন অসি ধরিয়াছে, ভারত তখন বাঁশী বাজাইয়া বাজী মাৎ করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসও এই।'

ফণীভূষণের 'মদনমোহন' নাটকেও মদনমোহন 'বিষ্ণুপুর লীলায়' অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি বর্গী বিতাড়ন করেন নি, ইছাই ঘোষের অত্যাচার থেকে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করে নাটকের শেষ দৃশ্যে মিলনানন্দের মধ্যে বাঁশী বাজিয়েছেন। সোজা কথায় দুই নাট্যকারই mythকেই ইতিহাস বলে চালাতে চেষ্টা করেছেন, তাই ঐতিহাসিক ঘটনাকে টেনে নিয়ে গেছেন আধ্যাত্মিকতার খাতে।

ঐতিহাসিক-নাটকে আধ্যাত্মিকতা বা ভক্তিভাব ত্যাগ করতে অনেক সময় লেগেছে। পাঁচকড়ি দে 'সঙ্গের সাধনা' [১৯২৪] নামে যে নাটকটি লেখেন তার বিষয়বস্তু রাজস্থানের কাহিনী। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'তারাবাই' [১৯২৩] নাটকটির সঙ্গে এই নাটকের মিল আছে। এ নাটকটিও পৃথ্বীরাজ ও তারাবাই-এর মৃত্যুতেই শেষ হয়েছে। তবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটি যেন দৈব নিয়ন্ত্রিত। ফলে চারণী চরিত্রটি এখানে যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে। নাটকের শেষ দৃশ্যও শেষ হয়েছে আধ্যাত্মিক আবেদন দিয়ে; যেখানে চারণী সঙ্গকে বলছে :

> সঙ্গ সিং
> সকলি ঈশ্বরের খেলা।
> তাঁর খেলা খেলিছেন তিনি, মোরা কেহ নয়
> তাঁর ইচ্ছায় রয়েছি সাজান—এ সংসারে…

১। 'প্রাচীন মহোৎসবের বিষয়ীভূত প্রকরণাবলী ক্রমশঃ সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান যাত্রায় [অর্থাৎ এক স্থানে বসিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবলীলা অভিনয়] রূপান্তরিত হইয়াছে' : 'বিশ্বকোষ', পঞ্চদশ ভাগ, কলিকাতা, [১৩১১] পৃঃ ৬৯৭।

"বাস্তবিক প্রায় সকল প্রাচীন উৎসবেরই আদি ভিত্তি সৌরোৎসব। সূর্যের যাত্রা উপলক্ষ করিয়া এই সকল উৎসব হইত এবং উহাদের প্রধান অঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বলিয়া নাট্যাভিনয়ের নাম যাত্রা হইয়াছে।" : মন্মথমোহন বসু, 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' পৃঃ ৪১।

২। মৎলিখিত 'বাংলা নাটকে গান', কলিকাতা [১৯৫৫], পৃঃ ৬৩-৬৪ গ্রন্থে আমি যাত্রার আনুপূর্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি পৃঃ ৫৫-৭০, ১৪৬-১৮৪।

৩। 'বিশ্বকোষ', পঞ্চদশ ভাগ, পৃঃ ৭১৬।

৪। ডঃ সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' : কলিকাতা [১৯৫৬] পৃঃ ১৬৭।

৫। ১৯০৭-এ এপ্রিল মাসে বরিশালে 'মাতৃপূজার' প্রথম অভিনয় হয়। কিন্তু এই যাত্রা-পালা আগের বছরেই রচিত হয়ে বরিশাল সহরের বাইরে কয়েকটি স্থানে অভিনীত হয়েছিল।

৬। নবাবকে নিরপেক্ষ রাখার ব্যাপারে আমিন চাঁদ ও নন্দকুমারের ষড়যন্ত্রের কথা এবং সেই সঙ্গে নন্দকুমারের পুরস্কার [gift] পাবার কথা **Thompson and Garrat** তাঁদের *Rise and Fulfilment of British Rule in India* [p. 88] বইতেও লিখেছেন।



৯০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ঐতিহাসিক নাটক

বহুদিনের সঞ্চিত পাপ ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর হঠাৎ ইউরোপে মহাযুদ্ধের আকারে দেখা দিল। এই যুদ্ধে বিশ্বের ঐতিহাসিক মানচিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকলো।

পরাধীন দেশ ভারতবর্ষ। সুতরাং এই যুদ্ধে সরিক হওয়া না হওয়া এই দেশের জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল ছিল না। ইংরেজরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকেও যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া হলো। প্রতিবাদে যে সব প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা ছিল তারা পদত্যাগ করলো। এদিকে কংগ্রেসী শাসনের অবসানকে মুক্তির দিবস বলে ঘোষণা করলেন মুসলিম লীগ নেতা মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না। ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা বাড়তে থাকলো।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩—এর মধ্যে বহু ঘটনা ঘটে গেল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ত্যাগে তিনি বাধ্য হলেন। ১৯৪১-এ অন্তরীণ থাকা অবস্থায় তিনি অন্তর্ধান করলেন। কংগ্রেস একক সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলো। এদিকে পূর্ব এশিয়ায় জাপানও মহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে একের পর এক দেশ দখল করতে করতে রেঙ্গুনে পৌঁছাল। ১৯৪২-এ আরম্ভ হলো আগষ্ট আন্দোলন বা আগষ্ট বিপ্লব। তারপরে বাংলায় দেখা দিল ব্যাপক দুর্ভিক্ষ, যে দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল।

যুদ্ধকালীন বহু বিধি নিষেধ জারী হয়েছিল। তাই সোজাসুজি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক মঞ্চস্থ করা এই সময় সম্ভব হয় নি। যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে—এই অজুহাতে যে কোনও দেশাত্মবোধক নাটককে নিষিদ্ধ করা সহজ ছিল। অথচ আমাদের দেশে ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে দেশাত্মবোধ এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, নিছক নাট্যকলার দিক থেকে উন্নত নাটক লেখার কথা কেউ যেন ভাবতেই পারেন নি। বরং বলা যায় যে, নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটকে

গিরিশ-দ্বিজেন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদের ধারারই পুনরাবৃত্তি করছিলেন এবং এই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখি পঞ্চম দশক পর্যন্ত।

: মহেন্দ্র গুপ্তের নাটক :

এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় মহেন্দ্র গুপ্তের। তিনি নাট্যকার, অভিনেতা এবং রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তিনি বহু নাটক রচনা করেন এবং সেগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক নাটকের সংখ্যা কম নয়। মহেন্দ্র গুপ্ত ছাড়াও সুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রমুখ নাট্যকারেরাও কিছু ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। এর মধ্যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন অনেক ব্যাপক হয়েছে, ফলে এই সময়ে নাটক লিখতে গিয়ে এঁরা দেশাত্মবোধকে চরিতার্থ করার জন্যে পূর্বপ্রচলিত নাট্যধারা অনুযায়ী মধ্যযুগের রাজপুত-মোগল, মোগল-মারাঠা সংঘর্ষের ইতিহাসকেই শুধু অবলম্বন করেন নি, একদিকে তাঁরা যেমন প্রাচীন ইতিহাসের অনেক বিস্তৃত পটভূমি গ্রহণ করেছেন, তেমনি ইংরেজ রাজত্বের ঐতিহাসিক পটভূমিকাও ব্যবহার করেছেন। অবশ্য ইংরেজ রাজত্বের পটভূমি ব্যবহার করারও অসুবিধা ছিল। আমরা আগেই দেখেছি যে, গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' এমন কি 'ছত্রপতি শিবাজী' পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়েছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নন্দকুমার' নিষিদ্ধ হয়, মন্মথ রায়ের 'মীরকাশিম' সেন্সারের ছুরিতে ক্ষত বিক্ষত হয়। এই কারণে ইংরেজ রাজত্বের পটভূমিকায় রচিত ঐতিহাসিক নাটকের সংখ্যাও বেশী নয়।

মহেন্দ্র গুপ্ত কিন্তু এদিক থেকে অনেক অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি 'পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিত সিংহ', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'টিপু সুলতান', 'হায়দর আলী', 'শতবর্ষ আগে' প্রভৃতি নাটকে ইংরেজ আমলের পটভূমিকাই ব্যবহার করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্য দিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত একদিকে যেমন দেশাত্মবোধ জাগ্রত এবং বৃটীশ শাসন বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, তেমনি চেষ্টা করেছেন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি গড়ে তুলতে। "ইংরেজের সঙ্গে যাঁহারা সংগ্রাম বা বিবাদ করিয়া পরাজিত হইয়াছেন তাঁহার মতে সকলেই আদর্শ চরিত্র—দেশহিতব্রতী ও ন্যায়পরায়ণ—অত্যাচারী বৈদেশিক শক্তি দ্বারা অন্যায়ভাবে পরাজিত মাত্র।" [আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড (১৯৫৫), পৃঃ ৪৮৮]। এই দৃষ্টিভঙ্গির

ফলে হায়দার আলি, টিপু সুলতান, মহারাজ নন্দকুমার—সবাই জাতীয় বীর হয়ে উঠেছেন। প্রকৃত ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন নি বলেই, তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি রোমান্টিক ধর্মী হয়েছে।

প্রাচীন হিন্দু, মুসলিম এবং ইংরেজ আমল—ভারত ইতিহাসের এই তিনটি যুগ থেকেই মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর নাটকের কাহিনী আহরণ করেছেন। এই নাটকগুলিতে উত্তেজনা সৃষ্টির উপাদান যথেষ্ট। সেই অনুসারে বাস্তব ইতিহাসের ব্যাখ্যার অভাব। তবে নাট্যকার কাহিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন সব বিষয় গ্রহণ করেছেন যেগুলিতে সংঘর্ষের প্রাচুর্য এবং এই কারণেই সেগুলিকে সংঘাতমূলক নাটকে রূপান্তরিত করা সহজ হয়েছিল।

: হিন্দুযুগের পটভূমিকা :

হিন্দুযুগের পটভূমিকায় মহেন্দ্র গুপ্ত রচনা করেছেন 'সমুদ্র গুপ্ত' ও 'পৃথ্বীরাজ' নাটক। এর মধ্যে প্রথমটি যে যুগ নিয়ে লেখা, সেই যুগে ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়ে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এমন একজন নরপতিকে নাট্যকার বেছে নিলেন যিনি শুধু গুপ্তবংশেরই নন, প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম। বিচক্ষণ রণকুশলতা ও দিগ্বিজয়ের জন্য তাঁকে ভারতের নেপোলিয়ান বলে অভিহিত করা হয়। তিনি শুধু অসামান্য যোদ্ধা নন, বিদ্বান কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। এই নরপতি অর্থাৎ গুপ্ত রাজবংশের সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত [৩৩০-৩৭৫ খৃঃ]-কে নিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত ঐ নামেই নাটকটি রচনা করেন [১৯৪৯]। সমুদ্রগুপ্তের পরাক্রমে ক্ষুদ্র গুপ্তরাজ্য একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়, বহু রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এই দিগ্বিজয়ী সম্রাটের বীরত্ব, সেই সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী জুড়ে নাটকটি রচিত হয়েছে। এখানে পার্থিয়ান গ্রীকরাজা গেণ্ডোফেরাসক, শকরাজা, নেপালের লিচ্ছবী রাজাকে নিয়ে সমুদ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে যে চক্রান্তের দৃশ্য উপস্থিত করা হয়েছে তার সঙ্গে ইতিহাসের মিল নেই। যে পার্থিয়ান নরপতি গণ্ডো-ফারনেস [Gondopherness] সব চেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতকে দক্ষিণ আফগানিস্থানে রাজত্ব করতেন। তিনি

সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক নন। এই গ্রীক নরপতিকে নাটকে এনে অবশ্য নাট্যকার তাঁর দেশাত্মবোধের কিছুটা অভিব্যক্তি ঘটাতে পেরেছেন। যেমন:

"স্বর্ণপ্রসূ ভারতে এসে কামধেনুর মত যতদিন ভারতবর্ষকে দোহন করা চলে ততদিন কোন বিদেশীই স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ করতে চায় না। তারা ভারত ত্যাগ করে শুধু তখনই যখন ভারতের উদ্যত বজ্রবাহু তাদের জোর করে এদেশ হতে বহিষ্কার করে দেয়।" [গেণ্ডোফেরাসের প্রতি সমুদ্রগুপ্ত : ১।১] বৃটীশ শাসনকে মনে রেখেই এই সংলাপ রচিত হয়েছে—এটা বুঝতে কারুরই কষ্ট হয় না।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সামগ্রিক চরিত্র তুলে ধরা নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল না বলেই, তাঁকে অবলম্বন করে দেশাত্মবোধের কিছু উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা এই নাটকে হয়েছে।

হিন্দুযুগের পটভূমিকায় মহেন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় নাটক পৃথ্বীরাজ। এই পৃথ্বীরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই দিক থেকে নাটকের পটভূমিকা ভারতের ইতিহাসের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

যোগীন্দ্রনাথ বসুর পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য অবলম্বনে মহেন্দ্রগুপ্ত তাঁর 'পৃথ্বীরাজ' নাটক রচনা করেন [১৯৫০]। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হবার পাঁচ বছর পরে মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করে পাঞ্জাব জয় করলে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সে যুগে পৃথ্বীরাজ ছিলেন উত্তর ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা। মহম্মদ ঘোরী ও পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তরাইন প্রান্তরের যুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে কনৌজ নৃপতি জয়চাঁদের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের বিবাদ, পৃথ্বীরাজ সংযুক্তা কাহিনী আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে [১১৯২] পৃথ্বীরাজ পরাজিত হয়ে শত্রু হস্তে বন্দী ও নিহত হন। এটা ইতিহাসের ঘটনা। পিতার অমতে সংযুক্তা কর্তৃক পৃথ্বীরাজকে বরণের ঘটনা চারণ গীতিতে পাওয়া যায়। জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে সাহায্য করেন নি এটা ঠিক, কিন্তু তিনি মহম্মদ ঘোরীকে ডেকে এনেছিলেন কি না এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত বর্তমান।

নাটকীয় কাহিনী রচনার মালমশলা ইতিহাসের এই অধ্যায়ে পাওয়া যায়। কিন্তু সে যুগের ঐতিহাসিক পরিবেশের চেয়েও নাট্যকার তাঁর কল্পনার উপরই বেশী নির্ভর করেছেন। গড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রত্যাদেশ, শ্মশানের ডাকিনীর

ভবিষ্যদ্বাণী এবং মুসলিম ও রাজপুত শিবিরে তার যথেচ্ছা ভ্রমণ নাটকীয় কাহিনীতে রোমান্স সৃষ্টি করেছে। তারপর "সমস্ত ভারতের উপর প্রতিশোধ নিতে" শহেলী নামক যে চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে সেটিও রোমাণ্টিক চরিত্র। হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতাবোধ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় অন্ত্যজ জাতির প্রতি নির্যাতন-এর বিস্তারিত দৃষ্টান্ত দিয়ে শহেলী পৃথ্বীরাজকে বলেছে : 'সে ধর্মোন্মাদ অভিজাত উদ্ধত ভারতবর্ষ পশুকে স্বীকার করে, কিন্তু তবুও মানুষকে মানুষের মত বাঁচবার অধিকার দেয় না—সেই ভারতবর্ষকে আমি শ্মশান করে দেব। আর সেই শ্মশনের ওপর পাতব আমার প্রতিহিংসার অগ্নি সিংহাসন।" [২।৪]।

একদিকে সামাজিক পাপ আর অন্য দিকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করেছে—পৃথ্বীরাজ নাটকে এটাই দেখাবার চেষ্টা হয়েছে।

সমুদ্রগুপ্ত ও পৃথ্বীরাজ—এই দুটি নাটকই ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে [অর্থাৎ ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্টের পরে] লিখিত। কিন্তু তবুও সেই পরাধীন যুগের নাট্যকারদের আদর্শে দেশপ্রেমের উত্তেজনাই শুধু সঞ্চার করা হয়েছে—আদর্শ ঐতিহাসিক নাটক রচনার চেষ্টা হয় নি।

: মুসলিম যুগের পটভূমিকা :

মুসলিম যুগ থেকে যে কাহিনীগুলি মহেন্দ্রগুপ্ত তাঁর নাটকে গ্রহণ করেন সেগুলি হচ্ছে বিজয়নগর, রায়গড়, রাণী দুর্গাবতী, রাণী ভবানী এবং রাজসিংহ। এই সব কাহিনীতে নাট্যকার হিন্দু বীর বা বীরাঙ্গনাদের বেছে নিয়েছেন।

হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠার কাহিনী নিয়ে মহেন্দ্রগুপ্ত তাঁর 'বিজয়-নগর' নাটক রচনা করেছেন। এই নাটকও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে রচিত। এই নাটক 'অভিযান' নামে প্রথমে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে নাটকটির সংশোধন করে নাম দেওয়া হয় 'বিজয়নগর'।

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালের অরাজকতা এবং অব্যবস্থার ফলে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐতিহাসিক **Robert Sewell** তাঁর **'A Forgotten Empire'** গ্রন্থে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী ও কিংবদন্তীর বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলির মধ্যে যেটা প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে এই যে, সঙ্গম নামক এক ব্যক্তির দুই পুত্র হরিহর এবং

বুক্ক বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরা দুইজন বরঙ্গল রাজ্যের রাজা প্রতাপ রুদ্রের অধীনে কাজ করতেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গল যখন মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়, তখন হরিহর ও বুক্ক সেখান থেকে পালিয়ে এসে নানা প্রকার ভাগ্য-বিড়ম্বনার পর মাধব বিদ্যারণ্য নামে একজন পণ্ডিত ও তাঁর ভাই সায়নের সাহায্যে বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৫৬-এ তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে এই হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা।

নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'বিজয়নগর' নাটক [১৯৪৯]-এ বিজয়নগরের উত্থানের এই প্রাথমিক ইতিহাসকেই ভিত্তি করেছেন। তিনি এই সঙ্গে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের সিংহাসন লাভের তর্ক কণ্টকিত অথচ নাটকীয় ঘটনা দিয়ে নাটক সুরু করেছেন। গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁর পুত্র যুবরাজ জৌন মহম্মদ-বিন-তুঘলক নাম গ্রহণ করে সিংহাসন আরোহণ করেন। এই মৃত্যু সম্পর্কে নানা অভিমত বর্তমান। গিয়াসুদ্দিন বঙ্গদেশ জয় করে ফিরে এলে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য যুবরাজ দিল্লীর নিকটস্থ দুর্গনগরী তুঘলকবাদ-এর পাঁচ ছয় মাইল দূরে আফগানপুরে এক বিচিত্র কাষ্ঠ-তোরণ নির্মাণ করেন। এই তোরণ ভেঙ্গে পড়ে[১] গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যু ঘটে। কেন এবং কিভাবে তোরণ ভেঙ্গে পড়লো এ নিয়ে নানা মতবাদ প্রচলিত। নাট্যকার ইবন বতুতার মতটাই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ হাতীর পায়ের চাপে মিনার ভেঙ্গে পড়ে গিয়াসুদ্দিন মারা যান।

নাটকে মোহম্মদ তোঘলকের পালিতা কন্যা শিরিবাণুর চরিত্রের সাহায্যে নাটকে কিছু জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং শেষ দিকে নাটকীয়তাও সৃষ্টি করেছে এই চরিত্রটিই। নাটকটিতে ঐতিহাসিকতার চেয়েও রোমান্টিকতা বেশী এবং কোথাও কোথাও অতি-নাটকীয়তাও লক্ষ্য করা যায়।

'রাণী ভবানী' [১৯৪২] নাটকটি রচিত হয় পরাধীন ভারতে। এই নাম দিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত এই যে নাটকটি রচনা করেছেন সেটাতে বাংলার ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণকেই তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটি আরম্ভ হয়েছে নাটোরের গৃহ বিবাদকে নিয়ে এবং শেষ হয়েছে সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডে।

"পলাশী প্রান্তরে শুধু সিরাজের ভাগ্য বিচার নয়—সমস্ত বাংলার ভাগ্য নির্ণয় হবে—ঐ পলাশীতে" [রাণী ভবানীর উক্তি ৩।২], এ কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীকালে। কিন্তু ঐ সময় এই বোধ কয়জনের ছিল এবং ব্যক্তিগত

স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কয়জন ঐ সময় সারা বাংলার কথা চিন্তা করতে পেরেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

রাণী ভবানী একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, দাতা, দয়াশীলা ও পুণ্যবান রমণী ছিলেন। কিন্তু বাংলার তদানীন্তন রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা কতটুকু সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের প্রথম স্বর্গে যে ষড়যন্ত্র সভা দেখিয়েছেন তার মধ্যে রাণী ভবানী ছিলেন এটাও যেমন ঐতিহাসিক সত্য নয়,[২] তেমনি যে কারাগারের অভ্যন্তরে মহম্মদী বেগ সিরাজকে হত্যা করেছিল সেখানে হত্যাকাণ্ডের সময় নাটকীয় ভাবে রাণী ভবানীর প্রবেশও ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। এই নাটকে বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে রাণী ভবানীকে জড়িয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে সত্যি, কিন্তু ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

: বৃটীশ যুগের পটভূমিকা :

ভারতে বৃটীশ যুগের পটভূমিকায় মহেন্দ্র গুপ্ত যে নাটকগুলি রচনা করেন সেগুলি হচ্ছে—'রণজিৎ সিং', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'হায়দর আলী', 'টিপু সুলতান', 'শতবর্ষ আগে' প্রভৃতি। এই বৃটীশ যুগ নিয়ে পরাধীন ভারতে নাটক রচনা করা কঠিন ছিল। সে দিক থেকে নাট্যকার সাহসের পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই।

ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে গিয়ে মহেন্দ্রগুপ্ত ভারত ইতিহাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট থেকে বিষয় আহরণ করেছেন। রাজপুত কাহিনী নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক নাটক লেখা হয়েছিল। মহেন্দ্রগুপ্তই সম্ভবত সর্বপ্রথম শিখ ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করলেন। এই নাটকটির নাম 'রণজিৎ সিংহ' [১৯৪০]।

পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ ভারতের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তিনি একাধারে রণবীর এবং কর্মবীর ছিলেন। বিক্ষিপ্ত শিখ দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি তাদের একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিলেন। এটাই তাঁর প্রধান কীর্তি। রণজিৎ সিংহ-এর রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী নিয়েই নাটকটি রচিত। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সন্ধি এবং ইংরেজের ক্ষমতা বিস্তার সম্পর্কে তাঁর মনে যে ধারণা ছিল—"সারি হিন্দুস্থান

লাল হো যায়গা"—এ সবই নাটকে স্থান পেয়েছে। কিন্তু নাটকটিতে যা মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে রণজিৎ সিংহ-এর মাতা রাজকৌড় এবং স্ত্রী ঝিন্দন কৌড়—এঁদের দু-জনের ব্যক্তিত্ব ও মহত্ব। খড়্গ সিংহ [খড়ক সিংহ]-এর বিমাতা ঝিন্দন তাঁর মহত্বেই সব বিমাতাকে ছাড়িয়ে গেছেন।

নাটকের সমগ্র আবেদনটা ঐতিহাসিক নয়, পারিবারিক। ঐতিহাসিক নাটকের এটা একটা প্রধান ত্রুটি। অবশ্য নাটকের মধ্যে তা থাকায় সঙ্গতি নষ্ট হয়ে গেছে তা নয়। এটা আগাগোড়াই রণজিৎ সিংহের কাহিনী—তাঁর ন্যায় বিচার, উদারতা, তাঁর কঠোরতা তাঁর বুদ্ধি চাতুর্য সবই এতে ধরা পড়েছে। কিন্তু মূল কাহিনীটিকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করালে ভাল হতো।

'হায়দর আলী' ও 'টিপু সুলতান'-এর কাহিনী রীতিমত চাঞ্চল্যকর ঐতিহাসিক কাহিনী।

ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্য তার শক্তি প্রতিষ্ঠার যুগে তাদের বিরুদ্ধে যাঁরা অস্ত্র ধারণ করেছিলেন মহীশূরের হায়দর আলি তাঁদের অন্যতম। তিনি মহীশূরে মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সাধারণ একজন সৈনিকের ঘরে তাঁর জন্ম। প্রথমে তিনি মহীশূরের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী বা দলবই নন্দরাজের অশ্বারোহী সেনাদলে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি মারাঠা আক্রমণ থেকে মহীশূরকে রক্ষা করে সেনাপতির পদ লাভ করেন এর পরে নন্দরাজকে অপসারিত করে মহীশূরের সর্বময় কর্তা হন। অবশ্য এই সময় মহীশূর রাজের কোনও ক্ষমতা ছিল না, দলবই ছিলেন প্রকৃত শাসক।

হায়দর আলির ক্ষমতা বিস্তার সহজ ছিল না। কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলি ছিলেন ইংরেজের মিত্র এবং হায়দর আলির শত্রু। নিজামের সঙ্গেও হায়দরের সদ্ভাব ছিল না, এই নিজাম ও ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে হায়দরকে আক্রমণ করেন। প্রথম মহীশূর যুদ্ধের [১৭৬৭] পরে ইংরেজের সঙ্গে হায়দরের এক সন্ধি হয়। এই সন্ধির অল্পকাল পরেই মারাঠাগণ হায়দরকে আক্রমণ করলে সন্ধির সর্ত অনুসারে ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইংরেজ সেই সন্ধির মর্যাদা রক্ষা করেনি। যার ফলে ইংরেজের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এক সময় হায়দর আলি নিজাম এবং মারাঠাদেরও তাঁর সঙ্গে নিয়ে একযোগে ইংরেজকে আক্রমণ করেছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজাম ইংরেজদের দিকে চলে যায়। হায়দর আলি বৃদ্ধাবস্থায়ও যুদ্ধ চালিয়েছিলেন।

১৮৮২-এ-হায়দরের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র টিপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমান-ভাবে যুদ্ধ চালিয়েছেন। নিজাম ও মারাঠারা ইংরেজদের সঙ্গে মিলে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে টিপু অকুতোভয়ে যুদ্ধ করেছেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে টিপু ফরাসীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। তখন ওয়েলেস্‌লী টিপুকে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা টিপু এতে সম্মত না হওয়ায় ওয়েলেসলী টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধেও নিজাম ছিলেন ইংরেজ পক্ষে। যুদ্ধে ইংরেজের জয় হয়। মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে যে যুদ্ধ হয় সেখানে টিপু বীরের ন্যায় অসিহস্তে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দেন।

হায়দর আলী, টিপু প্রমুখ যারাই ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছেন তাঁদেরই ইংরেজ লেখকেরা উন্মাদ, অত্যাচারী, বর্বর বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল সত্যি, কিন্তু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তারা যেভাবে যুদ্ধ করেছেন তার ফলে তাঁদের জাতীয় বীর হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছে।

মহেন্দ্র গুপ্তের নাটক 'হায়দর আলি' ও 'টিপু স্থলতান' [১৯৪৪]-এই দু-খানি নাটক রচনার উদ্দেশ্যও হায়দর এবং টিপুকে জাতীয় বীরের মর্যাদা দান। এই দুই জাতীয় বীরের বৃটীশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভারত-ইতিহাসের দিক থেকে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় বলতে গেলে : "পলাশী যুদ্ধে বঙ্গ বিজয়ের পর সমগ্র ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে দাঁড়াইয়াছিলেন—হায়দর আলি খাঁ এবং টিপু স্থলতান। হায়দর-টিপুর আত্মবলির সঙ্গে শুধু মহীশূরের স্বাধীনতা গেল না···প্রকৃত প্রস্তাবে সেই হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।"

নাট্যকার তাই এই দুই নায়কের চরিত্র বেছে নিয়ে যে নাটক রচনা করেছিলেন তা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে যে আদৃত হবে এটা স্বাভাবিক। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'টিপু স্থলতান' নাটকটিতে দেশাত্মবোধের যে পরিস্ফুরণ আছে, হায়দর আলি নাটকে তার কিছু অভাব চোখে পড়ে।

হায়দর আলি নাটকটি শেষ হয়েছে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আবেদন নিয়ে। হায়দর আলি বলছেন: "বাইরে পেশোয়া, দুর্গমধ্যে আব্রাদা [পর্তুগীজ জলদস্যু, পরে হায়দর আলির নৌ সেনাপতি]। এই দুই সত্যাশ্রয়ীকে সাক্ষী রেখে, এসো হিন্দু, অন্ততঃ আজকের দিনটিতে আমরা সব বিভেদ ভুলে—একটিবার—শুধু একটিবার পরস্পরে মিলিত হই। মৃত সত্যাশ্রয়ীদের আত্মা বায়ুস্তর হতে দেখুক—বিধাতার চাঁদ—বিধাতার সূর্য যেমন একই আকাশে ওঠে, মুসলমানের এই চাঁদ হিন্দুর এই সূর্য, সেও তেমনি একই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার মাটিকে উদ্ভাসিত কর্চ্ছে, আলোর বন্যায় প্লাবিত করে দিচ্ছে।" [৩।৩]

নাটকটি যখন রচিত হয় সেই সময়ে এই ধরণের সম্প্রীতির আবেদন প্রয়োজন ছিল। নাটকের অন্যত্রও হায়দর আলি বলেছেন: "হিন্দু মুসলমান, আমার রাজ্যের যেখানে যে আছে, সকলেই আমার ভাই।" [২।৩]

হিন্দু রাজ্যে মুসলিম সেনানায়ক ক্ষমতা অধিকার করেছেন—এ নিয়ে মহীশূরের অধিপতি কৃষ্ণরাজের মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রও দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে মহীশূরের মহারাণী দীপাবাঈ-এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃত দেশাত্মবোধ সঞ্চারিত করেছে। তিনি বলেছেন: "হতভাগ্য পুত্র, টিপু-হায়দারকে ধ্বংস করে রাজ্য রক্ষা করবে তুমি! একবার, শুধু একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখতো পুত্র, সুদূর বাংলার ভাগীরথী তীরে পলাশীর আম্রকানন হতে ঐ যে বাষ্পকুণ্ডলী উঠছে, সেই বাষ্প হতে ঐ যে আকাশ কোণে মেঘের সৃষ্টি হ'ল, ঐ মেঘ ঐ অগ্নিগর্ভ মেঘকুণ্ডলী—ওকে কি আজও চিনতে পারনি পুত্র? পলাশীর মেঘ, বাংলার এই মেঘ ভারতবর্ষের আকাশ ছেয়ে ফেলবে।......যদি রাজ্য চাও, দেশকে বাঁচাতে চাও, তা হ'লে এই দণ্ডে সমাদরে বরণ করে নিয়ে এসো টিপু-হায়দারকে।" [১।৪]।

নাটকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত করার ফলে নাটকটি সমাদর লাভ করতে পেরেছে। কিন্তু নাটক হিসাবে এটিকে বলিষ্ঠ রচনা বলা চলে না। ফেরারা ও আব্রাদার জ্যোতিষী কন্যা মরিয়ম-এর চরিত্র নাটকটিতে কিছু জটিলতার সৃষ্টি করেছে,সত্যি আব্রাদা মরিয়মের কাহিনীকে প্রাধান্য দান করায় ঐতিহাসিক নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

'টিপু সুলতান' নাটকে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা অনেক স্পষ্ট। প্রথম থেকেই নাটকটিতে দেশাত্মবোধের সুরটি উচ্চগ্রামে বাঁধা। স্বাধীনচেতা, স্বদেশ প্রেমিক টিপুর বীর চরিত্র এই নাটকে ভালভাবেই ফুটেছে এবং নাট্যকার ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। 'হায়দর আলি' নাটকে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির যে আবেদন আছে এ নাটকে তা আরও উজ্জ্বল।

ইংরেজের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রয়াসের মহৎ আদর্শকেই এখানে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। টিপু বলেছেন নানাফাড়নাবীশকে : "যাও ব্রাহ্মণ মহারাষ্ট্রে ফিরে যাও, মহারাষ্ট্রের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রতি ঘুমন্ত নাগরিককে জাগরিত করে তোলো। প্রতি মারাঠির কাছে আমার কাতর আবেদন জানিয়ে বলো—টিপু সুলতান হোক, পেশোয়া হোক, কিম্বা যে কোন হিন্দু অথবা যে কোন মুসলমান হোক—যাকে তারা হিন্দুস্থানের জাতীয় নেতা বলে মানতে চায়···তারই পতাকার নিয়ে এসে তারা অবিলম্বে সম্মিলিত হোক। যাও তাদের বুঝিয়ে বলো···এই ঘনায়মান দুর্যোগের দিনে তারা যেন শুধু এই কথাটি ভুলে না যায়—এ দেশ ইংরেজের নয়, ফরাসীর নয়, ওলন্দাজ পর্তুগীজের নয়—হিন্দুস্থানের অধিকারী···আমরা মিলিত হিন্দু-মুসলমান···একই ধাত্রী মাতার আমরা যুগল সন্তান।" [১।৪]।

নাটকের শেষ পর্যন্ত এই মিলনের সুর ধ্বনিত হয়েছে। এমনকি শেষ দৃশ্যে মৃত্যু বরণের মুহূর্তে আহত টিপু নানাফাড়নাবীশের বুকে ঢলে পড়েছেন। এই সময়ের টিপুর সংলাপগুলিও পরাধীন ভারতবাসীর মনে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে :"আমার দেশ রইল, হিন্দু, মুসলমান, তোমরা রইলে। যাবার বেলায় তোমাদের কাছে শেষ প্রার্থনা জানিয়ে যাই···আমি পার্লাম না, কিন্তু তোমরা পারবে···তোমরা আমার দেশকে রক্ষা কোরো।"

অথবা, নানাফাড়নাবীশ যখন জিজ্ঞাসা করেছেন : 'কেমন করে দেশকে বাঁচাবো—কোন মন্ত্রে বাঁচাব?' তার উত্তরে টিপু বলেছেন : 'সে মন্ত্র হিন্দু-মুসলমানের মিলন মন্ত্র। একা হিন্দু পারবে না, একা মুসলমানও পারবে না—ত্রিংশ কোটি হিন্দু-মুসলমানের ধাত্রী-জননী···এ হিন্দুস্থানকে বাঁচাবে ত্রিংশ কোটি মিলিত হিন্দু-মুসলমান! সে জাগরণ দেখতে হয়তো আবার আসব—আবার এ ভারত ভূমিতে জন্ম নেব—আবার এ মাটিকে মা জননী বলে প্রণাম করবো।···"

নাটকটি লেখা হয়েছে যে ১৯৪৪ সালে। তখন 'দেশকে মুক্ত' করার কথা সোজাসুজি না বলেও 'দেশকে বাঁচাবার' যে আবেদন জানানো হয়েছে সেটা একটু পরোক্ষ[৩] আবেদন হলেও তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, কারণ এ সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে উঠেছিল এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নেই এই তিক্ততা। এই তিক্ততা দূর হয়নি, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা এবং ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগই তার প্রমাণ।

নাটকটি আগাগোড়া উত্তেজনাময় ঘটনায় ভরপুর। নাটকে একটি বিশ্বাসঘাতক চরিত্র আছে এবং হায়দর আলি নাটকের মতো একজন জ্যোতিষীও আছে। তবে সেই জ্যোতিষী চরিত্র এই গুরুগম্ভীর নাটকে হাস্যরসের উপাদান জুগিয়ে রিলিফ দেবার কাজে নিযুক্ত।

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং যখন এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো—এই দুই যুগ নিয়ে মহেন্দ্রগুপ্ত দু-খানি নাটক লেখেন। 'মহারাজ নন্দকুমার' ও 'শতবর্ষ আগে'।

এক সময় মহারাজ নন্দকুমারকে নিয়ে বঙ্গদেশে প্রবল আলোড়ন হয় এবং নন্দকুমারকে নিয়ে যাত্রা পালা ও নাটক লেখার কথা আগেই বলা হয়েছে। মহেন্দ্র গুপ্ত নতুন করে নন্দকুমারকে নিয়ে নাটক রচনা করেন। নন্দকুমারের প্রকৃত চরিত্র কোনও নাট্যকারই অনুধাবন করেন নি। যেহেতু নন্দকুমার বৃটীশ শঠতার বলি, সেই হেতু তিনি জাতীয় বীর হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন। মহেন্দ্রগুপ্তের নাটকও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে নন্দকুমারকে যেমন জাতীয় বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে, তেমনি যে সব বিশ্বাসঘাতক ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে। এই নাটকে মীর কাশিম, বিশ্বাসঘাতক জগৎ শেঠ প্রমুখের হত্যার আদেশ দিয়ে বলেছেন: "আপনাদের কাছে যে বিশ্বাস গচ্ছিত রেখেছিলাম, সেই বিশ্বাস আপনাদের ফিরিয়ে দিতে হবে, পাঞ্জা আমি চাই। গঙ্গার অতল জল হতে খুঁজে আনুন।

"এ জন্মে না হোক জন্মান্তরে হোক—স্বাধীন বাংলার নবাবী পাঞ্জা ফিরিয়ে আনতে হবে। যান জগৎ শেঠ মহাতপ চাঁদ, স্বরূপচাঁদ, রায় দুর্লভ—ঐ অতল জলস্রোত হতে ফিরিয়ে আনুন আমার গচ্ছিত বিশ্বাস, ফিরিয়ে আনুন স্বাধীন বাংলার নবাবী পাঞ্জা'।

মহেন্দ্র গুপ্তের 'শতবর্ষ আগে' [১৯৪৫] নাটকখানি সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নাট্যকার ভূমিকায় ঘোষণা করেছেন : "এ নাটকে কোথাও কোন কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়নি ; এর প্রত্যেকটি চরিত্র ও ঘটনা ইতিহাস সম্মত। তবে, নির্জলা ইতিহাসে নাটক হয় না, তাই, যেখানে অতি সামান্যভাবে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি······তা কেবল নাটকে 'নাটকত্ব' দেবার জন্য।"

১৮৫৭-এর যে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেই বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বিদ্রোহকে কেউ কেউ সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দিতে রাজী নন ; কারণ এই বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, যদিও বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করেছিল তারাই। নানা সাহেব, তান্তিয়া টোপী, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ কেউ-ই সিপাহী ছিলেন না। তাই একদল ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম বলে মনে করেন। আবার ভারতের এক অংশে সীমাবদ্ধ খণ্ড খণ্ড উত্থানকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের জাতীয় সংগ্রাম বলে গণ্য করতে আর একদল ঐতিহাসিক নারাজ। এঁদের আরও বক্তব্য এই যে, বিভিন্ন বিদ্রোহী নায়ক ও সৈন্যদলের মধ্যে একসাথে কাজ করার কোনও ব্যবস্থা ছিল না ; তাই জাতীয়তার ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের স্বাধীনতা লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল এমন কথা বলা যায় না।

এই পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই বিদ্রোহের স্মৃতি পরবর্তী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রেরণা দান করেছে এবং এই স্মৃতিই মহেন্দ্র গুপ্তকে তাঁর নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

নাট্যকার বিদ্রোহের প্রধান নায়কদের প্রায় সকলকেই চিত্রিত করেছেন এবং তিনি যা দেখাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন নায়ক বা নায়িকা বীরত্বপূর্ণ লড়াই করলেও তারা সম্মিলিত হয়ে লড়াই করতে পারেননি এবং এইজন্যই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। এই ধরণের কাহিনীর সামগ্রিক বিবরণ দানের চেষ্টা না করে একজন নায়ক বা নায়িকাকে বেছে নিয়ে সিপাহী বিদ্রোহের

পটভূমিকায় নাটক রচনা করলে নাটক হিসাবে তা অনেক বেশী সাফল্যমণ্ডিত হতো। কিন্তু নাট্যকার একজনকে 'হিরো' করবার চেষ্টা করেন নি; তিনি ভারতের বিভিন্ন অংশের বিদ্রোহের আলেখ্য চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। তার ফলে এটি কয়েকটি নাট্য-চিত্রের সমষ্টি হয়েছে মাত্র, দৃঢ়সম্বদ্ধ নাটক হয়ে উঠতে পারেনি।

এই নাটকে বিদ্রোহের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে সমসাময়িক কালের বাঙালী বুদ্ধিজীবী ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল, গিরিশচন্দ্র ঘোষের চরিত্রও উত্থাপিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের দয়া, তেজস্বিতা প্রভৃতির বিবরণ দেবার জন্যে এই নাটকে তাঁকে উপস্থিত করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তেমনি মাইকেল মধুসূদনের পশ্চিমমুখী মন যে পূর্বে আলোর সন্ধান করলো সেটা সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব নয়। গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রভৃতি নাটক লেখার প্রেরণা সিপাহী বিদ্রোহের সময় পেয়েছিলেন—এটা মনে করাও ভুল হবে। গিরিশচন্দ্র তাঁর প্রথম নাটক গীতিনাট্য রচনা করেন সিপাহী বিদ্রোহের ২০ বছর পরে এবং উপরোক্ত তিনটি নাটক তিনি রচনা করেন তারও ২৯ বছর পরে। সুতরাং প্রায় ৫০ বছর পরের গিরিশচন্দ্র গোলদিঘীর বেঞ্চিতে বসে দেশপ্রেমিক বীরদের নিয়ে নাটক লেখার কথা ভেবেছিলেন—এটা নেহাৎই কষ্টকল্পনা।

এনফিল্ড রাইফেলে টোটা ভরবার আগে তার আগাটা দাঁত দিয়ে কেটে নিতে হতো। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সৈন্যদলের মধ্যে গুজব রটে গেল যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাতি নষ্ট করার জন্যে টোটার মধ্যে শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত হয়েছে। এই কথা প্রচারিত হওয়ার পরে বহরমপুর শহরে [মুর্শিদাবাদ] এবং পরে কলকাতার ব্যারাকপুরের সৈনিকেরা ঐ টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। মঙ্গল পাণ্ডে নামক ব্যারাকপুরের একজন সিপাহী প্রথম প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহ দমিত হলেও তা ভারতের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায়ও চট্টগ্রাম, ঢাকা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ ঘটে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, বাংলায় সিপাহীরা সে সময়ে কোনও সমর্থন লাভ করেনি। "বাংলাদেশের জনসাধারণ বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি কোনও সহানুভূতি দেখায় নি। তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালী সমাজও এই বিপ্লব কেবলমাত্র সিপাহীদের বিদ্রোহ বলিয়াই গণ্য করিয়াছে—

ইহাকে কোন জাতীয় অভ্যুত্থান বা ইংরেজের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম বলে মনে করে নাই।"—[রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস': আধুনিক যুগ (১৩৭৮) পৃ: ৭০]।

সে যুগের বাঙালী মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সিপাহী বিদ্রোহ যে সিপাহীদেরই ব্যাপার এবং জনসাধারণের সঙ্গে ইহার কোনও সংশ্রব নেই—এইরূপ মন্তব্যই করেছেন।

তখন কলিকাতার British Indian Association এবং Mahammadan Association দুইটি প্রতিষ্ঠান বিদ্রোহের তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব পাশ করে। সে যুগের বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' এবং পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রভৃতি বিশিষ্ট পত্রিকা তীব্রভাবে বিদ্রোহের নিন্দা করে।[৪] কলিকাতার 'সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা' হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে ২৬ মে তারিখে যে সভা করেন সেই সভায় সিপাহীদের নিন্দা করে এবং গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক প্রস্তাব পাশ করেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব এবং সভায় কালীপ্রসন্ন সিংহ, হরেন্দ্রচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি এই ধরণের মনোভাবের প্রধান এই কারণ বুদ্ধিজীবী মহলের মুখপত্রেই প্রকাশ পেয়েছিল: "এই রাজ্যই [অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্ব] তো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজত্ব হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মন, বিদ্যা এবং ধর্ম, কর্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখি হইয়াছি ; কোন বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারি না, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত পালিত হইয়া যদ্রূপ উৎসাহে ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তঃকরণকে কৃতার্থ করেন, আমরাও অবিকল সেইরূপে পৃথিবীশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্বমতে চরিতার্থ হইতেছি। " ['সংবাদ প্রভাকর', ২০শে জুন, ১৮৫৭]।

এই অবস্থায় কোনও বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে দিয়ে গভর্ণর জেনারেল ক্যানিংকে রাজকার্যে পরামর্শ দান, বৃটীশ ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে দৃপ্ত বক্তৃতা অনেকটা বেমানান হয়েছে। তবে এটা ঠিক পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সিপাহী বিদ্রোহ যে মর্যাদা লাভ করেছে, নাট্যকার সেই মর্যাদায় এই বিদ্রোহকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

এই নাটকে ফুটে উঠেছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন' নাটকেরই সুর: "মনুষ্যত্ব আমরা বহুদিন হারিয়েছি। মনুষ্যত্ব যদি থাকতো আমাদের তা হলে কি সাধ্য ছিল সমুদ্রপারের মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গী বেনিয়ার, যে এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে রক্তচক্ষে শাসন করে। আমরা মানুষ নই, মানুষ হলে তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের প্রয়োজন হতো না, ভারতের ত্রিংশ কোটি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কণ্ঠের ভৈরব হুঙ্কারে বেনিয়া কোম্পানীর লোলুপ সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কে মূর্ছিত হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়তো।' [ইংরেজ সেনাপতি মেজার কিরকে-কে নানাসাহেবের উক্তি] [২।৪]।

: অপরাপর নাট্যকার :

মহেন্দ্র গুপ্ত ছাড়া আর কেউ এই সময়ে ঐতিহাসিক বা দেশাত্মবোধক নাটক যে একেবারেই লেখেন নি তা নয়। তবে তা অকিঞ্চিৎকর। বিধায়ক ভট্টাচার্য হাজারীবাগের নিকটস্থ রাজরূপা ছিন্নমস্তা দেবীর মহিমাকে কেন্দ্র করে 'রাজরাপ্পা' নাটক রচনা করেন। এটা ইতিহাসধর্মী হলেও ঐতিহাসিক নাটক নয়। প্রমথনাথ বিশি 'মৌচাকে ঢিল' নাটকের কাহিনী কিছুটা ইতিহাস-ভিত্তিক—কিন্তু নাটকের মূল প্রেরণা আধুনিক। মহেন্দ্র গুপ্তের 'পদ্মিনী' নাটক আধুনিক গবেষণায় যেটা অস্বীকৃত হয়েছে রাজস্থানের সেই প্রচলিত কাহিনী নিয়ে লেখা। অর্থাৎ এই সময়ে সার্থক ঐতিহাসিক নাটক রচনা হচ্ছিল না। কোনও কোনও সামাজিক নাটকে ইতিহাসের ছায়াকে ভিত্তি করে রচিত, সে নাটকে বিচ্ছিন্নভাবে দেশপ্রেমের কথা থাকলেও তা তেমন উগ্র নয়। এমন একটি নাটক 'জননী জন্মভূমি'।

১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের কিছু পরেই রচিত হয় সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'জননী জন্মভূমি' নাটকটি, এটি ঠিক ঐতিহাসিক নাটক নয়, তবে এই নাটকে দেশাত্মবোধের কথা আছে। নাটকের বাঈজী চরিত্র নিয়েছে চারণীর ভূমিকা। সে বিলাস মদির গান ভুলে গিয়ে বীর্যবতী নারীর মতো মাতৃপূজার উদ্বোধনের আহ্বান জানিয়েছে: 'আমি কিন্তু সুখী—লাঞ্ছিতা প্রপীড়িতা বিপন্না মাতৃ-ভূমির ক্ষুদ্রতম সেবায় নিজেকে কায়মনে নিয়োগ করবার এই সুযোগ লাভ করে আমি পরম তৃপ্তিলাভ করেছি। কোথায় চারণীগণ, গাও—আবার গাও মাতৃপূজার সুগম্ভীর বোধন সঙ্গীত! আরাবল্লীর প্রতি শিলাস্তূপ সে সঙ্গীতের

সমর রসে সঞ্জীবিত হয়ে অস্ত্রধারী যোদ্ধার বেশে ধেয়ে আসুক মেবারের উদ্ধার কামনায়।'

: বাংলা নাটকের গতিপথ :

বাংলা নাটকের স্থুরুতেই পাই সামাজিক নাটক এবং সে যুগের প্রায় প্রতিটি সামাজিক সমস্যাই নাটকে বিবৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক নাটকও এসেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তবে ঐতিহাসিক নাটকের প্রাণ স্পন্দন বিশেষ ভাবে স্থুরু হলো স্বদেশী আন্দোলনকে ঘিরে। এই আন্দোলনে আদর্শবাদ যতটা ছিল এবং এই আন্দোলন যতটা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, বাস্তবে তা সামগ্রিক জাতীয় জীবনের গভীর ততটা পৌছাতে পারেনি। কিন্তু এক একটা তরঙ্গ এসেছে, উত্তেজনা বেড়েছে এবং সেই 'উত্তেজনার আগুন পোয়াতে' এগিয়ে এসেছে দর্শকেরা। নাট্যশালাগুলি তাতে হাওয়া দিয়েছে। বহু নাটকেই দেখা গেছে প্ল্যাটফরম বক্তৃতার মতো বক্তৃতা—কখনও পরশাসনের বিরুদ্ধে ভাবাবেগ, কখনও সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে ভাবাবেগ পূর্ণ বক্তৃতা, সাম্প্রদায়িক মিলনের আহ্বান। এই উদ্দেশ্যে ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে সুবিধামত অখ্যান গ্রহণ করা হয়েছে। এটা করতে গিয়েই বহু ক্ষেত্রেই ইতিহাসকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। দমননীতি যখন তীব্র হয়েছে তখন নাট্যকার ও মঞ্চাধ্যক্ষরা সংযত হয়েছেন। আবার কোনও ঘটনাকে অবলম্বন করে উত্তেজনা বাড়লে তার সুযোগও গ্রহণ করেছেন।

দীর্ঘ দিন ধরে এই অবস্থা চলায় একঘেয়েমী এসে গিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে জাতীয় জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এই যুদ্ধ বাঙালীর সামাজিক অর্থনৈতিক এবং মানসিক জগতে আনলো বিপর্যয়। মন্বন্তরে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের দৈহিক মৃত্যু ঘটলো—বাকি মানুষের ঘটলো নৈতিক মৃত্যু। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ তার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ত শেষে চরম আঘাত হানলো। এক একটি বিদ্রোহ, আগষ্ট আন্দোলন, বর্বর উপায়ে দমন করলে তারা। মন্বন্তরে লেহন করা প্রান্তরে মানুষের কঙ্কাল, অন্ধকার রাত্রে কুলবধূদের অন্নাভাবে দেহ বিক্রয়, নিষ্প্রদীপ রাত্রের চোরাগলিতে মানুষের লোভের সওদা—অন্তদিকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙালীর অন্তরে বিক্ষোভ, গ্লানি আর অপমানের জ্বালা।

এই বাস্তব পটভূমিতে ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটক রচনা করা সহজ

ব্যাপার ছিল না। এই বাস্তব অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে কেউ আর সাজাহানের প্রেম, পিতৃস্নেহ, ঔরঙ্গজেবের ধূর্ত ভণ্ডামির চর্বিত-চর্বন দেখতে প্রস্তুত ছিল না—এমন কি রাজস্থানের অতীত গৌরবকে নিয়ে হিন্দু জাতীয়তার বিজয় কাহিনীও আকর্ষণীয় হবার কথা ছিল না—এমন কি সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা যেখানে বাস্তব হয়ে উঠেছে, সেখানে সেই পুরানো সুরে ঐক্যের ভাবাবেগ-পূর্ণ আহ্বানও জুতসই মনে হওয়ার কথা নয়। নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নাটকের প্রয়োজন হলো।

কিন্তু ব্যবসায়ী মঞ্চের প্রযোজকেরা পিছিয়ে গেলেন। তাঁদের মুখ চেয়ে যাঁরা নাটক লিখবেন তাঁরাও লেখনী চালনা করতে পারলেন না, কারণ নতুন বাস্তবমুখী নাটকে পয়সা আসবে কিনা সেটা অনিশ্চিত ছিল। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ভয়। কয়েক বছরের মধ্যেই যে তারা পাততাড়ি গোটাবে, উচ্চ রাজনৈতিক মহলে তা নিয়ে সলাপরামর্শ বা পরিকল্পনা রচিত হতো, কিন্তু বৃহত্তর সাধারণ মানুষের কাছে তার কোনো খবর এসে পৌছাতো না।

ব্যবসায়ী মঞ্চ পিছিয়ে থাকলেও যুগের দাবী অস্বীকৃত হলো না। নতুন যুগের মানুষের মধ্যেই এক শ্রেণী অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী এগিয়ে এলেন এই কাজে। সৃষ্টি হলো নতুন যুগ। এই নতুন যুগের গোড়াপত্তন করলো বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক।

: 'নীল দর্পণ' থেকে 'নবান্ন' :

'নীলদর্পণ' এবং 'নবান্ন' এই দুটি নাটকই ঐতিহাসিক নাটক না হওয়া সত্ত্বেও সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত, নাটকের পাত্র-পাত্রীরা ইতিহাসের নামাঙ্কিত পাত্র-পাত্রী না হওয়া সত্ত্বেও এরা ইতিহাসের পরিচিত পাত্র-পাত্রী।

দুটি নাটকের মধ্যে প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধান। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' রচিত হয় ১৮৬০-এ এবং বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' রচিত হয় ১৯৪৪-এ। দুটিই পরাধীন ভারতের ফসল; তবে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট আলাদা। 'নীলদর্পণ' রচিত হয় নীলবিদ্রোহের মধ্যে [১৮৫৯-৬১] আর নবান্ন রচিত হয় আগষ্ট বিপ্লবের [১৯৪২] পরে এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর [১৯৪৩]-এর পটভূমিকায়। দুটি নাটকই কৃষকদের নিয়ে লেখা।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বৃটীশ নাট্যকার শেকস্‌পীয়রের অনুসরণে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অসাধারণ চরিত্র, রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদশাহদের নিয়ে লেখা নাটক বাংলার রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগেই সুরু হয়েছিল এবং তা বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত চলে আসছিল। ১৮৮১-এ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইবসেনের 'ঘোস্টস' [Ghosts] নাটক যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ মানুষ নিয়ে লেখা নাটক ইউরোপীয় সাহিত্যে যে নতুন দিগন্ত রচনা করেছিল তার দ্বারাও বাংলা নাটক প্রভাবিত হয়েছে। তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই এসেছে গোর্কির 'লোয়ার ডেপথস্‌'— যে নাটকে তিনি সমাজের নিম্নস্তরের নিতান্ত সাধারণ মানুষের দুঃখে-দারিদ্র্যে পীড়িত জীবনকে তুলে ধরলেন।

'নবান্নের' নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য ব্যক্তিগতভাবে গোর্কিকে অনুসরণ করে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষগুলিকে নাটকে এনে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়েছিলেন—একথা বললে ভুল হবে। বরং বলা উচিত 'নবান্ন'-এর জন্ম একটি নতুন আন্দোলনের গর্ভে যে আন্দোলনকে বলা যায় 'গণনাট্য আন্দোলন।' ১৯৪২-এ 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হয়; তারই একটি শাখা গণনাট্য সংঘ। এই গণনাট্য সংঘেরই অন্যতম সদস্য হিসেবে বিজনবাবু নাটকটি রচনা করেন এবং সংঘের শিল্পীরাই ১৯৪৪-এর ২৪ অক্টোবর নাটকটি 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে প্রথম অভিনয় করেন।

এই নাটকের রচনাকাল সম্পর্কে নাট্যকারের প্রতিবেদন: '১৯৪২ সনের আগষ্ট মাসে দেশব্যাপী যখন প্রত্যক্ষ গণ-অভ্যুত্থান আরম্ভ হলো, ভারতবর্ষে উপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখবার শেষ প্রাণান্তিক চেষ্টায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন সমস্ত হিংস্রতা দিয়ে ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিয়মতন্ত্রসম্মত ভাগ বাঁটোয়ারার পর নিরক্তের স্বাধীনতা এলো কালনেমীর অভিশাপ মাথায় করে। তাই বিনারক্তপাতে অর্জিত স্বাধীনতার পাপস্খালন হোলো আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। নবান্ন নাটকের রচনাকাল এই রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্বের" ['নবান্ন' নাটকের ভূমিকা]।

নাট্যকের বিষয়বস্তুও নাট্যকারের ভাষাতেই তুলে ধরছি: "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আধিদৈবিক দুর্ঘটনা এবং দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে চূড়ান্ত একটা পরিণতির

দিকে নিষ্ঠুরভাবে অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেকটি সমস্যা এমন এক বিরাট ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে যে মনে হচ্ছে অনর্থ যা কিছু ঘটছে তার উপর মানুষের যেন কোন হাত নেই। সচেতন বুদ্ধিজীবী মনও তখন সংশয় আর বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় ঘূর্ণায়মান। চরমতম এমই দুঃসময়ে 'জবানবন্দীর'[৫] ইঙ্গিতের সূত্রধার শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার দেশ মেদিনীপুর জেলার পটভূমিকায় প্রধান সমাদ্দারের নতুন জবানবন্দীতে নাটক লিখতে বসলাম। মুমূর্ষু পরাণ মণ্ডলের চোখের সোনার ধানের দুঃস্বপ্নই প্রধান সমাদ্দারের চোখে প্রতিভাত হয় জবা-কুসুমসংকাশং রূপে। মৃত্যুকে বরণ করবার দুর্দমনীয় সংকল্প ঘোষণার মধ্য দিয়ে সে করে মৃত্যুকে অস্বীকার।" ['নবান্ন' নাটকের ভূমিকা]।

এই নবান্ন নাটক সম্পর্কে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য [বিখ্যাত নট, যিনি গণনাট্য সংঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং নবান্ন নাট্যাভিনয়ের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন] বলেছেন 'বাংলার বিগত দুর্যোগ নবান্নের পটভূমিকা'। [দ্রঃ 'জনযুদ্ধ', ৮. ১১. ১৯৪৪)। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এই দুর্যোগ সৃষ্টি করেছিল। অনাহার আর মৃত্যুর মধ্যেও 'দুর্দমনীয় সংকল্প ঘোষণার মধ্য দিয়ে কৃষক সমাজ মৃত্যুকে অস্বীকার করেছে—সোজা কথায় প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে মরেছে তারা।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে যে প্রতিরোধটা কার বিরুদ্ধে, কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে? নাটকের মধ্যে এর যে উত্তর পাওয়া যাবে তা হচ্ছে—মন্বন্তরের বিরুদ্ধে। নাটকের শেষ সংলাপে এই কথা হচ্ছে: 'একথাও জেনো প্রধান যে গত বারের মত এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে, আমার চোগের ওপর থেকে আমার পরিজন, আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব [জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে] এই-এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হ'লে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে যদি পার। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ।'

অর্থাৎ জোর প্রতিরোধটা আকাল বা মন্বন্তরের বিরুদ্ধে। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরই হোক বা পঞ্চাশের মন্বন্তরই হোক—এগুলি শুধু অর্থনৈতিক ব্যাপার নয়—রাজনৈতিক ব্যাপারও বটে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চরম শোষণের

ফলে। তখন ইংরেজ শাসন দেশে শক্ত হয়ে বসেছে। আর পঞ্চাশের মন্বন্তর যখন এলো তখন বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ টিঁকে থাকার শেষ চেষ্টা করছে।

মরণপণ যুদ্ধে ব্যাপৃত বৃটীশ রাজশক্তি। ভারতের সমস্ত সম্পদকে সে যুদ্ধের কাজে নিয়োগ করেছে; জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য হাজার হাজার বিদেশী সৈন্যের খাওয়ানোর ভার নিতে হয়েছে। এদের মধ্যে বৃটীশ, দক্ষিণ আফ্রিকান, চীনা ও আমেরিকান সৈন্য ছিল। অন্যদিকে আফ্রিকায় যুদ্ধরত সৈন্যদেরও রসদ পাঠাতে হচ্ছিল। তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য বৃটীশ উপনিবেশেও খাদ্য পাঠাতে হচ্ছিল ভারতবর্ষকে। এইভাবে খাদ্যে প্রচণ্ডভাবে টান পড়ায় খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয় এবং সেটাই পরিণত হয় মন্বন্তরে। কলকাতার রাজপথে হাজার হাজার লোক অনাহারে মৃত্যু বরণ করে। গোটা বাংলায় মৃত্যু হয় ৫০ লক্ষ লোকের। দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ট্যাক্স বৃদ্ধি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির ফলে চূড়ান্ত দুরবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা মানুষেরই সৃষ্টি এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরকে বলা তাই হয় মনুষ্য রচিত দুর্ভিক্ষ। সেই মানুষ কারা? সেই মানুষ হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে মজুতদার, মুনাফাদার, চোরাকারবারী, মহাজন, জমির দালাল, শহরের বিত্তবান শ্রেণী। কিন্তু যে অবস্থায় এদের সৃষ্টি সেই অবস্থাকে আবার সৃষ্টি করেছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এবং তাদের সহযোগী সামন্ত শোষক, তাদের সাকরেদ এবং শহরের বৃহৎ ধনিক শ্রেণী।

কিন্তু দুঃখের বিষয় 'নবান্ন' নাটকে শেষোক্ত ব্যক্তিরা অনুপস্থিত এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয় মূল শত্রু বৃটীশ শাসকদের কোনও প্রতিনিধির অনুপস্থিতি। অথচ পরাধীন দেশে মূল দ্বন্দ্ব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষক এবং অত্যাচারিত জনসাধারণের দ্বন্দ্ব; তা ছাড়া গ্রামের মাঝারি কৃষকেরা নাটকে থাকলেও কৃষকদের মধ্যে সবচেয়ে নিপীড়িত অংশ ভূমিহীন গরীব চাষীও নাটকে স্থান পায় নি।

দীনবন্ধুর নীলদর্পণের চাষী ক্রুদ্ধ, মারমুখী এবং শ্রেণীবিরোধী ঘৃণায় ফেটে পড়েছে। পরাধীন দেশের শাসক এবং শোষকের প্রতিনিধি রোগ সাহেবকে তোরাপ গলা ধরে চপেটাঘাত বা কর্ণমর্দনের দৃশ্য 'নবান্ন' নাটকে কল্পনাও করা যায় না। কারণ প্রকৃত শ্রেণী-শত্রুদের এ নাটকে প্রথম থেকেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। একথা যদিও ঠিক হয় যে, নীলবিদ্রোহের চাষীর যে মেজাজ

ছিল, পঞ্চাশের মন্বন্তরের চাষীর সে মেজাজ ছিল না, এরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে, তথাপি যে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষক দুর্ভিক্ষ ডেকে আনলো তাদের বাদ দিয়ে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নাটক হয় কি ভাবে? নাটক এটি হয়েছে, কিন্তু সে নাটক ইতিহাসের প্রকৃত প্রেক্ষাপটকে এড়িয়ে 'আকাশ' এর বিরুদ্ধে নৈর্ব্যক্তিক প্রতিরোধ ঘোষণা করে শেষ হয়েছে। [দ্র. নাটকের শেষ দৃশ্য]। আগের যুগের রাজা বাদশার কাহিনীর মধ্যে দিয়ে যেটুকু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঘোষণা ধ্বনিত হয়েছে এ নাটকে সেটুকুও নেই।

তবে নবান্ন ভারতের কৃষকদের সঙ্গে সকলকে যুক্ত করে এবং বাস্তবধর্মী চরিত্র ও বাস্তবধর্মী অভিনয় ধারার পত্তন করে ভবিষ্যতের নতুন নাট্যধারাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'নীলদর্পণ' থেকে 'নবান্ন'—১৯৬০ থেকে ১৮৪৪। প্রথমটি লেখা হচ্ছে সিপাহী বিদ্রোহের তিন বছর পরে—যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে বৃটীশ পার্লামেণ্ট ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছে এবং বৃটীশ শাসনের ভিত্তি ভারতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; আর দ্বিতীয়টি লেখা হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন বছর আগে—যখন বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে গেছে। হয়তো সেই জন্যেই দীনবন্ধু ঔপনিবেশিক জনগণ ও সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বটা যেভাবে দেখেছিলেন, বিজন ভট্টাচার্য কি তেমন ভাবে দেখতে পেরেছেন?

আমরা দেখেছি সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা যখনই আঘাত হেনেছে তখনই তার প্রতিক্রিয়ায় শুধু জনসাধারণই উদ্বেলিত হন নি, নাটকেও তাদের কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বেশী দেশাত্মবোধক নাটক রচিত হয়েছে ১৯০৩ থেকে ১৯১১-এর মধ্যে অর্থাৎ বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সময়; তার প্রতিক্রিয়ায় স্বদেশী আন্দোলন এবং ব্যবচ্ছেদ রদ পর্যন্ত—আট বছর সময়ের মধ্যে। আবার স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে উঠেছে বিশ, ত্রিশ দশকে কিংবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তখনও দেশাত্মবোধক নাটকের সংখ্যা বেড়েছে। তবে লক্ষণীয় যে, আগাগোড়াই নাট্যকারেরা প্রধানত জাতীয় বীরের সন্ধান করেছেন এবং তাঁকে ঘিরে দেশাত্মবোধের ভাবকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন।

অনেক ক্ষেত্রে একই 'বীর চরিত্র' বার বার নাটকে এসেছে—যেমন সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, শিবাজী, রাণা প্রতাপ, নন্দকুমার, প্রতাপাদিত্য

প্রভৃতি। তবে নাটকীয় বিচারে এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের নাটকের কিছু পার্থক্য ঘটেছে দৃষ্টিকোণের দিক থেকে। প্রথম যুগের অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের আগের যুগের নাটকে একক বীরত্ব—স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে—সংগঠন চেতনা। দ্বিতীয়ত, দেশপ্রেমকে, স্বাধীনতা প্রীতিকে তরুণ-তরুণীর ব্যক্তিগত প্রেমের সঙ্গে একীভূত করবার চেষ্টা পরবর্তী যুগে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সিরাজের হত্যা দৃশ্যে গিরিশচন্দ্রের সিরাজ ব্যক্তিগত অনুশোচনা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে ; অন্যদিকে শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দেশের জনসাধারণকে আহ্বান জানিয়ে বলেছে : "......এস ভাই সব, এস আর একবার চেষ্টা করে দেখি, পলাশীর প্রান্তরে যা আমরা হেলায় হারিয়ে এসেছি, বঙ্গ-জননীর কনক-কিরীটে আবার তা পরিয়ে দিতে পারি কি না ?"

তৃতীয়ত, দেশপ্রেমকে, স্বাধীনতা প্রীতিকে, তরুণ-তরুণীর ব্যক্তিগত প্রেমের সঙ্গে একীভূত করার চেষ্টা পরবর্তী যুগে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের সিরাজ-আলেয়ার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এইভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে ধীরে ধীরে। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাবলী উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে প্রথম যুগের মতো পরবর্তী কালের নাট্যকারেরাও ইতিহাসের প্রকৃত প্রেক্ষাপটকে ছাড়িয়ে গেছেন—রচনা করেছেন অনৈতিহাসিক পরিস্থিতি। এর মূল কারণ, আমাদের দেশে ঐতিহাসিক নাটকের প্রেরণাটাই এসেছিল দেশাত্মবোধ থেকে এবং এই দেশাত্মবোধ প্রচারই ছিল মূল লক্ষ্য।

১। ঐতিহাসিক বর্ণিও বলেছেন যে, বাজ পড়ে কাষ্ঠ তোরণ ধ্বংস হয়। ইয়াইহা বিন আহম্মদ সরহিন্দি লিখেছেন যে, ভগবান এই শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। ইবন বতুতা বলেছেন যে, তোরণটি রাজকীয় স্থপতি আয়াজের পুত্র আহম্মদকে দিয়ে এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে হস্তী স্পর্শ মাত্রই তা ভেঙ্গে পড়বে।

২। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, [১৩৭৩] : পৃষ্ঠা ১৭৬ দ্রষ্টব্য।

৩। সোজাসুজি ইংরেজের বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধের আহ্বান জানানো সম্ভব ছিল না; কারণ তাহলে নাটকের অভিনয়ের অনুমতি মিলতো না। এই পরোক্ষ পথ গ্রহণ করায় পুলিশ নাটকটির অভিনয়ে আপত্তি করে নি। ২০শে মে ১৯৪৪ তারিখের কলিকাতার ডেপুটি কমিশনার অব পোলিস্ লিখিতভাবে এই নাটকের অভিনয়ের অনুমতি দান করেন।

৪। "কয়েক দল অধার্মিক অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হিতাহিত-বিবেচনা-বিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্মিকতা প্রকাশ পূর্বক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসি শান্ত স্বভাব অধন সধন প্রজামাত্রেই দিবারাত্র জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, 'এই দণ্ডেই হিন্দুস্থানে পূর্ববৎ শান্তি সংস্থাপিত হউক। হে বিঘ্নহর! তুমি সমুদয় বিঘ্ন হর—সকল উপদ্রব নিবারণ কর… · যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছেন তাহা দিগ্যে দণ্ডদান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ বৃক্ষের ফল ভোগ করুক।" ['সংবাদ প্রভাকর', ২০শে জুন, ১৮৫৭]

"হে পাঠক সকল, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য কর……আমাদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সসজ্জ হইয়া দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন, শত্রুদিগের মোর্চা শিবিরাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, তাহারা বাহিরে যুদ্ধে আসিয়াছিল আমাদিগের তোপমুখে অসংখ্য লোক নিহত হইয়াছে, রাজসৈন্যরা ন্যূনাধিক ৪০ তোপ এবং শিবিরাদি কাড়িয়া লইয়াছেন, হতাবশিষ্ট পাপিষ্ঠেরা দুর্গ প্রবিষ্ট হইয়া কপাট রুদ্ধ করিয়াছে আমাদিগের সৈন্যেরা দিল্লীর প্রাচীরে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে।…… ব্রিটিশাধিকৃত ভারতবর্ষবাসি প্রজা সকল নির্ভয় হও ·····" ['সম্বাদ ভাস্কর', ২০শে জুন, ১৮৫৭]

৫। 'জবানবন্দী' বিজন ভট্টাচার্য রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র নাটিকা। এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন: 'সেও এক সোনা ধানের দুঃস্বপ্ন—মাঠের রাজা পরাণ মণ্ডল [জবানবন্দীর নায়ক] সে স্বপ্ন দেখতে দেখতে কোলকাতার ফুটপাতে হুমড়ি খেয়ে মরেছিল।' এই ক্ষুদ্র নাটিকাতেই নতুন নাট্যধারার প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

